“অন্দর মহলের চিক্ সরিয়ে অল্পবয়েসী একটি ফুটফুটে মেয়ে
রঙ বেরঙের প্রজাপতির চালে ঘরে ঢুকল”—আমি

জিন্দাবাহার
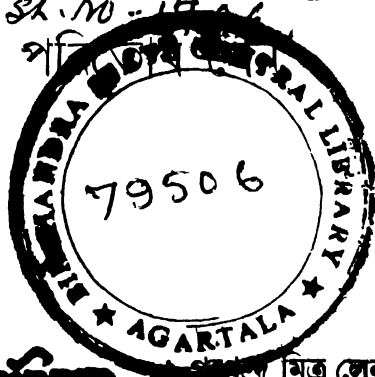
প্যাপিরাস
মিত্র লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৪

প্রকাশ : ১৩৬৬ মহালয়া

স্বত্ব : পরিতোষ সেন

প্রুফ্ সংশোধন : সুবিমল লাহিড়ী

প্রকাশক : অরিজিৎ কুমার
প্যাপিরাস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৪

মুদ্রক : শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বাগ
নিউ নিরালা প্রেস
৪ কৈলাস মুখার্জী লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

গ্রন্থন : দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস
বিশ্বাস বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
১৯/১ই পাটোয়ারবাগান লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

প্রচ্ছদের নামাক্ষর, জ্যাকেট ও গ্রন্থভুক্ত চিত্রাবলী লেখক-কৃত।

ছবি ছেপেছেন কেমিও প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

হেমাঙ্গিনী দেবীর

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

পরিচিতি

'ওবিন ঠাকুর ছবি লেখে।' ছবি লিখেছেন পরিতোষ সেন-ও। লিখেছেন এমন অকস্মাৎ, কোনো পূর্বাভাস না-দিয়ে এবং সে-লেখায় এমন নিখুঁত মুন্সিয়ানা যে বিশ্বাস হতে চায় না যে এই প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী এই প্রথম আপন অনবদ্য শিল্পীসত্তা প্রকাশ করলেন লেখনীর মাধ্যমে। মনে পড়ছে যে আজ থেকে প্রায় দু'বছর পূর্বে এক সন্ধ্যায় পরিতোষ আমার বাড়িতে এসে তাঁর কয়েকটি রচনা প'ড়ে শোনালেন তাঁর স্মৃতিমন্দির কণ্ঠে, আমি বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম, কেননা যদিও পরিতোষকে আমি চিনি আজ পঞ্চাশ বছর যাবৎ, তার বিচিত্র ব্যক্তিত্বের এই দিকটি আমার জানা ছিল না, আমার ভাবনার মধ্যে ছিল না। কিন্তু এই বাঙ্ময় আলেখ্যগুলি প'ড়ে অন্তশ্চক্ষুতে দর্শন ক'রে মনে হচ্ছে যে পরিতোষের পক্ষে আপন শিল্পীসত্তার একাধিক মাধ্যম আবিষ্কার করা নিতান্তই স্বাভাবিক এবং আবশ্যক ছিল।

ঢাকা শহরের বাবুর বাজার নামক জনবহুল অঞ্চলে কালীবাড়ির পাশ দিয়ে চ'লে গেছে জিন্দাবাহার লেন (নামের মানে কি জীবন্ত, প্রাণবন্ত সৌন্দর্য ?), সে-রাস্তার প্রায় শুরুতেই ছিল পরিতোষদের পৈতৃক বাড়ি, তার লাগাও ছিল আমাদের ভাড়াটে বাড়ি। এই রাস্তায় কয়েকটি বিদগ্ধ পরিবারের আবাস ছিল, তার মধ্যে ছিল মণীশদার (ঘটক) শ্বশুরবাড়ি, শ্রীনগরের জমিদারবাড়ি, পরবর্তী কালের খ্যাতনামা সাধক পরমানন্দ সরস্বতীর বাড়ি। আবার এ-রাস্তারই এক শাখায় ছিল একটি গলিতে বারাঙ্গনাপাড়া, এই বারাঙ্গনাদের কিছু বাকচিত্র পরিতোষের নিবন্ধগুলিতে আছে। কিন্তু পাড়ার সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল জনকয়েক ব্যক্তি—যেমন একজন দর্জি (আমি বলতাম খলিফা, অর্থাৎ কারিগর), একজন দন্ত-চিকিৎসক, একজন চিত্রশিল্পী। সে-গলির ভিস্তিটি এবং কালীবাড়ির একজন পুরুতও আমার মনে দাগ কেটেছিল, তবে আমি ছিলাম সৃজনী কল্পনা থেকে বঞ্চিত আর আমার ছোটো ভাইয়ের মতো পরিতোষ যে রঙে রূপান্বয়ের আকাঙ্ক্ষায় উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন সেই বালক বয়সেই, তার প্রমাণ পেয়েছিলাম যখন তিনি

মাঝে মধ্যে শহরের পূর্বাঞ্চলে ফরাসগঞ্জে (যে-অঞ্চলে একদা সত্যিই ফ্রেঞ্চ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির গুদাম এবং অফিস ছিল) বাস করতেন এক চিত্রকর, ব্রজগোপাল (খুবই সাধারণ চিত্রকর), তার কাছে যেতেন। পরিতোষ কিছু বেশি উপকার পেয়েছিলেন আরেকজন স্থানীয় শিল্পীর সঙ্গে মিশে, কামাখ্যা বসাক। পরিতোষদের পরিবারে তখন কেউ ছিল না যার কাছে তিনি তাঁর উপচে-ওঠা সৃজনী অভিলাষ ব্যক্ত করতে পারতেন। ওঁর এক দাদা আমার সহপাঠী ছিল কিন্তু তাঁর জ্যেষ্ঠগণ—‘ন’বাবু ও সেজো বাবু অধ্যায়ে দু’জনের কথা আছে—কনিষ্ঠ বালকভ্রাতার অঙ্কুরোন্মুখ প্রতিভার দিকে তাকাবার সময় পাননি, তাকাবার মেধা তাঁদের আদৌ ছিল না ব’লে আমার ধারণা। ফলে পরিতোষ যে তাঁর প্রতিভা-বিকাশের পথে চলা শুরু করলেন, সে নিতান্তই তাঁর নিজ অন্তঃশক্তির বলে। আমার বিশ্বাস তিনি তাঁর মা’র শুভাশীর্বাদও পেয়েছিলেন। পরিতোষ (আমার যতদূর স্মরণ আছে) যখন বুঝলেন তাঁর বিদ্যুৎগর্ভ প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ পাওয়া যাবে না ঢাকা শহরে, তখন একটি কাজ করলেন যাকে সাহসী বললে কম বলা হয়। দূর মফঃস্বলের ঢাকা শহরের এই তরুণ নিজের আঁকা কিছু চিত্র ডাকযোগে পাঠিয়ে দিলেন মাদ্রাজে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কাছে, তিনি তখন স্থানীয় আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল ছিলেন। দেবীপ্রসাদ ছিলেন মহৎ শিল্পী, গুণের কদর জানতেন। দু’জনের সঙ্গে পত্রসংযোগ স্থাপিত হ’ল এবং কিছুকাল পরে তরুণ পরিতোষ পদ্মা পার হয়ে চ’লে গেলেন মাদ্রাজ আর্ট স্কুলে। ঢাকা পিছনে প’ড়ে রইল।

কিন্তু পরিতোষ ঢাকাকে ভোলেননি। তাঁর বাল্য অভিজ্ঞতার গ্রাম ভোলেননি! ভোলেননি তো আরো কত দৃশ্য ও ব্যক্তিকে। ঘুড়ি ওড়াবার কাটাকাটি করার প্রতিদ্বন্দ্বিতা—সে কী অসহনীয় উত্তেজনা, আর ঘুড়ি-শাস্ত্রের কত সূক্ষ্ম, কত বিচার-তীক্ষ্ণ নিপুণতা! দর্জি হাফিজ মিঞা তো শুধু অর্থকরী কাজ করত না, তার কাজ ছিল শিল্প, তার শিল্প ছিল কাজ, এবং সেজন্যই তার প্রতিটি কাজ দেখে অতি সংগতভাবেই বলা চলত, ‘কামাল, কামাল! গজব, গজব!’ পরিতোষ সেন তো ভোলেননি সিন্-পেণ্টার জিতেন গোঁসাইকেও, যিনি সারাদিন কাজের পর প্রথম রাত্রে বিশ্রাম করতে বসেছেন বোতল এবং গ্লাস নিয়ে আর গান চালাচ্ছেন ‘পোড়ারমুখো কোকিল এসে / কুঁহু-কুঁহু করে লো।’

এরা আর ওরা আরো এবং অনেকে এসে আসর জমিয়েছে পরিতোষ সেনের বাক্‌চিত্রশালায়। বাক্‌চিত্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে নিপুণ চিত্রায়ণ—কালি দিয়ে

কলমের আঁচড়—তবু এই রচনাগুলির প্রধান মূল্য তাদের ভাষাশিল্পেই। শিল্পের বিভিন্ন রূপগুলি যে অলঙ্ঘ্য প্রাচীর দেওয়া কতকগুলি স্বতন্ত্র জগতের অধিবাসী নয়, শিল্পে-শিল্পে যে অন্তর্প্লাবন সম্ভব, এক শিল্পরূপ উপচে পড়তে পারে এবং পড়েও অপর শিল্পে, এ-কথা পরিতোষ সেন জানবেন না তো জানবেন কে? তিনি যে কয়েক বৎসর প্যারিসে কাটিয়েছিলেন, পিকাসোর কাছ থেকে তার কাজের সমাদর লাভ করেছিলেন সে তো নিবর্থক হওয়ার কথা নয়। পরিতোষ স্বদেশেও শিল্পের অন্তর্প্লাবনশক্তি বোধ করেছিলেন ব'লে আমার বিশ্বাস। আমার কাছে একখানা ফোটো আছে, আলমোড়াতে তোলা. পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছেন উদয়শঙ্কর, হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পরিতোষ সেন, যেন তিন শিল্পী তিন শিল্পের প্রতিভূ, যে তিন শিল্প পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায়। এক শিল্পে অন্য শিল্পের সংবেদনা সৃষ্টি করা অতীব দুরূহ কাজ, যদিও অসম্ভব নয়। গান গেয়ে নাচের চেতনা জাগানো যায়, শুধু নাচ দিয়ে গানের বোধ উদ্‌বুদ্ধ করা যায়। কবিতা দিয়ে একটি বিশাল হর্ম্যের কল্পনা জাগানো যায়, একটি নৃত্যভঙ্গিমায় প্রস্তর মূর্তিতে যেন একটি সাঙ্গীতিক স্বর পাওয়া যেতে পারে। ভাষার মতো বিচিত্রশক্তিসম্পন্ন, অঘটনপটিয়সী নৈপুণ্যবিশিষ্ট শিল্পের মাধ্যমে অন্য সব শিল্পের গুণই অল্পবিস্তর প্রকাশ করা যায়, তবুও এই রূপান্তরণ যে অতীব কঠিন কাজ সে-কথা না-মেনে উপায় নেই। আমার দৃষ্টিতে এই সুকঠিন কাজ উজ্জ্বল কৃতিত্বের সঙ্গে সাধন করেছেন পরিতোষ সেন, তাঁর চিত্রশিল্পীত্বের সঙ্গে মিলিয়েছেন বাক্‌-শিল্পীত্ব। যে-সব মানুষের কথা তিনি বলেছেন তারা যেন শরীরী সত্তা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে আমাদের সামনে, এই শরীরী সত্তা নির্মিত হয়েছে রঙে-রেখায়। যে-রঙ যে-রেখা চিত্রশিল্পের নয়, বাক্‌শিল্পের, অথচ তারা কাজ করেছে চিত্রশিল্পের বর্ণ-বৈচিত্র্যের। রঙের যে কী গভীর কী অপরূপ বিনিময় হতে পারে ভাষার ধ্বনির সঙ্গে, তার নিখুঁত দৃষ্টান্ত মেলে "আগুন" রচনাটিতে। লেলিহান অগ্নির লক্ষ-কোটি বর্ণসমাবেশ, তার লক্ষ-কোটি প্রতিকৃতি, তার বামে দক্ষিণে ঊর্ধ্বে বিদ্যুৎ গতি, তার অভ্যন্তরে অর্জুনের বিশ্বরূপ-দর্শন-সম্ভাবনা, এ সমস্তই সম্ভব হয়েছে এই অতুলনীয় রচনায়।

আমার বিশ্বাস এই রচনাগুলির পাঠক আমার মতোই মনে করবেন যে খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী পরিতোষ সেন প্রমাণ করেছেন যে তিনি একইসঙ্গে কুশলী বাক্‌শিল্পীও। তাঁর বাক্‌শিল্পের আরো সমাহার দেখে আমরা আনন্দিত হব।

অমলেন্দু বসু

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বছর দুই-আড়াই আগেকার কথা। গ্রীষ্মের এক মধ্যাহ্নে, লিটল্ ম্যাগাজিন 'কবিপত্র'র সম্পাদক শ্রী পবিত্র মুখোপাধ্যায় এবং শিল্প-সমালোচক শ্রী সন্দীপ সরকার একটি অনুরোধ নিয়ে আমার কাছে হাজির হলেন। অনুরোধটি ছিল যে, এই পত্রিকার জন্যে আমার বাল্য-আলেখ্য লিখে দিতে হবে। লিখতে ব'সে, প্রায় অর্ধশতাব্দী ধ'রে, স্মৃতিসৌধের অন্ধকার কোঠায় আবদ্ধ, ছোটোবেলাকার নানা কথা, নানা লোকজন, নানা অনুভব, এক অজানা সঞ্জীবনীর প্রক্রিয়ায় জীবাশ্ম পদার্থের নতুন প্রাণ পাওয়ার মতো, মিছিল ক'রে বেরিয়ে এল। প্রচলিত অর্থে স্মৃতিকথা লেখার প্রয়াসে ব্যর্থ হলাম। সাহিত্যিক ভানশীলতায় দুষ্ট হওয়ায় সেই লেখনী বাতিল ক'রে দিতে হ'ল।

ছবি আঁকাই আমার অনেক দিনের পেশা; লেখা নয়। ছবি আঁকার ফাঁকে-ফাঁকে পোর্ট্রেট, এমন-কি একই চিত্রপটে একটি গোটা পরিবারের প্রতিকৃতি আঁকায় আমি বরাবরই বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। তাই মনে হ'ল শব্দ দিয়ে প্রতিকৃতি রচনা করলে কেমন হয়! এই বইটি সেই প্রয়াসেরই ফল। দু-একটি রচনা তৈরি হবার পর সর্বশ্রী সত্যজিৎ রায়, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, নিখিল সরকার (শ্রীপান্থ), শান্তি চৌধুরী, সুরজিৎ দাশগুপ্ত প্রমুখ নিকট বন্ধুদের পড়তে দিই। তাঁদের সকলের কাছে একইসঙ্গে সমাদর, সমালোচনা এবং উৎসাহ পেয়ে, একের পর এক প্রতিকৃতি "এঁকে" যাই। সম্পাদনার কাজে নিখিল সরকার মহাশয়ের সাহায্যও পেয়েছি উদারভাবে। তাঁদের সকলের কাছেই আমি নানাভাবে ঋণী। বন্ধুবর এবং সহকর্মী শ্রী দীপঙ্কর সেনের অকৃপণ সাহায্যের জন্য আমি নানাভাবে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতাবদ্ধ।

যে নয়টি লেখা এই বইতে স্থান পেয়েছে, তার প্রত্যেকটিই 'এক্ষণ', 'অমৃত' এবং 'কৃত্তিবাস'-এ গত এক-দেড় বছরে, বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে।

বইটির 'জিন্দাবাহার' নামের সংক্ষেপ ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করি। ঢাকার নবাববাড়ির ঠিক পুব, পশ্চিম ও উত্তরের এলাকা-ক'টিই ছিল শহরের

প্রকৃত স্নায়ুকেন্দ্র। উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী হয়ে অনেকগুলো সরু পথ এই কেন্দ্রে এসে মিলিত হয়েছে। শহরের সবচাইতে বর্ণাঢ্য এলাকাও এইটিই। যেমনই বিচিত্র এখানকার বাসিন্দারা, তেমনই বিচিত্র এ-সব গলিঘুচির নাম—"জুমরাইল লেন", "আশক্ লেন" (ফাশি ইস্ক্ থেকে কী?), "জিন্দাবাহার লেন", আরো কত-কী। এই জিন্দাবাহার লেনেই আমার জন্ম। ষোলো বছর অবধি একটানা এই এলাকায় আমার জীবন কাটে। উর্দু "জিন্দেগী" (জীবন) থেকে "জিন্দা" (জীবন্ত, তাজা)। তার সঙ্গে "বাহার" ("বসন্ত") জুড়ে একটি অসাধারণ নামের সৃষ্টি। অর্থাৎ, "তাজা বসন্ত"। এই নামের স্রষ্টা যিনিই হোন-না কেন, তিনি যে নিতান্ত রসিক ছিলেন তাতে আর সন্দেহ কী!

এই গলিটি একটি বিশেষ কারণে প্রসিদ্ধ ছিল। সে-কথা অন্যত্র বলেছি। শহরের গরীব আমীর অনেক বাসিন্দাই তাদের জীবনকে "তাজা" রাখবার উদ্দেশ্যে জিন্দাবাহার লেনে আনাগোনা করতেন। তার চাইতেও বড়ো কথা নামটি "জীবন" সম্পৃক্ত এবং শাব্দিক ধ্বনিতেও সমৃদ্ধ। "জিন্দাবাহার" নাম রাখার পক্ষে এই কি যথেষ্ট নয়?

পরিতোষ সেন

দ্বিতীয় মুদ্রণের ভূমিকা

জিন্দাবাহারের অপ্রত্যাশিত এবং অসামান্য সাফল্যে আমি কিঞ্চিৎ বিমূঢ় এবং বিস্মিত। আনন্দিতও বটে। এই বইয়ের যে কোনোদিন একাধিক মুদ্রণ বেরুবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। আরও বিস্মিত হয়েছি এর সর্বজনপ্রিয়তায়। ছাত্র-ছাত্রী, সাহিত্যপ্রেমী এবং সাধারণ পাঠক, সাক্ষাতে, চিঠিপত্রে এবং টেলিফোন যোগে, কলকাতা, গ্রামগঞ্জ, প্রবাস, এবং ওপার বাংলা থেকেও, অনেকেই তাঁদের শর্তহীন এবং অকৃপণ সমাদর জানিয়ে আমাকে কৃতার্থ করেছেন। করেছেন দুই বাংলার পত্রপত্রিকার সমালোচকেরাও। তাঁরা সবাই আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন আরও লিখতে যদিও পেশাদারী লেখক হতে আমার বিন্দুমাত্রও বাসনা নেই। ছবি আঁকার ফাঁকে ফাঁকে কখনো বা যদি কলম ধরি (প্রবন্ধাদির কথা বলছি না), সেটা এ-কারণেই ক'রে থাকি যে ছবিতে যে-সব কথা অবলা থেকে যায়, তারই

প্রকাশের একটা অন্য ক্ষেত্র চাই ব'লে। আমার এ নূতন পরিচয় নেহাৎই আকস্মিক এবং এ-সম্বন্ধে আমি কোনো অলীক ধারণা পোষণ করি না।

ছবিই হোক আর লেখাই হোক, সৃজনশীলতার গুরুত্ব, আমার কাছে, এ-দুয়ের বেলায়ই সমান। তা রসোত্তীর্ণ হ'ল কি না, তা দর্শক এবং পাঠকই বিচার করবেন। তাছাড়া, সর্বোপরি আছে কালের বিচার যার কাছে অনেক কিছুই ধুয়ে মুছে যায়। পরিশিষ্ট থাকে খুব অল্পই।

সৃষ্টির রহস্য আমাকে প্রতিনিয়তই বিস্মিত করে। চিত্রকরের দৃষ্টিতে আমি তা প্রতি জাগ্রত মুহূর্তে অনুভব ক'রে থাকি। "আগুন" ও "হে অর্জুন" আমার এ অনুভবেরই অভিব্যক্তি। তেমনি বিস্ময় সৃষ্টি করে মানুষ, তার অসীম চারিত্রিক বৈচিত্র্যে এবং বৈশিষ্ট্যে। এ বই-এর বাকি রচনাগুলো তারই কয়েকটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত। মানবিক মূল্যবোধ এ সব-ক'টিতেই সক্রিয় আছে ব'লে আমার ধারণা। কারণ, সমগ্র মূল্যবোধের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের মধ্যে, এ-বোধই আমার কাছে সর্বোচ্চ। জিন্দাবাহারের দ্বিতীয় মুদ্রণের পাঠকের কাছে যদি এ-সত্যটি পৌঁছে দিতে পারি তাহলেই, আমার এই সামান্য সাহিত্যিক প্রয়াস সার্থক হয়েছে ব'লে মনে করব।

পরিতোষ সেন

"দর্জি হাফিজ মিঞা"

দর্জি হাফিজ মিঞা

ঢাকা শহরে আমাদের বাড়ি ছিল মুসলমান-প্রধান পাড়ায়। তাদের সঙ্গে আমাদের রেশিও ছিল প্রায় থ্রি-ইজ-টু-ওয়ান। দু-চার ঘর পেশাদারী মধ্যবিত্ত মুসলমান পবিবার ছাড়া, এ সম্প্রদায়ের বাকি সবাই-ই নানারকম স্বল্প আয়ের ছোটোখাটো দোকানদার ছিল। প্রায় অর্ধ শতাব্দী হতে চলল তাদের দেখিনি। তবুও তাদেব কথা বাদ দিয়ে আজও কেন জানি, ঢাকার কথা ভাবতে পারি না। শৈশব এবং কৈশোরের স্মৃতিপটের অর্ধেকের বেশিরভাগটাই জুড়ে আছে এরা। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে এবং বৈচিত্র্যে এরা ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। চেহারাও ছিল তেমনি মজাদার—একেবারে স্কুমার রায়ের ছড়া এবং গল্পের উপযুক্ত সব নায়ক।

খিটখিটে মেজাজের দর্জি হাফিজ মিঞা। নিশুতি রাতেব ডাকাতের মতো দেখতে, পনির-আখ্‌রোট-বাদাম-পেস্তার দোকানদার জব্বার মিঞা। দিবারাত্র মদের নেশায় মশ্‌গুল, ঘোড়াগাড়ির আস্তাবলের মালিক মির্জা সাহেব। কুচ্‌কুচে কালো, বিশালাকার এবং লোমশ হাতুড়ে ডেন্টিস্ট আখ্‌তার মিঞা। বিরাট পাকা তরমুজের মতো ভুঁড়িওয়ালা ফলবিক্রেতা আস্‌গর মিঞা। সদ্য-মাজা, রোদে-রাখা, পেতলের ডেক্‌চির মতো চক্‌চকে টাকওয়ালা তামাকবিক্রেতা কাল্লু মিঞা। সরু গোঁফওয়ালা রেস্টুরেণ্ট-মালিক করিম খানসামা। আর ছিল ওস্তাদ বাজিকর ঝুল্লুর মিঞা। কচ্ছপের মতো তাকে আস্তে-আস্তে, পা একগজ ফাঁক ক'রে হাঁটতে দেখে মনে হ'ত যে সে যেন নিজেকে হ্যাঁচড়াতে-হ্যাঁচড়াতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের বাড়ির ঠিক উল্টোদিকে, দশ হাতের মধ্যেই, হাফিজ মিঞার দর্জির দোকান। আসন ক'রে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে মিঞা কাঁচি হাতে যখন কোটের ছাঁট দিতে বসত তখন দেখে মনে হ'ত ঠিক যেন দীর্ঘদিন অনশনরত, ধ্যানমগ্ন, অস্থিচর্মসার, শ্লেটপাথরে খোদিত, গান্ধার শৈলীর অবিকল বুদ্ধমূর্তি। বুকের পাঁজরের খাঁচাটা যেন তার তিন জ' পেরেকের মতো সরু শরীরটা থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। খাঁচার তলায় পেটের গর্তটি যেন অবিকল একটি

আড়াই-সেরি দই-এর খালি ভাঁড়। শুধু উষ্ণীষের পরিবর্তে পচা পাটের রঙের কদমছাঁট চুল। আর ঐ রঙের আবছা যে গোঁফজোড়া ছিল, পরিচিত নানারকম মুসলমানী গোঁফের আকারের সঙ্গে তার কোনোরকম মিলই ছিল না। বলা বাহুল্য, ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে তার মিল এইখানেই শেষ। পেটের যাবতীয় রোগে ভুগে-ভুগে তার এমনই দশা হয়েছিল যে যা-ই খায়-না কেন তার লিভার ঘোরতর বিদ্রোহ ঘোষণা করত। তবুও পিচগোলা জলের মতো দেখতে ভীষণ কড়া চা, আর আবির জলের মতো লাল, তেল-লঙ্কার রগরগে ঝোলওয়ালা, 'কালেজা-কা সালন্', ঘি-চপচপে পরোটার সঙ্গে না খেতে পেলে তার মেজাজ তক্ষুনি সপ্তমে চ'ড়ে যেত। এ-রকম সময়ে আমরা অনেক দূর থেকে তার আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারতাম এই গোলমাল কিসের। পেটের রোগের সঙ্গে ক্রনিক সর্দি-কাশি থাকার দরুন তার গলা দিয়ে দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের আওয়াজ বেরুত। সকালবেলার গুরুগম্ভীর খরজের ভাঙা স্বর, রোদের উত্তাপ বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। দিনের আলোর সঙ্গে সরাসরি কোনো সম্পর্ক না-থাকলেও সন্ধের দিকে সে-স্বর যদিও-বা কিঞ্চিৎ নামত, মাঝে-মাঝে কারণ-বিশেষে বেশ তীব্র হয়ে উঠতে এতটুকুও দেরি হ'ত না। আর রেগে গেলে তো কথাই নেই। স্বরগ্রামের প্রত্যেকটি স্বরই তার গলা দিয়ে এমন জোরালো হয়ে বেরুত, হঠাৎ শুনলে মনে হয় যেন তখনকার দিনের চ্যাম্পিয়ন কুস্তিগির কিঙ্কর সিং, আর ততই বিখ্যাত বাঘ-লড়াকু শ্যামাকান্ত ঝগড়া করছে। আমরা তার নাম দিয়েছিলাম, 'পাঁপড়-তোড়-পালোয়ান'। অর্থাৎ তার গায়ে এত তাগত্ যে অনায়াসেই সে একটি পাঁপড় ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলতে পারে।

মিঞার খাবার আসত ইসলামপুর কিংবা বাবুরবাজারের একেক দিন একেক দোকান থেকে। বারো-তেরো বছরের অত্যন্ত গরিব একটি ছেলে, যেমনই নিকষ কালো তার গায়ের রঙ তেমনই মানানসই ছিল তার নাম। মাথায় তেল-মালিশ, গা-টেপা থেকে পানবিড়ি আনা, এমন-কি প্রাতঃকৃত্যাদি সারবার সময় জল ভ'রে বদ্না এগিয়ে দেওয়া ইত্যাদি যাবতীয় ফাইফরমাশ খাটত এই কাল্লুই। একধরনের বিহারী উর্দু এবং কুট্টি ভাষার এক আজব সংমিশ্রণে এদের মধ্যে কথাবার্তা চলত। হুকুম দেওয়া এবং সে-হুকুম যথার্থ তামিল হওয়ার ব্যাপারে মিঞার ভাবখানা ছিল দিল্লীর বাদশাহের মতো। হাজার হোক ঢাকার নবাববাড়ি তো কয়েক গজের মধ্যেই ছিল। তাছাড়া খোদ নবাবসাহেবের না-হলেও 'ডজন-ডজন ভাঞ্জা-ভাতিজার জামাকাপড় তো সে-ই তৈরি ক'রে দিত।

তাই একটু-আধটু নবাবী চাল হ'লই-বা, তাতে দোষের কী! যেদিন কাল্লু এসে খবর দিত যে 'আজ কালেজা-কা সালন্ খতম হো গাইস্', সেদিন মিঞার মেজাজের কোনো ঠিকঠিকানা থাকত না। যেন পৃথিবীর সব খাবারের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। মিঞা তা হলে খাবে কী! কাল্লু তাকে যতই বোঝাবার চেষ্টা করে 'সালন্ নাহি হ্যাঁয় তো কেয়া হুঁইস্? বিরিয়ানি হ্যাঁইস্, শিক আউর শামী কবাব, হ্যাঁইস্, চাপ, হ্যাঁইস, মাটান চপ, আউর কাটলিস হ্যাঁইস, মাটান কারি আউর কিমা হ্যাঁইস্'—কে শোনে! এ-সব মিঞার একটাও পছন্দ নয়। তার 'কালেজা-কা-সালন্' চাই-ই; কাল্লুকে হাতপাখার ডাঁট দেখিয়ে বলে, 'নাহিতো তেরা পিঠ্‌কা চামড়া উখার দেগা।' ভয়ে কাল্লু ক্যারার মতো কুঁকড়ে যায়। উপায় নেই। ঐ সালন্ যে তাকে যেমন ক'রে হোক জোগাড় করতেই হবে। প্রয়োজন হলে রাত-বেরাতে বাড়ি গিয়ে তার মাকে দিয়েই বানিয়ে আনতে হবে। তা না হলে তার আর রক্ষে নেই। যাই হোক, বেশিরভাগ দিনই কাল্লু তার মনিবের এই প্রিয় খাদ্যটি এপাড়া-ওপাড়া ঘুরে, কোথাও-না-কোথাও থেকে ঠিক এনে হাজির করত। এ-রকম সময়ে মিঞার ঠোঁটের কোণে একটি অস্পষ্ট হাসির রেখা মুহূর্তের জন্যে দেখা দিয়েই আবার মিলিয়ে যায়; যাতে কাল্লুর চোখে তা ধরা না পড়ে, পাছে যদি কাল্লুর সেবায় কোনোরকম ঘাটতি দেখা দেয়! কচিৎ-কদাচিৎ যেদিন সে এ বিশেষ খাবারটি হাজির করতে পারত না, সেদিন সত্যি-সত্যিই তার পিঠের চামড়ার দফারফা হ'ত। ঐ দৃশ্য দেখে মিঞার ওপর আমার রাগের সীমা থাকত না। মানুষ কি এমন জানোয়ার হতে পারে যে তার বুদ্ধি-বিবেচনা সব লোপ পায়? এই বুড়ো বয়সেও লোকটার সংযমের কোনো বালাই নেই কেন!

মিঞার দপ্ ক'রে জ্বলে-ওঠা আগুনের মতো এই মেজাজ এবং নবাবী চালের পেছনে ছিল একদিকে তার অসুস্থতা আর স্ত্রী-বিয়োগ এবং নিঃসঙ্গতা বোধ, অন্য দিকে ছিল তার কারিগরিতে অসাধারণ মুন্সিয়ানা, আর তেমনই গর্ব। অতি উঁচুদরের কারিগরি শুধু দর্জিগিরিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পায়রা-ওড়ানো এবং বিভিন্ন জাতের গেরোবাজের বীজ মিশিয়ে উঁচু জাতের পায়রার বংশ তৈরি করাতে সে ছিল ততোধিক পারদর্শী। সে-কথায় পরে আসছি। নবাবী আমলে 'ওস্তাদ' খেতাবটি হয়তো এমন লোকের জন্যেই রাখা থাকত।

একদিন বিকেলে দোতলার রাস্তার ধারের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় ত্রিপলের হুড্-দেওয়া একটি ফোর্ড গাড়ি এসে হাফিজ মিঞার দোকানের

সামনে দাঁড়াল। সেকালে সারাদিনে বড়জোর একখানা কি দু'খানা মোটরগাড়ি আমাদের জিন্দাবাহার গলি দিয়ে যাতায়াত করত। হুডের তলায় সওয়ারকে দেখবার জন্যে আমি বিশেষ কৌতূহলী। হাফিজ মিঞা শুয়ে ছিল। 'আস্-সেলাম্ ওয়ালেকুম্' ব'লে ধড়ফড় ক'রে উঠে বসল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই টকটকে লাল তুর্কি টুপি মাথায়, বিশুদ্ধ গাওয়া-ঘি রঙের রেশমী আচকান পরা, গৌরকান্তি একটি যুবক এক টুকরো পশমী কাপড় হাতে, গাড়িটা থেকে নামলেন। হাল্কা বাদামী রঙের দাড়ি-গোঁফ থাকা সত্ত্বেও যুবকের মুখাবয়ব কিঞ্চিৎ মেয়েলি। দর্জিকে কাপড়টা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'হামারা কোট্ বনা দী যেগা।' পৈটিক গোল-যোগের সঙ্গে বুকে শ্লেষ্মার আধিক্য মিঞাকে মাঝে-মাঝে ভীষণ কাবু ক'রে ফেলত। গভীর রাত্রিতে খ্যাকর-খ্যাকর কাশির আওয়াজে প্রায়ই আমার ঘুম ভেঙে যেত। এদিনও তার তবিয়ৎ এবং মেজাজ যে তেমন ভালো ছিল না, সকালবেলা থেকে কাল্লুর ওপর তার জুলুমের রকম দেখেই তা বুঝতে পেরেছিলাম। মিঞা খুব সরু গলায় এবং তমিজের সঙ্গে উত্তর দিয়ে বলল, 'মেহেরবানি করকে কাপড়া ছোড় যাইয়ে, আউর তিনরোজ বাদ আকে ট্রায়েল দে যাইয়েগা।' শুনে নবাবজাদার মাথার লাল তুর্কি টুপিটা প'ড়ে যায় আর কি! বললেন, 'লেকিন, লেকিন, আপতো হমারা নাপ্ হি নহি লিয়া, ট্রায়েল ক্যায়সে হোগা!' মিঞা আগের মতোই চাপা স্বরে যা বলল তার অর্থ, আপনি তিনদিন পরে আসুন তো তার পর দেখা যাবে। নবাবজাদা, কয়েক মুহূর্ত হতবুদ্ধি হয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। হয়তো ভাবছিলেন মিঞা কি নিছক ইয়ার্কি করছে! তার পর, কিছু না ব'লেই গাড়িতে ঢুকে পড়লেন। দর্জির আওয়াজ ক্ষীণ হলেও প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয়, দীর্ঘজীবনের কারিগরির অভিজ্ঞতা আর জ্ঞানের যোগফল যেন। তবুও মিঞার কথা বলার ঢং-ঢাং দেখে মনে হ'ল ওর তবিয়ৎ তেমন বহাল নেই ব'লে নবাব-জাদাকে তাড়াতাড়ি বিদায় দিতে চাইছে।

পরের দিন ভোরে উঠেই দেখি হাফিজ মিঞা কোটের কাপড় মেজেতে পেতে ওস্তাদ চিত্রকরের মতো, চ্যাপটা নীল চক দিয়ে, কোথাও সরল, কোথাও বক্র, অতি মার্জিত সব রেখা টানছে। মাঝে-মাঝে চোখ বুজে গভীরভাবে কী যেন চিন্তা করছে। নবাবজাদার শরীরের গঠন এবং আকৃতি অনুমান করার চেষ্টা করছিল কি? তপ্‌সে মাছের মতো সরু, লম্বা আঙুলগুলো এবং নীল চক ধরবার এবং তা দিয়ে টান-টুন দেবার কায়দা দেখে আমার মতো অপরিণত বয়সের বালকের চোখেও তাক লেগে যাচ্ছিল। আবার কয়েক মিনিট পর-পরই উঠে

দাঁড়িয়ে এক চোখ বুজে দেখছিল চকের দাগগুলো ঠিক-ঠিক জায়গায় ঠিক-ঠিক আয়তনে পড়ছে কি না। আমি অবাক হয়ে দেখছি আর ভাবছি মিঞা দর্জি না আর্টিস্ট। তার পর অতি সন্তর্পণে নীল দাগগুলোর ওপর দিয়ে কাঁচি চালাল। আমি তার দুঃসাহস দেখে হতভম্ব। যদি ভুলচুক্ ক'রে বসে? যদি আস্তিন ছোটো হয়ে যায়? যদি পিঠের ওপর খোঁচ পড়ে? এবং তার ফলাফল কী হতে পারে এ-কথা ভেবে আমার মনে নানারকম আশঙ্কা ঘোরাফেরা করতে আরম্ভ করল। বিলকুল্ কোনো মাপ না নিয়ে লোকটা কোট বানিয়ে দেবে এবং সেটা নবাবজাদার মতো বিশিষ্ট একজন গ্রাহক বিনা প্রতিবাদে মজুরি দিয়ে গ্রহণ করবে? প্রত্যেক জুম্মাবারে মোল্লা ডেকে দোকানে 'মিলাদ্-শরীফ' ক'রে মিঞা কি কোনো তুক্তাক্ হাসিল ক'রেছে না কি! না নেহাৎ পাগলামি করছে!

তিনদিন পরে মিঞার কাণ্ড দেখবার কৌতূহলে আমি দুপুরবেলা থেকেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। আমার বুকের ভেতরটায় অহেতুক এক দুশ্চিন্তা আনাগোনা করছে। যেন আমারই আজ অগ্নিপরীক্ষা হবে। যদি কোটটা সত্যিসত্যিই নবাবজাদার গায়ে ফিট না করে! কিন্তু মিঞা নীল আর খয়েরি রঙের লুঙ্গি আর একটা ময়লা গোলাপী রঙের গেঞ্জি প'রে নিশ্চিন্ত মনে দরজায় হেলান দিয়ে ব'সে একটি লোকের সঙ্গে পায়রার জাত নিয়ে অবোধ্য খুঁটিনাটির আলোচনায় মশগুল। এ-রকম সময় নবাবজাদা কেন, দুনিয়ার অন্য সব-কিছুর কথাই সে ভুলে যায়।

নির্দিষ্ট সময়ে ফোর্ড গাড়ি এসে হাজির। আমার উত্তেজনার সীমা নেই। মিঞা নবাবজাদাকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে আলমারি থেকে হ্যাঙারে ঝোলানো কোটটি আনবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। বিশেষ কোনো ব্যস্ততা নেই। নবাবজাদার ভ্রূ ঈষৎ কুঁচকোনো। চোখে-মুখে সন্দেহের ছাপ সুস্পষ্ট। আয়নার মুখোমুখি তাঁকে দাঁড় করিয়ে আলতো ক'রে কোটটি পরিয়ে দিল। এক অলৌকিক ব্যাপার। প্রায়, প্রায় নিখুঁত কাটিং অ্যাণ্ড ফিটিং। কাঁধের পুট, আস্তিন, বগল সব ঠিক। শুধু পিঠে একটু ভাঁজ পড়েছে। দেখে নবাবজাদার চোখ ছানাবড়া। মুখ হাঁ ক'রে নির্বাক হয়ে আয়নার সামনে জ'মে গেলেন। আমিও যেন পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য দেখছি। ওস্তাদ হাফিজ মিঞা নীল চকটা দিয়ে কোটের ওপর বীজগণিতের সংকেতের মতো দু-চারটি ছোট্ট-ছোট্ট হাল্কা দাগ বসিয়ে সে-সব জায়গায় আলপিন গেঁথে দিল। ছেলেকে আদেশ করল কী করতে হবে। নবাবজাদার মুখে যেন কে কুলুপ আটকে দিয়েছে। গাড়ির দরজা খুলে

ঢুকতে যাবেন আর কি, ঠিক সেইসময়ে একটু থেমে ওস্তাদ দর্জির দিকে মুখ ঘোরালেন। ঠোঁটের ডান কোণে কয়েক সেকেণ্ড ছোট্ট একটি হাসি ধ'রে রেখে বললেন, 'কামাল কামাল! গজব্, গজব্!'

ঘণ্টা দুয়েক পরে সুন্দর ভাঁজে কোটটি ভালো ক'রে ইস্ত্রি ক'রে সেটিকে হ্যাঙারে ঝুলিয়ে রেখে ছেলের মারফত নবাববাড়ি পাঠিয়ে দিল। কী অসাধারণ কারিগর! এই নিরক্ষর লোকটির বিশেষজ্ঞসুলভ বিদ্যা এবং দক্ষতা দেখে আমিও নবাবজাদার মতো বিস্ময়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

যদিও দর্জিগিরিই হাফিজ মিঞার মুখ্য পেশা ছিল, আসলে তার প্রাণ-মন প'ড়ে থাকত তার দোকানের ছাদে রাখা গেরোবাজ পায়রাগুলোর ওপর। আফিমের নেশার মতোই পায়রা-ওড়ানোর নেশা তাকে পেয়ে বসেছিল। ভোরে কাক ডাকার সঙ্গে-সঙ্গেই মিঞা ছাদে উঠে আসে। এইসময় তার সমস্ত অসুস্থতা, অবসাদ, জড়তা তার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে অনেক দূরে চ'লে যায়। আগের দিন সন্ধেবেলার চাটাইয়ের ওপর শোয়া নিস্তেজ বিশীর্ণ লোকটির সঙ্গে সকাল-বেলার এ-লোকটির কোনোই মিল নেই। উত্তেজনা-মিশ্রিত এক প্রবল কর্ম-চাঞ্চল্য ভূতের মতো তার ঘাড়ে চেপে বসে। তাকে দেখা মাত্রই পায়রাগুলো যেন খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে আসতে চায়। সেকি আনন্দ! সেকি ঠেলাঠেলি! যেন অনেকদিন পরে সন্তানেরা তাদের বাপ-মাকে ফিরে পেয়েছে। মুঠো-মুঠো ধান ছড়িয়ে দিয়ে যেই-না খাঁচার দরজা খুলে দেওয়া, বাঁধভাঙা নদীর জলের মতো পায়রার দল দানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু শেষ ক'টি দানা তার হাতে চ'ড়ে না খেতে পেলে যেন তাদের খাওয়াই শেষ হ'ত না। মনিব যেমন তার পোষা কুকুরের গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়, মিঞাও ঠিক তেমনি ক'রে তাদের আদর করে। আঃ কী মর্মস্পর্শী সে-দৃশ্য! এই পাখিগুলোর প্রতি তার মমতার কোনো ঠিকঠিকানা ছিল না।

দানা খাওয়া সারা হলেই নিশানের মতো লাল এক টুকরো কাপড় ডগায় বাঁধা একটি মুলি বাঁশের সাহায্যে পায়রাগুলোকে তাড়িয়ে আকাশে উড়িয়ে দেয়। পক্ষিজগতে এমন-কিছু কি আর আছে যার ডানাতে বে-লাগাম ঘোড়ার মতো প্রাণের উদ্দাম উচ্ছলতার এমন আশ্চর্য বিকাশ দেখা যায়! যে-ডানার প্রত্যেকটি পালক বিদ্যুতে ভরপুর এবং বিদ্যুতের মতোই ত্বরিত যার গতি! যার প্রত্যেকটি রোম চাঞ্চল্য আর উত্তেজনায় ভরা! এই পাখিগুলো প্রথমে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে, সোজা লাইন কেটে হাউইবাজির মতো শূন্যে ওঠে। পরমুহূর্তে

তেমনি সোজা লাইনে নিচের দিকে গোত্তা মারে। শাঁই-শাঁই ক'রে দিক্-বিদিক্ ছুটে যায়। আবার ফিরে আসে। মিঞা একহাতে মুলি বাঁশটি উঁচিয়ে ঘোরাতে থাকে, অন্য হাতে সাঁড়াশির মতো নিচের ঠোঁট চেপে ধরে, সরু মোটা ছোটো-বড়ো শিস্ দিতে থাকে। আকাশে বাতাসে এক সাংঘাতিক উত্তেজনা, এক সাংঘাতিক কর্মচাঞ্চল্য! তার পরই, অপরূপ, মনোরম এক দৃশ্য। চল্লিশ-পঞ্চাশটি খানদানি গেরোবাজ পায়রা যখন একই সঙ্গে, একই ছন্দে, চক্রাকারে ডিগবাজির পর ডিগবাজি খেতে থাকে তখন মনে হয় যেন আকাশে পাখিদের ব্যালে-নৃত্য দেখছি। তাদের ডানায় আর বুকে উষার গোলাপী আলোর ছোঁয়ায় মনে হ'ত যেন হাউইবাজি থেকে সারি-সারি গোলাপ ফুটে বেরুচ্ছে। আঃ! সে-কী বাহার! কী অপূর্ব! এ দৃশ্য দেখে আমার মনটাও উড়ি-উড়ি করে। এক অদমনীয় চঞ্চলতা আমাকে অস্থির ক'রে তোলে। ক্রমাগত ডানা ঝাপটা দিয়ে উঠে মহাকাশে মিলিয়ে যায়। নিছক উড়ে বেড়াবার একরকম নির্ভেজাল আনন্দ পাওয়ায় পক্ষিজগতে পায়রার জুড়ি বোধ হয় আর তেমন নেই। ডানায় ভর ক'রে প্রহরের পর প্রহর শূন্যে ভেসে বেড়াতে চিল-শকুনদেরও তুলনা নেই। কিন্তু সেই ডানায় না আছে ঝাপটা, না আছে উচ্ছলতা। তবুও ঝোড়ো হাওয়ার ডগায় ঘন কালো মেঘের বাহনে গা এলিয়ে দিয়ে দূর থেকে বৃত্তাকারে যখন এই পাখিরা ঘুরে-ঘুরে ভেসে আসে, সে-দৃশ্য সে-আনন্দই বা কম কিসের! দেখতে যেমনই চমৎকার, চোখেও তেমনি আরামদায়ক। শরীরের আঁটো মাংসপেশীগুলো শিথিল হয়ে আসে। মন আপনাআপনিই এলিয়ে পড়ে। নাগরিক জীবনের নানা চাপে প্রসারিত মন সাময়িক মুক্তি পায়। গগন ঠাকুর তো তাই চীনে কালিতে ঐ-দৃশ্যের খাসা কয়েকটি ছবি এঁকেছিলেন।

অন্যান্য পায়রা-পাগল লোকদের মতো পায়রা নিয়ে বাজি খেলায় হাফিজ মিঞার বিন্দুমাত্রও উৎসাহ ছিল না। এ-বিষয়ে তার বেশ-একটু নাক-উঁচু ভাব ছিল। তার কাছে এটি অতি নিকৃষ্ট ধরনের খেলা। এই পাখিদের প্রথমে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে উড়তে শেখানো এবং পরে তাদের বিশেষ ধরনের ট্রেনিং দেওয়ায় মিঞার পদ্ধতি ছিল পুরোপুরি সামরিক। মিঞাও ঠিক যেন আনকোরা জোয়ানদের ট্রেনার। এককথায় সার্জেণ্ট মেজর। তা সত্ত্বেও পায়রা ওড়ানোকে সে যে একটি চারুকলার স্তরে তুলে ধরেছিল, এ-সত্যটি ঢাকা শহরে তার সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীরা, হিংসাবশত সামনাসামনি প্রকাশ না-করলেও মনে-মনে একবাক্যে স্বীকার ক'রে নিয়েছিল।

মিঞার পায়রাদের মধ্যে মনুষ্যজগতের ক্যাসানোভার মতো অনেকগুলো মরদ 'লুটেরা' পায়রা ছিল। অন্য পায়রার দলে ঢুকে তার থেকে বাছাইকরা মাদী পায়রাগুলোকে ভাগিয়ে আনাতে তাদের কেরামতি দেখে আমার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। এ বিশেষ পায়রাগুলোকে মিঞা তৈরি করত নানাজাতের খানদানি পায়রার সংমিশ্রণে—যেমন 'বেনারসী কাগ্‌জি'র সঙ্গে 'বাংলার কাগ্‌জি', 'সাব্‌ডুম'-এর সঙ্গে 'নাসরা', 'প্লেন'-এর সঙ্গে 'অপরাজিতা প্লেন', 'সব্‌চিনিয়া'র সঙ্গে 'কাগ্‌জি' ইত্যাদি। মিঞার মতে 'নাস্‌রা'র নজর নাকি সবচেয়ে তীক্ষ্ণ এবং 'বাজি' দেখাতে এর নাকি জুড়ি নেই। একনাগাড়ে দীর্ঘকালব্যাপী আকাশে উড়ে বেড়াতে 'প্লেন' পায়রা নাকি তুলনাহীন। এ-বিষয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষায় প্রাপ্ত বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞানের ছিটেফোঁটা পাবার লোভে অনেকেই তার কাছে আনাগোনা করত। নির্ভেজাল খোশামোদ থেকে তার পা-ছোঁয়া পর্যন্ত কিছুই বাদ যেত না। কিন্তু এই জ্ঞানের এবং দক্ষতার মালিকানা যে শুধু তারই। 'আচ্ছা, দেখা যাবেখন্‌, আজ শরীরটা তেমন জুত-সই মনে হচ্ছে না, আরেকদিন হবে', এইভাবে টালবাহানা ক'রে তাদের বিদায় দিত। এ-ব্যাপারে তার ভাবখানা ছিল বাঘা-বাঘা মুসলমান গাইয়ে-বাজিয়েদের মতো। শুনেছি ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেব এভাবে তাঁর গুণমুগ্ধদের অনুরোধ খারিজ ক'রে দিতেন।

নেশা—তা আফিম-গাঁজা-ভাঙেরই হোক, আর পায়রা-ওড়ানোরই হোক, সঙ্গী না জোটাতে পারলে তা তেমন জমে না। সারা সকাল পায়রা-ওড়ানো আর বাকি দিন পেশাদারী কর্মব্যস্ততার আড়ালে তার জীবন ছিল নিতান্তই নিঃসঙ্গ। কিছুকাল আগেই তার স্ত্রীবিয়োগ হয়েছিল। পরিবার বলতে শুধু একটিমাত্র ছেলে। এই ছেলে দর্জিগিরিতে তার সঙ্গে সামিল থাকলেও পায়রার ব্যাপারে তার বিশেষ উৎসাহ ছিল না। তাছাড়া সন্ধে হলেই তার সমবয়সীদের আড্ডায় সে চ'লে যেত। এ-সময় থেকে সারারাত মিঞার কাছে এক অনন্তকাল। শরীরের যাবতীয় অভিযোগও তখনই মাথা চাড়া দিয়ে উঠত, এবং এ-সময় থেকেই কাল্লুর অবিরাম সেবা তার পক্ষে অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠত। পাঁজর বের-করা কঠিন আস্তরণের তলায়, অন্যান্য পাঁচটি স্বাভাবিক লোকের মতো তার মনেও নানা কথা নানাভাবে জ'মে ওঠে। নিকট কাউকে সে-কথা বলতে পেরে হাল্কা বোধ করা—খাওয়া-পরার মতোই এটাও তো প্রত্যেক মানুষের নিতান্তই প্রাথমিক প্রয়োজন। যাই হোক, নেশাখোরের সঙ্গী যদি তার বিশ্বস্ত আর গুণ-

মুগ্ধ হয়, তা হলে তো আর কথাই নেই। আমার অগ্রজের মধ্যে এ-দুয়ের সংমিশ্রণ পেয়ে মিঞা, জুনিয়র পার্টনার হিসাবে তাকে সানন্দে দলে টেনে নিল। নিজের ছেলের মতো আমার ভাইকেও একই স্নেহের চোখে দেখত। স্বভাবতই মিঞার সুখদুঃখের কাহিনীর—তা নিজেরই হোক আর তার পোষা পায়রাদেরই হোক—একমাত্র অংশীদার সেই হ'ল। একেক দিন রাত এগারোটা পর্যন্ত এই আদানপ্রদান চলত। এই নেশা যে কী সাংঘাতিকরকম ছোঁয়াচে হতে পারে, তার প্রমাণ পেতে বেশি দেরি হ'ল না। অল্পদিনের মধ্যে আমিও যে কখন বেমালুম এদের দলে ঢুকে পড়েছিলাম টেরও পাইনি।

ঠাকুরদার আমল থেকেই আমাদের বাড়িতে কিছু সাধারণ গোলা পায়রা ছিল। মিঞার পরিচালনায়, পায়রা-ওড়ানোয়, পায়রার অভিজাত বংশ তৈরি করার অসাধারণ উত্তেজনায় আমরা দু-ভাই মেতে উঠলাম। আমাদের খাওয়া-দাওয়া খেলাধুলো লেখাপড়া শিকেয় উঠল। এই নেশা যে মানুষকে কীভাবে অভিভূত ক'রে ফেলে, যাঁরা একবার এর খপ্পরে পড়েছেন, শুধু তাঁরাই জানেন। যাই হোক, আমার ক্ষেত্রে এই নেশার মেয়াদ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি ; কারণ আমি তার পরিবর্তে আরো ভয়ানক আরেক নেশার কবলে পড়লাম। সে-কথা অন্যত্র বলব।

একদিন বিকেলে আমরা দু-ভাই স্কুল থেকে ফেরবার সঙ্গে-সঙ্গেই মিঞা আমাদের জানাল যে নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা শহরের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত পায়রার এক রেস হবে। প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ ঝাঁক পায়রা এই প্রতিযোগিতায় নামানো হবে এবং এই রেসের কক্ষপথ নাকি আমাদের পাড়ার ওপর দিয়েই। মিঞার প্ল্যান হচ্ছে যে যেমন ক'রেই হোক এই-সব দল থেকে বাছাইকরা পায়রাদের ভাগিয়ে আনতে হবে। এই ফন্দিতে মিঞা যেমনই উত্তেজিত, তেমনই দৃঢ়-সংকল্প। আমরা দু-ভাই যেন তাকে যোগান দিতে প্রস্তুত থাকি। এই উত্তেজনার জ্বর আমাদেরও এমনভাবে স্পর্শ করল যে সারারাত প্রায় ঘুমই এল না।

পরদিন সকালে কাক ডাকার আগেই ছাদে উঠে এলাম। মিঞা অবিশ্যি তার আগেই উঠে এসে দানা জল ইত্যাদির সব ব্যবস্থায় ব্যস্ত। ছেলেকে মোতায়েন করেছে সংলগ্ন বাড়ির তেতলার ছাদে। আর কাল্লুকে পাঠিয়েছে আমাদের পাড়ার মসজিদের আজান দেবার গম্বুজে। আমাদের নির্দেশ দেওয়া হ'ল পুবের আকাশের দিকে দৃষ্টি রাখতে, কারণ পায়রার দল পুব থেকে পশ্চিমের দিকেই যাবে।

আমাদের জোড়া-জোড়া চোখ দূরবীনের মতো সেই আকাশকে তন্ন-তন্ন ক'রে যেন ঈদের চাঁদ খুঁজছে। ফিনফিনে মসলিনের চাদরের মতো হাল্কা কুয়াশায় গোটা শহর ঢাকা। ওপরে শীতের প্রভাতের মোলায়েম সোনালী আলোয় সারা আসমান সদ্য তৈরি পেতলের চাদরের মতোই ঝকঝক করছে। দু-চারটে কাক আর শালিকের ছোট্ট-ছোট্ট কালো বিন্দু ছাড়া এই আসমান যেন ছবি আঁকার আগে চিত্রকরের নিষ্কলঙ্ক ক্যানভাস।

হঠাৎ মসজিদের মিনারের দিক থেকে একটা আওয়াজ ভেসে আসায় আমাদের কান তৎক্ষণাৎ খাড়া হয়ে উঠল। কাল্লু চি কার ক'রে বলছে, 'আ রহিস, আ রহিস।' আমাদের চোখ বিস্ফারিত। নবাববাড়ির সদর প্রবেশ-পথের গম্বুজ, বাড়িঘর, জগন্নাথ কলেজ ইত্যাদির ওপর দিয়ে আমাদের দৃষ্টি ছোটে পুবের দিগন্তে। পায়রা তো দূরের কথা, একটা চড়ুই-ফিঙেও চোখে পড়ছে না। কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকতেই দেখি একটা আবছা ধোঁয়া আকাশের দিকে কেঁপে-কেঁপে উঠছে। হয়তো নারায়ণগঞ্জের পাটকলের ধোঁয়া হবে, কে জানে? তাছাড়া, এই সাতসকালে কত উনুনের ধোঁয়াই তো এইরকম আকাশে উঠে মিলিয়ে যায়। যাই হোক, মৃত বিশীর্ণের ওপর শকুনের চোখের মতোই আমাদের জোড়া-জোড়া চোখও সেই ধোঁয়ার ওপর দৃঢ়সংবদ্ধ। কিন্তু এ-ধোঁয়া যে ক্রমশই গাঢ় হয়ে ভাদ্রের এক টুকরো কালো মেঘের মতোই এগিয়ে আসছে। হঠাৎ দেখি মিঞা ভীষণ তৎপর হয়ে উঠল। পায়রার খাঁচার দরজাগুলো পর-পর খুলে দিল। বের হবার সঙ্গে-সঙ্গেই লাল নিশানওয়ালা সেই মুলি বাঁশটি দিয়ে পায়রাদের তাড়িয়ে আকাশে উড়িয়ে দিল। সুঁই, সুঁই...সুঁই-ই আওয়াজে শিস্ দিতে আরম্ভ করল। আমরাও শিসের ঐকতান জুড়ে দিলাম। নিস্তব্ধ, নিশ্চল, ভোরের আকাশ-বাতাস হঠাৎ প্রবল উত্তেজনায়, কর্মচাঞ্চল্যে আর উৎকণ্ঠায় ভ'রে উঠল। সেই কালো মেঘটি দেখতে-না-দেখতেই খণ্ড-খণ্ড হয়ে, সারা পুবের দিগন্ত ছেয়ে শাঁই-শাঁই ক'রে এগিয়ে আসছে। আমরা পরিষ্কার তার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। মিঞার পায়রার দল ইতিমধ্যে সম্ভাব্য কক্ষপথে চক্কর কাটতে আরম্ভ করেছে। ঝড়ের সুপুরি গাছের মতো মুলি বাঁশটি কখনো ডাইনে কখনো বাঁয়ে দ্রুত বেগে সে দোলাতে থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রের ফৌজি লোকদের মতোই নিশানের নানারকম সংকেত করতে থাকে। ইতিমধ্যেই প্রতিযোগী পায়রার দল তড়িৎ বেগে এগুচ্ছে শৃঙ্খলিত গঠনে, যেন শত্রুপক্ষের এরোপ্লেনের দল আসছে। এই দল যেই-না আমাদের পাড়ার ওপরে আসা, মিঞার পায়রারা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে,

প্যারা-ট্রুপার্সদের মতো, ভিন্ন-ভিন্ন প্রতিযোগী দলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তাদের লক্ষ্য হ'ল সবচেয়ে এগিয়ে-যাওয়া দলের থেকে পায়রা ভাগিয়ে আনা। মিঞাও ক্ষিপ্ত হয়ে, তাদের শিসের মাধ্যমে, তার নানারকম অদৃশ্য সংকেতলিপি পাঠায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার পায়রার দল অপরিচিত দলের থেকে বেশ কয়েকটি পায়রা সঙ্গে ক'রে শাঁই-শাঁই-শাঁই ক'রে আকাশের ওপরের দিকে উঠে গেল। আর উঠতে-উঠতে অনন্ত নীলিমায় মিশে গেল। আমরা দু-ভাই সাংঘাতিক উদ্‌বিগ্ন। দেখি মিঞা নিশ্চিন্তমনে ছাদের নীচু পাঁচিলে ব'সে একটা বিড়ি ধরাচ্ছে। যেন সব-কিছু ঠিক আছে। তার এই প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয় দেখে আমরা দু-ভাই হতভম্ব। বিড়িটা শেষ না-হতেই তার থেকে আরেকটা বিড়ি ধরাল। সেটি শেষ হবার আগেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অস্বাভাবিকরকম তৎপরতার সঙ্গে গোটা ছাদটাকে ঝাঁট দিল। তার পর মুঠো-মুঠো ধান ছড়াল। মাটির গামলাগুলোকে ফাঁক-ফাঁক ক'রে রেখে জলে টইটম্বুর ক'রে দিল। থেকে-থেকেই আকাশের দিকে চায়, আবার চোখ নামিয়ে আনে। এ-রকম কয়েকবার করার পরই মিঞা আমাদের ইশারা করল ছাদ থেকে নেমে যেতে। হঠাৎ বেতারে কোনো বার্তা পেয়েছে যেন। তার ছেলেও সংলগ্ন বাড়ির ছাদ থেকে নেমে গেল। আমরা দৌড়ে দোতলার বারান্দায় এসে হাজির হলাম। দেখি মিঞা তার ছাদের দরজার আড়ালে আত্মগোপন ক'রে আছে। পায়রার দল যে এখন আকাশ থেকে নামছে তা বুঝতে আমাদের কোনোই অসুবিধে হ'ল না।

এইখানেই মিঞার ট্রেনিং-এর বৈশিষ্ট্যের কথা ব'লে রাখি। মহাকাশে উড়ে দলচ্যুত পায়রাগুলো যখন ক্লান্তি, ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় ছটফট করে, তখনই তার মরদ পায়রাগুলো তাদের সঙ্গে ক'রে ছাদে নেমে আসে। অপরিচিত পরিবেশ দেখে নতুন পায়রাগুলো অস্বস্তি বোধ করে। বিপদের আশঙ্কায় পালাবার চেষ্টা করে। সঙ্গে-সঙ্গে মরদ পায়রাগুলো উড়ে গিয়ে তক্ষুনি তাদের ঘিরে ফেলে, ফিরিয়ে নিয়ে আসে। বলা বাহুল্য যে এ-ধরনের 'ডাকাতি'র জন্যে মিঞার শত্রুসংখ্যা, স্বভাবতই, দিন-দিন বেড়ে উঠছিল। যাই হোক, তার 'ডাকাত' পায়রাদের কার্যক্রমের অবিশ্যি এইখানেই ইতি। বাকি ক্রিয়াকলাপের ভার এইবার মিঞা সম্পূর্ণ নিজের ঘাড়ে তুলে নেয়। এদিকে ক্ষুধার্ত পাখিগুলো হাপুস-হুপুস ক'রে দানা গিলছে ; পরমুহূর্তেই ঠোঁট দিয়ে চোঁ ক'রে জল শুষে নিচ্ছে। তাদের এই মগ্নতার সুযোগ নিয়ে হুলো বেড়ালের মতো নিঃশব্দপদক্ষেপে মিঞা খাঁচাগুলোর দরজা, বেশি নয়, মাত্র তিন-চার ইঞ্চি নাগাদ ফাঁক ক'রে দেয়। তার ভেতরেও

প্রচুর ধান আর জল আগে থেকেই রাখা ছিল। ছাদের ধান নিঃশেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে ভাগিয়ে-আনা পাখি ক'টিকে দলের মাঝখানে রেখে মিঞার পায়রারা রীতিমতো তাদের ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে যায় খাঁচার ধানের দিকে। কী আশ্চর্য ট্রেনিং! কী তার সূক্ষ্ম কারিগরি! এদিকে খাঁচার ভেতর অসম্ভব ভিড়ে সব-কিছু তালগোল পাকিয়ে গেছে। এই তো তাদের বন্দী করবার সুবর্ণ সুযোগ! দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে ওত-পাতা বাঘ যেমন শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তেমনি বিদ্যুৎ বেগে ছুটে এসে মিঞা ক্ষিপ্রহাতে খাঁচার দরজাগুলো নামিয়ে দিল।

নাটকীয় ঢঙে নবাবজাদারই মতো আমিও মনে-মনে বললাম, 'কামাল, কামাল! গজব্, গজব্!'

সিন্ পেংটার ত্রিতেন গোঁসাই

সিন্ পেণ্টার জিতেন গোঁসাই

ঢাকা শহরে আমাদের বাড়ির দক্ষিণে একটি কালীমন্দির। বাবুরবাজার-ইসলাম পুরের জনাকীর্ণ এবং পরিবহনবহুল সদর রাস্তাটি এই মন্দিরের সামনে দিয়েই। বিপরীত দিকে একটি পর্তুগীজ গির্জে। খ্রীস্টানদের সব চাইতে পুরনো প্রার্থনাস্থল ব'লে এটি প্রসিদ্ধ ছিল। মজার ব্যাপার এই যে গির্জের শতকরা একশোজন প্রার্থনাকারীই শ্বেতাঙ্গদের দৃষ্টিতে ছিল নেটিভ খ্রীস্টান। সাহেবরা এ-গির্জের ছায়া মাড়াতেন না। গির্জের সংলগ্ন পুবদিকে একটি মসজিদ। নানা ধর্মের এই মিলনক্ষেত্রে সবধরনের জড়বাদীরাও যে মিলিত হবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে! যেখানেই ধর্মের প্রকাশ্য ব্যবসায়িক বিকাশ, সেখানেই অর্থগৃধ্নুতা, লাভলোকসান, প্রবঞ্চনা—সেখানেই তো কাম-লালসার চমৎকার সব আয়োজন। দেশবিদেশে সর্বত্র ঐ একই নিয়ম। তাই নানারকম দোকানপাটের একশো গজের মধ্যেই একটি সদর রাস্তার উত্তরে এবং আরেকটি দক্ষিণে—দুই শ্রেণীর বারবনিতাদের দুটি ঘন বসতি ছিল। সদর রাস্তা হলেও বস্তুত এটি একটি বাজার ছিল। সারি-সারি ফলের দোকান, কাবাব-পরোটার দোকান, বাখরখানির দোকান, মিষ্টির দোকান, দেশি-বিলিতি মদের দোকান, তামাকের দোকান, মনোহারী দোকান, পসারির দোকান, ঘুড়ির দোকান, ফুলের দোকান, হারমোনিয়ামের দোকান ইত্যাদি। কালীমন্দিরের বাঁ-পাশেই অক্ষয়বাবুর চায়ের দোকান। সেখানে সর্বদাই লোকজনের ভিড় আর নির্ভেজাল আড্ডা।

তারই সংলগ্ন এক চিল্‌তে আর-একটি দোকান—প্রস্থে পাঁচ কিংবা ছয় ফুট, কিন্তু গভীরতায় ছিল পনেরো থেকে কুড়ি ফুট। এই বিশেষ দোকানটির ভেতর শুধু একটি লোকেরই ভিড়। আশেপাশের দোকানগুলোর থেকে এটি এতই স্বতন্ত্র, যেন একঝাঁক দাঁড়কাক-চিল-শকুনদের মধ্যে একটি নীলকণ্ঠ ময়ূরের আগমন। যেমনই স্বতন্ত্র ছিলেন এই দোকানের মালিক তেমনই ছিল তাঁর কাজকর্ম। বয়স প্রায় ষাট থেকে পঁয়ষট্টি। লম্বা সুঠাম দেহ। গড়পড়তা বাঙালিদের তুলনায় বেশ

ফর্সা। গায়ের চামড়ায় এখনো কোনো ভাঁজের লক্ষণ নেই। মেজাজ গুরুগম্ভীর। লম্বা তীক্ষ্ণ নাক। তার তলায় স্যার আশুতোষ-মার্কা গোঁফ। কানের পাশে গালপাট্টা। মাথায় থোকা-থোকা আধপাকা ঢেউ-খেলানো লম্বা চুল, ছোট্ট একটি পাহাড়ি জলপ্রপাতের মতো ঘাড় অব্দি নেমে এসেছে। গায়ে ময়লা গেঞ্জি। মালকোঁচামারা ধুতি। কোমরে সাদা-লাল ছককাটা গামছা। নেহাৎ প্রয়োজন না-হলে তিনি তাঁর এক চিল্‌তে দোকানটি থেকে নড়াচড়া করেন না। কিন্তু পরিষ্কার জামাকাপড় প'রে ছাতা হাতে যদিও-বা কোথাও যেতেন, তাঁকে দেখে কেউ যদি আদালতের কড়া বিচারক ব'লে ভুল করে ত'তে অবাক হবার কিছু ছিল না।

জিতেনবাবুর, অর্থাৎ জিতেন গোস্বামীর আসল পেশা ছিল থিয়েটারের সিন্‌-সিনারি আঁকা। বাঁশে আটকানো মস্ত বড়ো থান কাপড় ছাদ থেকে ঝুলে মেঝে অব্দি নেমে এসেছে। চার দিকে অসংখ্য ছোটো-বড়ো হাঁড়িকুড়ি, কৌটো, গ্লাস এবং ময়লা খবরের কাগজ ছড়ানো। ধোপার গামলায়, বাল্‌তিতে ময়লা আধময়লা এবং পরিষ্কার জল। নানা সাইজের লম্বা-লম্বা কয়েকটি তুলি জলে ডোবানো। আর কয়েকটি টুলের ওপর সাজানো। তারই সঙ্গে ঠেলাঠেলি করছে কয়েকটি ছোটো-বড়ো জুতোর ব্রুশ। ঘরের শেষপ্রান্তে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একই উচ্চতার অনেকগুলি খালি বোতল। সেগুলো যে ওষুধের বোতল নয় তা তাদের নগ্ন গা দেখে সহজেই বোঝা যায়। এরই কাছাকাছি জানলার থাকে রাখা আছে ময়লা ছেঁড়াপাতার বেশ-কিছু বাংলা নাটকের বই।

সিন্‌ আঁকা ছাড়া জিতেনবাবুর কাছে থিয়েটারের টুকিটাকি নানারকম জিনিস—রাজারানীর সিংহাসন, ছোটোখাটো পাহাড়, বিশেষ-বিশেষ চরিত্রের জন্যে ঢাল-তলোয়ার, গাছপালা ইত্যাদি তৈরি করবার ফরমায়েশও আসে। কাঠের ফ্রেমে পিচবোর্ড সেঁটে, তার ওপর যে-রঙটি যেখানে যেমন দরকার তেমনটি ক'রে লাগিয়ে দিয়ে হুবহু আসল জিনিসটির মতো তৈরি ক'রে সবাইকে তাক্‌ লাগিয়ে দিতেন। বড়ো সিন্‌সিনারি আঁকবার বেলায় জিতেনবাবু মোটা ব্রুশে মস্ত বড়ো-বড়ো পোঁচ মারেন। এ-ধরনের টুকিটাকি কাজের বেলায় তেমনই দেখাতেন তাঁর সূক্ষ্ম হাতের কারিগরি। চিত্রকর না-হয়ে যদি তিনি স্বর্ণকার হতেন, তাঁর পসার বেশি ছাড়া কম হ'ত না। বড়ো তুলির কাজই হোক আর ছোটো তুলির কাজই হোক, প্রহরের পর প্রহর তাঁর গভীর তন্ময়তা এবং আত্মনিয়োগ দেখে মনে হ'ত যেন তিনি স্বপ্নাবিষ্ট এবং অর্ধ-অচৈতন্য অবস্থায় অজানা এক শক্তির

নির্দেশে কাজ করছেন। তাঁর এই অবস্থার কাছে সময় যেন চিরস্থির। এমনই তাঁর নিষ্ঠা, কাজের প্রতি এমনই তাঁর শ্রদ্ধা যে যেতে-যেতে কোনো পথচারী তাঁর কাজে আকৃষ্ট হয়ে যদি হঠাৎ থেমে যেত, অত্যধিক বিরক্তিবোধে তক্ষুনি গুরুগম্ভীর চাপা আওয়াজে আদেশ দিতেন, 'যাও, আগে বাড়ো!' বহু-ব্যবহৃত এই উক্তিটি ওজনে তাঁর কণ্ঠস্বরে এমনই ভারী শোনাত যে, গড়পড়তা কৌতূহলী পথচারী বিনা প্রতিবাদেই তা মেনে নিয়ে চটপট অগ্রসর হতেন। ক্বচিৎ-কদাচিৎ যদি এ-কড়া আদেশ তামিল না-হ'ত জিতেনবাবু হাতের তুলির রঙ পথচারীর গায়ে ছিটিয়ে দিতে এতটুকুও ইতস্তত করতেন না। একাকিত্ব এবং নির্জনতা তাঁর কাছে এতই মূল্যবান যে দুটিকে তিনি যক্ষের ধনের মতো আগলে থাকতেন।

একেক দিন লেখাপড়া, খেলাধুলো ভুলে গিয়ে আমি এই লোকটির ভগবান-প্রদত্ত ক্ষমতা এবং প্রতিভার বিকাশ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দেখি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে একাকিত্বের এই ঘোরতর উপাসক আমার প্রতি শুধু প্রশ্রয়পূর্ণই ছিলেন না, এক নীরব কোমলতার হালকা বাতাস আমার হৃদয়তন্ত্রী-গুলোকে অস্ফুটভাবে ঝংকৃত ক'রে তুলত। তার কারণ হয়তো এই যে, নির্বাক হলেও আমি যে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গুণমুগ্ধ এবং সশ্রদ্ধ প্রশংসাকারী সে-খবর তিনি যে-কোনো প্রকারেই হোক টের পেয়েছিলেন।

সেদিন রবিবার। সকালবেলার পড়াশুনোর শেষে জিতেনবাবুর দোকানে একটু উঁকিঝুঁকি মারতেই দেখি শিল্পী টুলের ওপর ব'সে পায়ের ওপর পা চড়িয়ে হুঁকোয় ফুড়ুত-ফুড়ুত টান দিচ্ছেন, আর একদৃষ্টিতে সুমুখের ওপর থেকে ঝোলানো মস্ত বড়ো নিষ্কলঙ্ক থানকাপড়টির দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছেন। সদ্য চুনকাম-করা দেয়ালের মতো দেখতে কাপড়টিতে কিছু দেখতে পাচ্ছেন কি? কী ভাবছেন? কিসের ছবি আঁকবেন? মানুষজন, গাছপালা, পশুপাখি, না বাড়িঘর? এতবড়ো সাদা কাপড়টার কোথায়-কোথায় তিনি তাঁর তুলির প্রথম আঁচড় দেবেন? এ-সব নানা প্রশ্ন আমার মনে আনাগোনা করছে। শিল্পীর চোখ বরাবরের মতো সাদা কাপড়টির ওপর এমনই দৃঢ়সংবদ্ধ যে দরজায় আমার বেশ খানিকক্ষণের উপস্থিতি একেবারেই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। পরিষ্কার তুলি, নানা রঙ গোলা, হাঁড়িকুড়ি লাইন ক'রে খবরের কাগজের ওপর সাজানো। হুঁকোর টান ক্রমশই দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। বাঁ পায়ের হাঁটুর ওপর রাখা ডান পা-টি অসম্ভবরকম দুলতে আরম্ভ করল। চোখের ভ্রূ দুটির শেষ প্রান্ত বাঁকিয়ে উঠে দুটি ছোটো পাহাড়ের আকার ধারণ করে। দৃষ্টি আগের চাইতে

আরো তীক্ষ্ণ। শরতের প্রভাতের হাল্কা কুয়াশার মতো তামাকের ধোঁয়ায় সমস্ত ঘরটি আচ্ছন্ন। তারই ভেতর দিয়ে আসন্ন কিছু ঘটবার যেন জানান দিচ্ছে। হুঁকোটি নামিয়ে রেখে জিতেনবাবু খানিকক্ষণ চোখ বুজে রইলেন। এই অবস্থায় বিড়বিড় ক'রে নিজের মনে মন্ত্রের মতো কী-সব আওড়ান। তার পর, আবার কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থাকার পর হঠাৎ চোখ খুলে দাঁড়িয়ে উঠলেন। অনেকটা ঘুম থেকে আচমকা জেগে ওঠার মতো। এক হাতে গেরুয়া রঙের খুরি, অন্য হাতে লম্বা একটি তুলি। আবার চুপ। দেখি, হাঁটু অব্দি নামানো হাতের তুলিটি নড়াচড়া ক'রে উঠে শূন্যে কী-সব আবোলতাবোল রেখা টানছে। কোন্ মুহূর্তে হাতটি উঠে যে সাদা পর্দায় দাগ কাটতে আরম্ভ করেছে তা যেন তিনি টেরও পেলেন না। কখনো সরলরেখা, কখনো বক্র, কখনো ডাইনে, কখনো বাঁয়ে, কখনো নীচে, কখনো ওপরে, পর-পর রেখা পড়তেথাকল। লাফ দিয়ে টুলের ওপর উঠে পর্দার ডগায়ও এদিক-ওদিক সব রেখা টানলেন – যেমনই বলিষ্ঠ আর তেমনই ঋজু। তড়াক ক'রে নেমে, তুলি খুরি রেখে তামাক সাজলেন। অক্ষয়বাবুর দোকানের চায়ের উনুনের থেকে টিকে ধরিয়ে এনে কল্কিতে ফুঁ দিতে থাকলেন। যেমনই দ্রুত ফুড়ুত-ফুড়ুত আওয়াজ তেমনই দ্রুত চোখের পলক। কিন্তু দৃষ্টি সর্বদাই পর্দার ওপর। সেখানে ক্রমশঃ রেখার জঙ্গল গজিয়ে উঠেছে। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। হুঁকোটা দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখে জিতেনবাবু উঠে দাঁড়ালেন। জলে ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে এখানে-ওখানে কয়েকটা রেখা মুছে ফেললেন। আবার আঁকেন। এবার বিক্ষিপ্ত রেখাগুলোকে সন্তর্পণে জুড়ে দেন। অর্ধবৃত্তাকার একটি রেখা দুটি খাড়া রেখার সঙ্গে যুক্ত হতেই বোঝা গেল যে এটি ধনুকাকৃতি একটি খিলান। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আরো কয়েকটি খিলান ঐ রেখার জঙ্গল থেকে ফুটে বেরুল। লম্বা-লম্বা থামের ওপর এই খিলানগুলো ভর ক'রে আছে। জিতেনবাবু তুলি বদলালেন। এবার সরু তুলি দিয়ে সেই থামগুলোর পেছনে জালের মতো নক্সা কাটতে আরম্ভ করলেন। দু-পাশে দুটি এ-ধরনের নক্সা তৈরি হ'ল। তার মাঝখানে আঁকা হ'ল একটি দরজা। যেমনই দ্রুত হাতের গতি তেমনই তার আন্দাজ। জিতেনবাবু বাঁ-হাতে অন্য একটি রঙের খুরি, আর ডান-হাতে তুললেন একটি জুতোর ব্রুশ। সেটি খুরিতে ডুবিয়ে বড়ো বড়ো পোঁচে দরজার ভেতরকার সাদা জায়গাটি কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভরাট ক'রে ফেললেন। জালের নক্সার মাঝখানে দুটো ছোটো চৌকো এঁকে সে-গুলোকেও ভরাট ক'রে দিলেন ঐ রঙ দিয়ে। নক্সার ভেতর দিয়ে উঁকি দিল

ঘন নীল আকাশ। কী আশ্চর্য ক্ষমতা এই স্বল্পভাষী রহস্যময় গম্ভীর লোকটির। এই তো কিছুক্ষণ আগেই ছিল এটি একটি সাদা থানকাপড়। এটুকু সময়ের মধ্যেই তিনি তাতে একটি মস্ত ঘরের ভেতর দিয়ে শুধু নীল আকাশেরই নয়, তার তলায় বহু দূরে নদী গাছপালারও আভাস দিলেন।

জিতেনবাবু এরই মধ্যে অক্ষয়বাবুর দোকান থেকে টিকে ধরিয়ে এনে আবার হুঁকোয় ঘন-ঘন টান দিচ্ছেন। টানে বেশ একটা চাপা উত্তেজনা। চোখ আগের মতোই সামনের দিকে সংবদ্ধ। এবার কী আঁকবেন? কী রঙ লাগাবেন? ঘরটি কী ধরনের লোকের জন্য তৈরি হচ্ছে? জানলা-দরজা জালি এবং থামের নক্সার রকম দেখে মনে হচ্ছে, এটি তো কোনো সাধারণ ঘর নয়! হুঁকো রেখে শিল্পী ঘরের কোণ থেকে সরু ফুটরুলের মতো দেখতে লম্বা একটি কাঠের টুকরো তুলে আনলেন। সেটিকে কাপড়টির ওপর কোণাকুণি ফেলে বাঁদিকের মাঝামাঝি উচ্চতায় ধ'রে ডানদিকের কোণ থেকে শুরু ক'রে একফুট অন্তর সরল, ঋজু রেখা টেনে সামনের সমস্ত জায়গাটিতে ছড়িয়ে দিলেন। এবার তার উল্টোদিক থেকে তেমনি কোণাকুণি ঠিক ততগুলোই রেখা টেনে একটা ছকের মতো নক্সা তৈরি করলেন। রঙ-তুলি দুই-ই বদলে নিয়ে পালাক্রমে একেকটি ছক কালো রঙে ভরাট ক'রে দিলেন। তার পর, সূক্ষ্ম তুলির সাহায্যে প্রথম একটি সাদার ওপরে, তার পর একটি কালো ছকের ওপর ছাইরঙ মিশিয়ে আঁকাবাঁকা হালকা লাইন দিলেন। পরিষ্কার জলে-ভরা আরেকটি তুলির সাহায্যে এই লাইনগুলোকে মোলায়েম ক'রে দিলেন।

হঠাৎ জিতেনবাবু মুখ ঘুরিয়ে আমাকে এক প্রশ্ন ক'রে বসলেন। আমি ভয়ে জড়সড়। ভেতরটা ধক-ধক ক'রে উঠল। আশে-পাশে অক্ষয়বাবু, ব্রজবাবু, আখ্‌তার মিঞা, সাত্তার মিঞা—এমন কত পরিচিত, বয়োজ্যেষ্ঠ লোকই তো রয়েছে। তাঁদের জিজ্ঞেস না-ক'রে আমার মতো অর্বাচীনকে তিনি সমঝদার ধ'রে নিলেন কেন? 'বল্ তো, এ চৌকোগুলো কী?' আপাতদৃষ্টিতে তিনটি শব্দের এই প্রশ্নটি মামুলি হলেও আমি এতই ঘাবড়ে গেলাম যেন আমার মুখে কেউ কুলুপ আটকে দিয়েছে। অধৈর্য হয়ে যেন একটি ধমকের স্বরে আবার প্রশ্নটি আমার দিকে ছুঁড়ে মারলেন। আমি আঁৎকে উঠি। কী উত্তর দেব ভাবছি, হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে দরজা ঠেলে খাঁচার পাখি ফুড়ুত ক'রে উড়ে যাবার মতো বেরিয়ে গেল, 'দাবার ছক্'। 'দাবার ছক্ কেন? সাদা-কালো মার্বেলের মেঝেও হতে পারে!' একটু থেমে আবার তেমনই গম্ভীর আওয়াজে

বললেন, 'অত বড়ো দাবার ছক্ হয় কখনো ?' কথাগুলো ঐ এক চিল্‌তে ঘরটিতে সিংহের গর্জনের মতো শোনাল।

আমার নির্বুদ্ধিতা এবং অজ্ঞতা জাহির করার কি প্রয়োজন ছিল ? চুপ ক'রে থাকলেই হ'ত। কিংবা অনায়াসে বলা যেত 'জানি না'। নিজেকে বেশি চালাক ভেবে কীরকম বোকা বনতে হ'ল, এ-কথা ভেবে নিজের ওপর অসম্ভব রাগে আমার ভেতরটা টগবগিয়ে উঠেছে, এমন সময় জিতেনবাবু মুখ ঘোরালেন। গোঁফের তলায় মুচ্‌কি হাসি ধ'রে বললেন, 'ঠিক বলেছিস্।' ব'লেই আবার হুঁকোতে টান।

ঠিক বলেছি কি। এই যে উনি বললেন অত বড়ো দাবার ছক্ হয় না ? শিল্পী কি আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করছেন! হুঁকোর টান থামিয়ে বেশ নাটকীয় ঢং-এ বললেন, 'একি যেমন-তেমন দাবার ছক্ ? এই ছকে দিল্লীর জাঁহাপনা দাবা খেলবেন। সত্যিকারের জ্যান্ত ঘোড়া হাতি মন্ত্রী পেয়াদা সেপাই সৈন্য দিয়ে খেলা। বাদশাহের সঙ্গে তাঁর ওয়াজিরে-আজমের ম্যাচ্। প্রধানমন্ত্রী হারলে তাঁর শুধু চাকরিই যাবে না, সঙ্গে-সঙ্গে যাবে মুণ্ডুটিও। একি যেমন-তেমন খেলা!'

আমি আঁৎকে উঠি। বাবাঃ। কী সাংঘাতিক! দাবাখেলায় যুধিষ্ঠির তো শুধু রাজ্যই হারিয়েছিলেন। এ যে প্রাণ নিয়ে টানাটানি। মন্ত্রীর জন্যে স্বভাবতই আমার প্রাণে সহানুভূতির পাহাড় জ'মে ওঠে। তাই সাহস ক'রে জিতেনবাবুকে জিজ্ঞেস ক'রেই ফেললাম, 'আর যদি ?' কথাটি শেষ না-করতেই আমার মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে বললেন, 'স্বয়ং বাদশা হারলে মন্ত্রী পাবেন একলক্ষ সোনার মোহর।' আমি কায়মনোবাক্যে প্রধানমন্ত্রীর জয় কামনা করি। হঠাৎ জিতেন-বাবু আমার দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠলেন, 'তোর হবে।' আমার কী হবে ? স্বল্পভাষী লোকদের নিয়ে কা মুস্কিল! তাঁরা সর্বদাই ধাঁধার মতো ক'রে কথা বলেন কেন ? রহস্যময় এ-শব্দদুটির অর্থ কি ? আমার মধ্যে কিসের সম্ভাবনা, কিসের প্রতিশ্রুতি দেখলেন ? এই সংক্ষিপ্ত উক্তিটি এক গভীর রহস্যের জালে আবৃত হয়ে আমার মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে থাকল।

পরদিন বিকেলবেলা জিতেনবাবুর দাবাখেলার সিনৃটি কতদূর অগ্রসর হয়েছে দেখতে গিয়ে হকচকিয়ে গেলাম। নানারঙের পাথরের এবং মিনে-করা লতা-পাতার অলংকার খিলান থাম আর দেয়ালের গায়ে পড়েছে। ছাদ থেকে নেমে এসেছে বিরাট-বিরাট ঝাড়লণ্ঠন। তার ভেতরের আলোয় স্ফটিকগুলো চারদিকে টুকরো-টুকরো আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। দরজার সামনে জাঁহাপনার তখ্‌তের জন্যে উঁচু বেদী। তার ওপরেই জালিকাটা বারান্দা। হয়তো বেগমদের বসবার জায়গা।

এত সব খুঁটিনাটি কখন আঁকলেন জিতেনবাবু! সারারাত জেগে কাজ করেছেন কি? লোকটির কি কখনো ঘুমের প্রয়োজন হয় না? তিনি কি কখনো বাড়ি যান না? কী আশ্চর্য, রাতারাতি এত বড়ো একটা দৃশ্য আঁকা শেষ ক'রে ফেললেন? এই বৃদ্ধলোকটির প্রতিভা দেখে আমি যতই বিস্মিত, ততই বাড়ে তাঁর একাগ্র নিষ্ঠার প্রতি আমার অপরিসীম শ্রদ্ধা।

এবার জিতেনবাবু মেঝের ওপর কতকগুলো মোটা পিচবোর্ড ফেলে তার ওপর পেন্সিল দিয়ে অনেক আঁকাবাঁকা সব রেখা টানলেন। সেই রেখাগুলোর অনুসরণে মস্ত বড়ো কাঁচি চালিয়ে সেগুলোকে নিখুঁতভাবে কাটলেন। তার ওপর খড়িমাটির প্রলেপ দিলেন। ঘরের কোণে বড়ো চেয়ারের আদলে কাঠের একটি কাঠামো আগে থেকেই তৈরি ছিল। পিচবোর্ডের টুকরোগুলো ছোটো পেরেক ঠুকে এই কাঠামোটির চারপাশ ঘিরে লাগাচ্ছেন। পেছনে ঊর্ধ্বমুখী পানের আকারে মস্ত বড়ো আরেকটি টুকরো বসালেন। কার জন্যে এ-আসনটি তৈরি হচ্ছে! এতে ব'সেই কি দিল্লীর বাদশা দাবার চালের হুকুম দেবেন? জিতেনবাবু হুঁকোর টানের সাথে অপলক দৃষ্টিতে এটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। ফুড়ুত-ফুড়ুত আওয়াজ আস্তে-আস্তে ক্ষীণ হয়ে একেবারে থেমে গেল। সাদামাটা চেয়ারটির দিকে তাকিয়ে থাকবার এত কী আছে? খুব ক্ষিপ্রগতিতে একটা খুরিতে সোনালী, আরেকটিতে রুপোলি গুঁড়ো গঁদের আঠা আর জল দিয়ে মেশালেন। চেয়ারটির গায়ে হালকা খয়েরি রঙের লতা-পাতা-ফুল-পাখির অতি সূক্ষ্ম রেখার ডিজাইন এঁকে নিলেন। আসনের পায়াগুলো বাজপাখির আকারের, যেন সিংহাসনটি তাদের মাথায় তুলে ধরেছে। দুটি পাখির মাঝখানে গোলাকার পৃথিবী। জাঁহাপনা, অর্থাৎ সারা বিশ্বেরই তো অধীশ্বর। এই তখ্‌ত তাঁরই উপযুক্ত বটে।

লতাপাতার নক্সাগুলো আস্তে-আস্তে সোনারুপোয় ভ'রে উঠল। মাঝে-মাঝে হীরে মুক্তো চুনি পান্না এমারেল্ড টার্কোয়াজ – পৃথিবীর যাবতীয় দুর্মূল্য সব পাথরে মণ্ডিত হ'ল। সেগুলো ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় জগ্‌মগিয়ে উঠেছে। আলো-ছায়ার কী অপূর্ব খেলা! কী অপূর্ব রঙের দখল আর আন্দাজ! কী অসাধারণ কারিগরি!

পরদিন সন্ধেবেলায় যথারীতি ভাইবোনেদের সঙ্গে আমি কালীবাড়ির আরতি দেখে ফিরছি। এই সময়টিতে, অল্পক্ষণের জন্যে হলেও অভ্যাসবশত জিতেনবাবুর দোকানে আমি একবার উঁকি মারি। দোকানের পাট ভ্যাজানো।

তার ভেতর থেকে জিতেনবাবুর কণ্ঠস্বর যেন দরজা ঠেলে বেরিয়ে আসছে। স্বর উচ্চ এবং ক্রুদ্ধ। নাটকীয় ঢং-এ উঠছে আর নামছে। জিতেনবাবু কারুর সঙ্গে ঝগড়া করছেন নাকি! তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। দরজার ফাঁক দিয়ে যা দেখা গেল তা এতই অদ্ভুত এবং এতই অবিশ্বাস্য যে তার সঠিক বর্ণনা দিতে গেলে চাই স্বয়ং শেক্‌সপিয়রের মতো নাট্যকারের কলম। সন্ধের ধুনুচির থেকে এখনো অল্প ধোঁয়া পাকিয়ে-পাকিয়ে উঠে ঘরের কড়িকাঠে ধাক্কা খেয়ে নিচের দিকে নেমে আসছে। দরজার ফাঁক দিয়ে ধূপের সুগন্ধ আমার নাকে এল। মাথার ওপরে টিমটিম ক'রে একটিমাত্র আলো জলছে। ব্যাবরের মতো গায়ে ছেঁড়া ময়লা গেঞ্জি। ধুতি উঠে এসেছে হাঁটুর ওপর। মাথায় লাল গামছা পাগড়ির মতো ক'রে জড়ানো। বাদশার সিংহাসনে জিতেনবাবু ঈষৎ কাত হয়ে হেলান দিয়ে বসেছেন। ডান হাতে গ্লাস। বাঁ হাতে ঘোলাটে তরল পদার্থ ভরা একটি বড়ো বোতল। ঢুলুঢুলু চোখে সামনের দেয়ালের দিকে চেয়ে তারস্বরে নিজের মনে আবোল-তাবোল কী-সব বকছেন। এই ভালোমানুষটার মাথায় কোনো গোলমাল হয়নি তো!

'মনে করবেন না যে, এ-সিংহাসন আমার পুরস্কার! এ আমার শাস্তি! আমি আজ সিংহাসনের উপর ব'সে নাই, বারুদের স্তূপের উপর ব'সে আছি!…' 'বারুদ' শব্দটি বা…রু…উ…উ…উ…দ-এর মতো শোনাল। আমার বুকের ভেতরটা লাফিয়ে উঠল। সত্যিই কি তিনি বারুদের স্তূপের উপর ব'সে আছেন? এ-কথা ভাবার সঙ্গে-সঙ্গেই জিতেনবাবু একটু কেশে গলার স্বরটা পরিষ্কার ক'রে নিলেন। তারপর আবার 'এই আমি আমার রাজমুকুট সিংহাসনের পদতলে রাখলাম', ব'লেই বোতল আর গ্লাস পাশের টুলের ওপর রেখে মাথা থেকে গামছাটা এমন আলতো ক'রে তুললেন যেন পৃথিবীর সবচাইতে মূল্যবান্ কোহিনুর-মণ্ডিত রাজমুকুটটি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছেন। গামছাটি পায়ের কাছে রেখে কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইলেন। তারপর গ্লাসে একটা চুমুক দিলেন। চোখ লাল, ছলছল। আওয়াজ কম্পমান। কয়েকটি অস্পষ্ট কথার পর শোনা গেল, 'তার হাতে রাজ্য ছেড়ে দিয়ে আমি সেই মক্কায়ই যেতে চাই। আমি এখানে বসেও সেই দিকেই চেয়ে আছি—আমার জাগ্রতে চিন্তা, নিদ্রায় স্বপ্ন, জীবনের ধ্যান—সেই মহাতীর্থের দিকেই [illegible] আছি।' একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস বাঁকিয়ে-ওঠা ধুনুচির ধোঁয়াকে আধখান দিয়ে দু-খণ্ড ক'রে দিল। তারপর, মিনিটখানেক থেমে আবার চাপা গলায়, 'আমার জন্য ভাববেন না।' এই শেষ কথা ক'টি মুখ
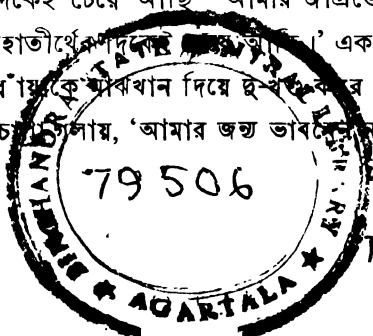
থেকে বেরুবার সঙ্গে-সঙ্গেই জিতেনবাবুর চোখ থেকে দুটি অশ্রুবিন্দু চোখের তলার ভাঁজে একটু থেমে, গাল বেয়ে, তাঁর কোলে মিলিয়ে গেল।

এবার জিতেনবাবু হাতের শূন্য গ্লাসটি রেখে দিয়ে ঘটঘট ক'রে সরাসরি বোতল থেকেই অনেকটা তরল পদার্থ গলায় ঢেলে দিলেন। চোখ প্রায় বুজে এসেছে। মাথাটিও ডান দিকে কাত্ হয়ে ঝুলে পড়েছে। বিড়বিড় ক'রে কী-সব ব'লে যাচ্ছেন। তারপর, সব চুপ। ঘুমিয়ে পড়লেন মনে ক'রে আমি বাড়ি ফিরছি ঠিক সেই সময় জিতেনবাবু হঠাৎ সটান হলেন। সুমুখের দরজার দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তুই বাইরে কি দেখে এলি ?··· সংসার ঠিক সেই রকম চলছে ?' আমি এমনই হকচকিয়ে গেলাম যে প্রায় বলে ফেলি আর কি, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ জিতেনবাবু! আপনি কিচ্ছু চিন্তা করবেন না···ঠিক চলছে! আপনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোন!' কিন্তু তাঁর এই অবস্থায় তিনি কি আমাকে সত্যিই-সত্যিই দেখতে পেয়েছেন ? আমি তো দরজার সামান্য ফাঁক দিয়ে দেখছি। জিতেনবাবু বোতলের অবশিষ্টটুকু গলায় ঢেলে দিলেন। চোখ রক্তজবার মতো লাল অর্ধনিমীলিত। মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। ওপরের দিকে তর্জনী তুলে স্পষ্ট আওয়াজে বললেন, 'তবে আকাশ তুমি নীলবর্ণ কেন ?··· সূর্য তুমি এখনো আকাশের ওপর কেন ? নির্লজ্জ!···' তারপর ধমকের সুরে, 'নেমে এসো!' এ-কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে জিতেনবাবুর মাথাটিও নেমে এসে তাঁর বাঁ কাঁধের ওপর হেলে পড়ল।

জিতেনবাবু এইভাবে যখন ঘুমিয়ে পড়েন, একমাত্র তখনই তাঁর শরীর এবং মন সাময়িক বিশ্রান্তি পেয়ে জুড়িয়ে যায়। প্রতিদিন ভোরে আলোর স্পর্শে পাখিরা যেমন নতুন ক'রে নিজেদের প্রাণশক্তি অনুভব করে তিনিও তেমনি নব উদ্যমে পরিপূর্ণ হয়ে জেগে ওঠেন। কাজের ফাঁকে-ফাঁকে ছিলমে দম দেওয়া আর সন্ধের পর সুরাদেবীর উপাসনা করা—এ-ছাড়া তাঁর বিশ্রামের অবকাশ নেই। তাঁর প্রতিভার এবং দক্ষতার অনুপাতে স্বল্প পারিশ্রমিক পেলেও তিনি ফরমাশের পর ফরমাশ খাটেন। ধনদৌলতের প্রতি তাঁব মনোভাব উদাসীন। অবসরে তিনি একেবারেই অনভ্যস্ত। বছরের প্রতিদিন তাঁর চোখের সামনে ছাদ থেকে মেঝে অব্দি একটি বড়ো পর্দা না-টাঙানো থাকলে একটি অসহায় শিশুর মতো তিনি ছটফট করেন। এটাই তাঁর স্বভাব। সময়ের অপচয় তাঁর কাছে পাপতুল্য অপরাধ। যে-লোক কর্মের মধ্যে তাঁর জীবনদর্শন খুঁজে পেয়েছেন, তাঁর সঙ্গী কিংবা আড্ডার প্রয়োজন কিসের। একাকিত্বের নিদারুণ যন্ত্রণা থেকে

মুক্তি ও প্রকৃত আনন্দের স্বাদও পেয়েছেন তিনি এরই ভেতর দিয়ে। জীবনের বৃহদংশই কেটেছে প্রবল সক্রিয়তায়, কর্মের প্রবল জোয়ারে।

একদিন স্কুলে যাবার পথে জিতেনবাবুর দোকানে ঢুঁ মারতেই দেখি শিল্পী তাঁর নড়বড়ে টুলটির ওপর ব'সে যথারীতি হুঁকোয় টান দিচ্ছেন। দৃষ্টি স্যাঁৎসেঁতে দেয়ালটি ছাপিয়ে চ'লে গেছে অনেকদূরে, কোন অজানা পরিবেশে। দাবা খেলার সিন্, সিংহাসন আগেই চ'লে গেছে তাদের গন্তব্যস্থলে। মেঝেতে রাখা আছে নতুন সিনের জন্যে থানকাপড়। জিতেনবাবু অযথা বাক্যব্যয় করেন না, এ-কথা আমার জানা থাকা সত্ত্বেও এবং আমার বেয়াদপির ফলাফলের কথা না-ভেবেই আমি, কেন জানি না তাঁকে প্রশ্ন ক'রে বসলাম, 'জিতেনবাবু, আজ পর্যন্ত আপনি কতগুলো সিন্ এঁকেছেন?' তিনি আমার দিকে তাকাবার প্রয়োজন মনে করলেন না। তাঁর হুঁকোয় টানের ছন্দেও কোনো বাধা পড়ল না। আর পাঁচজন দোকানদারের মতো হিসেবের খাতাপত্র রেখে দোকানদারি করা যাঁর ধাতে সয় না, সে-লোকের কাছে এ-সব প্রশ্ন হয়তো নিতান্তই অবান্তর। কিংবা আমার প্রশ্নটি হয়তো এই আত্মভোলা লোকটির কানেও পৌঁছয়নি। এ-সব কথা ভাবছি, এমন সময় ফুড়ুত-ফুড়ুত আওয়াজের মাঝে একটা কথা শোনা গেল, 'কয়েকশো।' অনির্দিষ্ট হলেও এই অঙ্কটি একটি বিরাট বিস্ময়ের আকার ধারণ ক'রে আমার মনের চার দেয়ালে প্রতিহত হয়ে প্রতিধ্বনি করতে থাকল। যাই হোক, এই স্বল্পবাক্যের লোকটির কাছ থেকে আমার প্রশ্নের জবাব আদায় করতে পেরেছি এই খুশিতে তাঁকে আরেক প্রশ্ন ক'রে বসলাম, 'আচ্ছা জিতেনবাবু, আপনার কাজগুলো চ'লে গেলে আপনার মন কেমন করে না?' তক্ষুনি জবাব এল, 'ধুৎ।' জবাব আকস্মিক এবং কিঞ্চিৎ রূঢ় বলা যায়। জিতেনবাবুর জীবনের নক্সায় মায়া-মমতার কিংবা ভাবপ্রবণতার হয়তো কোনো স্থান নেই, এই কথা মনে ক'রে আমি স্কুলের দিকে রওনা দিলাম।

জিতেনবাবুর দোকানের পেছনের বন্ধ জানলাটি আমাদের বাড়ির দক্ষিণের দেয়াল ঘেঁষে। আসন্ন বাৎসরিক পরীক্ষার তাগিদে রাত্রিভোজন সেরে আমি পড়তে বসেছি। এমন সময় তাঁর গলা শুনতে পেয়ে আমার পড়া থেমে গেল। একটু মনোযোগ দিতেই শুনি জিতেনবাবু গান ধরেছেন। ব্যাপার কি জানবার ইচ্ছেয় তাড়াতাড়ি নেমে গেলাম। জানলার পাট খোলা। আগেরদিন সকালবেলা যে-থানকাপড়টি মেঝেতে প'ড়ে ছিল তার ওপর চমৎকার একটি দৃশ্য আঁকা প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। লোকটির দানবিক উদ্যম দেখে আমি হতভম্ব। গাছপালা

নদী পাখি ফুল মানুষজন আরো কত কি। গাছের পাতার আড়ালে মুকুটধারী সুদর্শন একটি যুবক। মুখে দুষ্টুমিভরা মুচ্‌কি হাসি। পাশে গাছের ডালে অনেক-গুলো কাপড়চোপড়। নিচের দিকে নজর দিতেই দৃশ্যটি বুঝতে আর বাকি রইল না। যেমনই সুশ্রী যুবক তেমনই সুগঠিতা সব যুবতীরা। স্নানরতা, সুশীলা এই নারীদের চোখেমুখে যেমনই বিস্ময়ের ভান, তেমনি প্রণয়েরও। দু-হাতে প্রাণপণে নগ্নদেহ ঢাকবার চেষ্টায় তাঁদের স্ত্রীসুলভ শ্রী যেন আরো বেড়ে গেছে।) যথারীতি জিতেনবাবুর এক হাতে গ্লাস, আরেক হাতে বোতল। আধোবোজা চোখ ছবিটির নিচের দিকে সংবদ্ধ। দেয়ালে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে, মেঝেতে ব'সে, তিনি গান ধরেছেন,

ফাগুনের কু-বাতাসে
বুকের কাপড় যায় লো খসে।
পোড়ারমুখো কোকিল এসে
কুঁহু-কুঁহু করে লো॥

স্বর চাপা হলেও সুরে কোনো ঘাটতি নেই। বাঃ! জিতেনবাবু তো চমৎকার গান করতে পারেন। গলায় কাজও আছে বেশ! আশ্চর্য এ-লোকটির কাণ্ড-কারখানা। যে-রসের ছবি আঁকেন, তেমনই মানানসই রসের সুরে তাঁর সন্ধে কাটান। আপাতদৃষ্টিতে শুষ্ক এবং গুরুগম্ভীর লোকটির ভেতর যে পাতায়-ঢাকা মৌচাকের মতো অফুরন্ত একটি রসের ভাণ্ডার লুকিয়ে আছে, ক'জন তার খবর রাখে!

জিতেনবাবুর স্বর যেন একটু জড়িয়ে এসেছে। বোতলের তলদেশে এখনো কয়েক ফোঁটা পানীয় প'ড়ে আছে দেখে তিনি বোতলটিকে উপুড় ক'রে হাঁ-করা মুখের ওপব রাখলেন। শেষ ফোঁটা-ক'টি গলায় পডতেই তিনি আবার গান ধরলেন,

আমার কুল গাছে লেগেছে বসন,
দাঁড়া দিদি, দাঁড়া লো।
পোড়ারমুখো কোকিল এসে
কুঁহু-কুঁহু করে লো।

গানের শেষ ক'টি কথা অস্পষ্ট। শরীরটিও আস্তে-আস্তে একদিকে ঝুঁকে পড়েছে, মুহূর্তের মধ্যেই গভীর অবসাদজড়িত দেহটি একটি লতার মতো মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

ডেন্টিস্ট আখ্‌তার মিঞা

'দন্তচিকিৎসক'—এ-নামটি শোনামাত্রই আমাদের বুকের ভেতরটা কাটা কই-মাছের মতো লাফিয়ে ওঠে। তার ওপর চিকিৎসক যদি নিজের তালিম নিজেই দিয়ে থাকেন তাহলে তো আর কথাই নেই। প্রাণপাখিটি উড়ে যায়। এমনি এক ডেন্টিস্ট ছিল আমাদের পাড়ার আখ্‌তার মিঞা। তার দোকানে মস্ত সাইন-বোর্ডটির বাঁদিকে একটি মেমসাহেবের মুখাবয়ব আঁকা। রোদ-বৃষ্টি-আর্দ্রতার দাপটে তাঁর মুখের আসল রঙটির অনেকটাই উঠে গেলেও, কোনো-এককালে তাঁর গণ্ড যে খোরাসানী আপেলের মতোই মসৃণ এবং গোলাপী ছিল, একটু নজর দিলে, তা এখনো ধরা পড়ে। নিলামের দোকানে পুরানো ভাঙা পিয়ানোর পর্দা-গুলোর মতোই ময়লা একপাটি পোকা-খাওয়া দাঁত বের ক'রে তিনি এমনই মুখ-ভঙ্গি ক'রে থাকেন যে, হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন একটি মেয়ে-কঙ্কাল মুখ ভ্যাংচাচ্ছে। এ-ছাড়া তাঁর দুই চোখে ছিল দুই দৃষ্টি। দাঁতের ব্যথায় গভীর বিষাদে-ভরা ডান চোখটি অপলক চেয়ে আছে পুবের আকাশ-পানে। পশ্চিমে নিবদ্ধ অন্য চোখটি দুষ্টুমি-ভরা ইশারায় কী যেন বলে। শুনেছি, এক আনাড়ি সাইনবোর্ড-চিত্রকরের হাতে প'ড়ে সুন্দরী বিদেশিনীর এই হাল হয়েছিল নাকি। তাঁর মরচে-ধরা লোহার রঙের কবরীটি গাদা-গাদা কনকচাঁপায় অলংকৃত। যুক্তির দৃষ্টিতে অপরাধ হলেও, চিত্রকরের স্বাভাবিক কামনাটি এমন দোষের কি! হাজার হোক, অবন ঠাকুর থেকে মায় পরিতোষ সেন পর্যন্ত সবাই খোঁপা আঁকলেই তো তাতে ফুল গুঁজে দিয়েছেন। মেমসাহেবের ডান পাশে আসমানীরঙের পট-ভূমিকায় মস্ত বড়ো ইংরেজি হরফে লেখা—"ডাঃ জেড. এম. আখ্‌তার, ওয়ারল্ড-রিনাউণ্ড-ডেন্টিস্ট"। কটকটে লাল রঙে লেখা এই হরফগুলোর একপাশে ঘন কালো ছায়া ফেলে চিত্রকর তাদের অস্বাভাবিক রকম ফুটিয়ে তুলেছে। তাজ-মহলের অন্দরের নক্সার অনুকরণে, হরফের চারপাশ, অনুরূপ ফুল-লতা-পাতায় ভরা। এক কথায়, সাইনবোর্ডে তিলধারণের স্থান ছিল না। অবিশ্যি আখ্‌তার

“ডেন্টিস্ট আখতার মিঞা”

মিঞার মতে, এই জায়গার অভাবের দরুনই তার দন্তচিকিৎসাবিদ্যার যথাযথ খেতাবটি সাইনবোর্ডে স্থান পায়নি। দোষটি পুরোপুরি নাকি চিত্রকরেরই। কিন্তু যে-রোগীর একবার তার চিকিৎসার অভিজ্ঞতা অর্জন করার সুযোগ হয়েছে, তার পক্ষে এ-যুক্তিটি অবিশ্যি মেনে নেয়া মোটেই সহজ হ'ত না।

একদিন আমি এবং আমার শৈশবের অতি প্রিয় বন্ধু শম্ভু, একসঙ্গে স্কুলে যাচ্ছি। হঠাৎ এক বিকট চিৎকারে আমরা থেমে গেলাম। একেই তো ভয়ানক আর্তনাদ, তার ওপর আবার বামাকণ্ঠ। আখ্‌তার মিঞার চেম্বারের মস্ত বড়ো কাচের জানলায় নাকমুখ চেপে উঁকি দিতেই দেখি, তার বিশেষ চেয়ারটিতে উপবিষ্ট প্রৌঢ়া এক মহিলা ছাদের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছেন। একটি যুবক পেছন থেকে চেপে ধ'রে আছে তাঁর হাতদুটি। গায়ে ময়লা শাড়ি। কাঁকড়ার ঠ্যাং-এর মতো সাঁড়াশিটি দিয়ে মিঞা দাঁত খিচিয়ে, তাঁর মাড়ির দাঁত ধ'রে টানাটানি করছে। মহিলার চিৎকারও সেই অনুপাতে তীব্র নিষাদে চড়ছে। এ-ধরনের ঘটনা মাঝে-মাঝে ঘটলেও দাঁতের ব্যথায় আখ্‌তার মিঞাকে স্মরণ করা ছাড়া আমাদের আর উপায় ছিল না। তৎকালের ঢাকা শহরে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত ডেন্টিস্ট খুব কমই ছিল। তাছাড়া আমাদের ইসলামপুর পাড়ার ত্রিসীমানার মধ্যে সবেধন নীলমণি এই আখ্‌তার মিঞাই।

পেশার খাতিরে খানিকটা আসুরিক উপায়ের আশ্রয় নিতে হলেও, তার প্রশস্ত ছাতির তলায় কোমলতার যে একটি পুষ্করিণী ছিল সে-কথা কে না-জানত। গরীব-দুঃখীজনরা তার দুয়ারে এসে কখনো খালি হাতে ফিরে যেত না। প্রতি বছর রমজানের শেষে সে অল্পবিস্তর দানখয়রাত ক'রে থাকে। তাছাড়া, বিপদে-আপদে পাড়াপড়শী অনেকেরই পাশে তাকে দাঁড়াতে দেখেছি।

দুর্গোৎসবের মাসখানেক আগেকার কথা। মধ্যাহ্নভোজন সেরে সবেমাত্র আমরা ওপরে উঠে এসেছি, এমন সময় একের পর এক, প্রচণ্ড বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজে গোটা বাড়ির দরজা-জানলাগুলো ঠক্-ঠক্ ক'রে উঠল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। হাওয়ায় পোড়া বারুদের উৎকট গন্ধ। দেখি মসজিদের তলায় বাজিকর ঝুল্লুর মিঞার দোকান থেকে ভুষো কালো ধোঁয়া পাকিয়ে-পাকিয়ে উঠে আশেপাশের সমস্ত বাড়িঘর আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে। শুধু আজান দেবার সাদা গম্বুজটি বেরিয়ে আছে। দৌড়ে সেখানে পৌঁছতেই শোনা গেল যে, তুবড়িতে বারুদ্ ঠাসবার সময় আকস্মিকভাবে আগুন ধ'রে যায়। পাশেই, আপেলের গুচ্ছের মতো, মস্ত-মস্ত সদ্য তৈরি বোমা, দড়ি থেকে ঝুলছিল। চোখের নিমেষে

বারুদের আগুন সেখানে পৌঁছে গেল। বাজিকর আহত হয়ে দোকানের ভেতরেই আটকা প'ড়ে যায়। বালতি-বালতি জল-বালি ঢালা সত্ত্বেও আগুন যদিও-বা কিঞ্চিৎ কমল, বিস্ফোরণের কোনোই লাঘব নেই। আখ্‌তার মিঞা কোথা থেকে ছুটে এসে ভালোমন্দ বিচার না-ক'রেই এক দুঃসাহসিক কাণ্ড ক'রে বসল। নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে, এক লাফে দোকানের ভেতর প্রবেশ ক'রে, ঝুল্লুর মিঞাকে দু-হাতে তুলে আনল। ঘোড়ার গাড়িতে বসিয়ে তৎক্ষণাৎ তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল।

আখ্‌তার মিঞার দোকানে যাবার পথটি ছিল আমাদের বাড়ির সামনে দিয়েই। তার চেহারার জৌলুশ বাড়াবার উদ্দেশ্যেই হোক কিংবা একদা সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত থাকার দরুনই হোক, বছরের তিনশো পঁয়ষট্টি দিন, ইউনিফর্মের মতোই, তার পরনে মিলিটারি খাকি হাফসার্ট, মালকোচা-মারা ধুতি, আর পায়ে সাদা ক্যাম্বিসের জুতো। পোশাকআশাকে তার এই বৈশিষ্ট্যটি লক্ষণীয় ছিল দুই কারণে। প্রথমত শহরের বেশিরভাগ মুসলমানই পরত লুঙ্গি আর বোতামওয়ালা রঙিন গেঞ্জি, কিংবা পায়জামা-পাঞ্জাবি। দ্বিতীয়ত কাজেকর্মে, চালেচলনে বস্তুত সব ব্যাপারেই আখ্‌তার মিঞার মৌলিকত্ব। প্রতিদিন ভোরে গজগমনে মিঞা যখন দোকানের দিকে এগোয়, আমাদের গোটা বাড়িটা থরথর ক'রে কেঁপে ওঠে। যেন দশ টন একটা রোলার যাচ্ছে! ঢাকার সদর জেলের কাছে পিলখানার সংলগ্নই তার বাড়ি। হয়তো এই কারণেই ওখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে তার কিঞ্চিৎ শারীরিক সাদৃশ্য। তাছাড়া, পাতিয়ালার বিখ্যাত কুস্তিগির জুম্মা খাঁর কাছে কিছুদিন নাকি শাক্‌রেদিও করেছিল।

আখ্‌তার মিঞার যাতায়াতের সময় আমাদের সংকীর্ণ জিন্দাবাহার গলিটি সাময়িকভাবে অন্ধকার হয়ে আসে। যেন হঠাৎ আংশিক সূর্যগ্রহণ হচ্ছে। তার দেহের এবং চুলের রঙ দুই-ই এত কাছাকাছি ছিল যে কোনটি বেশি ঘন, তা ঠাহর করা মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। তার পর্বতপ্রমাণ বপুটিতে একদিকে ওজনের, আর অন্যদিকে চর্বি এবং মাংসপেশীর চমৎকার বিভাজন। এ দুই-ই যেন দোকানের থানকাপড়ের মতো আপাদমস্তক থাকে-থাকে সাজানো। অনেকটা মোটরগাড়ির মিচেলিন টায়ারের বিজ্ঞাপনের বহুপরিচিত লোকটির মতো। এবং এই লোকটির মতোই তার মুখেও সর্বদা একটি হাসি। নানারকম প্ররোচনা-উত্তেজনার মুখেও এই হাসিটি তার ঠোঁটে ভোরের পারিজাতের মতোই অবশ্যম্ভাবী-রূপে ফুটে থাকে, এবং তার রেণু ছড়ায়।

প্রতি বছর বর্ষার শেষে, নুরুদ্দিন মিঞা আমাদের গলির মুখে একটি আখের দোকান লাগায়। সোনালী রঙের পাকা আখের আঁটিগুলো, বিকেলের আলোয় বেশ রসাল দেখাচ্ছে। আখ কিনে বাড়ি ফিরব, এমন সময় আমার চোখ, গলির বিপরীত দিকের দোকানটির দিকে গেল। আখ্‌তার মিঞা একটি ন্যাকড়া বালতিতে ডুবিয়ে মেঝেটি মোছামুছি করছে। মোছা শেষ ক'রে মিঞা, বালতি ভরতি ময়লা জলটা দোকানের ভেতর থেকেই, ধুলো ভরতি রাস্তার দিকে ছুড়ে দিল। একটি ভদ্রলোক বয়সে প্রৌঢ়, পরনে দামী চীনা সিল্কের পাঞ্জাবি এবং লুঙ্গি, হাতে রুপোর হাতলওয়ালা ছড়ি, পায়ে হরিণের চামড়ার চটি—ঠিক সেই মুহূর্তে আখ্‌তার মিঞার দোকানের সামনে দিয়ে সান্ধ্যভ্রমণে যাচ্ছিলেন। তাঁর এই শৌখিন পোশাকআশাকের যে কী হাল হ'ল তা সহজেই অনুমেয়। ব্যাপারটি এমনই হঠাৎ এবং অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটল যে, ভদ্রলোক তাঁর পাঞ্জাবিটার দিকে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তারপর দোকানদারের দিকে দৃষ্টি যেতেই তাঁর খয়েরি রঙের ডাগর চোখদুটি অবিকল পাকা বটফলের রূপ ধারণ করল। একদিকে হতবুদ্ধি, আরেকদিকে প্রচণ্ড ক্রোধ, এ-দুয়ের সংমিশ্রণে, তিনি একটি ম্যালেরিয়া রোগীর মতো কাঁপতে থাকলেন। সেই অবস্থাতেই তার মুখে চিৎকার-চেঁচামেচির একটি ফোয়ারা ছুটল। ছোটোখাটো একটি ভিড়ও জ'মে গেল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে দোকানের ভেতর, অপরাধী লোকটি, একটি মূর্তির মতো সম্পূর্ণ নিশ্চল এবং নীরব। (মুখে কুমারীসুলভ সলজ্জ, সবিনয় হাসি।) গালিগালাজের অনুপাত বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে তার হাসিটি আস্তে-আস্তে এ-কান থেকে ও-কান অব্দি ছড়িয়ে পড়ল। এ কৌতুকপ্রদ দৃশ্যটি দেখে ভিড়ের মধ্যে কারুর-কারুর মুখেও হাসির রেখা ফুটে উঠল। অল্পক্ষণের মধ্যে একটি সংক্রামণের মতোই, এই হাসি সমবেত সকলের মুখে ছড়িয়ে পড়ল। সিল্কের পাঞ্জাবি পরিহিত ভদ্রলোকটি বিহ্বল হয়ে এদিকে-ওদিকে তাকালেন। তারপর তিনি নিজেও হাসতে-হাসতে এগিয়ে গেলেন।

আখ্‌তার মিঞাকে দেখে মিচেলিন টায়ারের লোকটির কথা মনে আসার আর-একটি কারণ হ'ল এই যে, তার শরীরের অনুপাতে মাথাটি অত্যধিক রকমের ছোটো। ঠিক যেন বিরাট জালার মুখে ছোট্ট একটি ঘটি। এ-রকমটি দেখাবার জন্য হয়তো তার বিশেষ ধরনের চুলের ছাঁটই দায়ী। চুল ঘন থাকা সত্ত্বেও মাথার পুরো পেছনের দিকটাই কামানো। কানের দু-পাশেও তাই। শুধু সামনের দিকে তিন-চার ইঞ্চি লম্বা কয়েক গাছা চুল। তার মাঝখান দিয়ে সুতোর মতো

সরু সিঁথি। অতি যত্নে গুনে-গুনে ডান পাশে ছ'টি বাঁ পাশেও ছ'টি—ঢেউ খেলিয়ে দিত। কিংবদন্তি ছিল যে তার চুলের এই বাহার দেখে, জয়নাব, জুবেদা, সিতারা—এ রকম অনেক পর্দানশিন যুবতীরাই নাকি হিংসার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। সে যাই হোক, মাথার কেশের স্বল্পতাকে পূরণ ক'রে দিয়েছিল তার শরীরের লোমের অস্বাভাবিক ঘনত্ব এবং বৃদ্ধি। বোতাম-খোলা কামিজের ভেতর থেকে তার কপাটবক্ষের ঘন জঙ্গল যেভাবে উঁকিঝুঁকি মারে তাতে ক'রে দর্শকদের মনে, বাকি শরীরের লোমের পরিমাণ সম্বন্ধে কৌতূহলের সীমা ছিলনা।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের অসহ্য ভ্যাপসা গরম। এ-রকম দিনে দোকান থেকে বাড়ি যাবার সময় আখ্‌তার মিঞা আরমানিটোলার মাঠে থেমে যেত। সেখানকার সবুজ নরম ঘাসের ওপর ঠাণ্ডা, খোলা দখিন্ হাওয়ায় শুয়ে ব'সে তার বিরাট বপুটিকে একটু জুড়িয়ে নিত।

একদিন ঐ-মাঠে ফুটবল ম্যাচ্ খেলে আমরা ফিরছি। সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে। মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে কয়েকটি গোরু ঘাস খাচ্ছে। দূর থেকে আবছা সাদাকালো একটা বস্তু আমার নজরে এল। সেটির কাছে আসতেই দেখি আখ্‌তার মিঞা উপুড় হয়ে শুয়ে। পরিত্রাহি নাক ডাকছে। এলিয়ে দেয়া বিস্তৃত খালি গা ঘাসের সঙ্গে মিশে আছে। ধুতিটা গুটানো, কোমরের চারপাশে গোঁজা। খাকি হাফসার্টটি পোট্‌লাকারে পাশে রাখা। সন্ধের অন্ধকারে দু-তিনটে বুভুক্ষু গোরু ঘাস খেতে-খেতে এক-পা দু-পা ক'রে এগিয়ে এসে, মিঞার বড়ো, কোঁকড়ানো, পিঠের এবং বগলের লোম ধ'রে টানাটানি আরম্ভ করল। গোরুগুলোকে দেখে অবশ্যি বোঝা গেল না যে এই কালো ঘাস তাদের মুখে কীরকম লাগল। যাই হোক, এ অচিন্তনীয় এবং অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্যটি দেখে আমরা একেবারে হতভম্ব। হঠাৎ দেখি মিঞা ধড়ফড় ক'রে উঠে বসল। কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইল। তারপর হো-হো-হো-হো ক'রে সন্ধের আকাশ-বাতাস ভরিয়ে দিল। সে কী প্রাণখোলা নির্মল হাসি।

প্রতিদিন সকালে দোকানে পৌঁছেই আখ্‌তার মিঞা চেয়ার-টেবিল মেঝে জানলার কাঁচ—এ সব-কিছুই নিজের হাতেই ঝাড়পোঁছ ক'রে সংলগ্ন পর্তুগীজ গির্জের কম্পাউণ্ড থেকে জল আনে। তার ত্রুটিহীন যত্নের দরুন, দন্তচিকিৎসার যন্ত্রপাতিগুলো আরশির মতো ঝক্‌ঝক্ করে। নিয়মিত রোগীর অভাবের দরুন তার হাতে অঢেল সময়। তার ওপর তার মস্ত বপুটি ছিল কর্মোদ্যমের একটি আকর। তাই মুহূর্তের জন্যেও নিষ্ক্রিয় থাকা তার পক্ষে একেবারেই অচিন্তনীয়।

এদিকে পসারের স্বল্পতা, অন্যদিকে কুমার-জীবন, এ-দুয়ের টানাপোড়েনে একটি চাপা নিঃসঙ্গতা বোধ, একটি ব্যাধির মতো, প্রায়ই চাড়া দিয়ে ওঠে। একাকিত্ব তার কাছে নিতান্তই পীড়াদায়ক। তাই সময় কাটাবার জন্যে আশেপাশের দোকানীদের সঙ্গে গপ্পোগুজব করে। গায় প'ড়ে দালালিও করে। বে-পাড়ার কোনো লোক, আমাদের পাড়ায় ঠিকানার সন্ধানে এলে সে নিজে সঙ্গে গিয়েই বাড়িটি দেখিয়ে আসে। তাছাড়া পাশের মনোহারী দোকানের মালিক ব্রজবাবুর প্রয়োজনে, তাঁকে নতুন বাড়ির খোঁজ তো সে-ই এনে দিয়েছিল। নিজের কুমার-জীবনের অবসান নাই-বা ঘটল, তাতে কি! ফলবিক্রেতা আস্‌গর মিঞার কন্যা আফসানার সঙ্গে ঘুড়িবিক্রেতা জমির মিঞার ছেলে কাদেরের বিয়ের ঘটকালিও তো সে-ই করেছিল।

চেহারায় যে আখ্‌তার মিঞা অবিকল নবাবজাদার মতো নয়, এবং তার কুমার-জীবন দীর্ঘতর হবার এটিই যে প্রধান কারণ, সে-কথা তার জানতে বাকি ছিল না। কিন্তু পা থেকে মাথা পর্যন্ত তার ব্যক্তিত্বে যে বিরাট পৌরুষের ছাপ ছিল তা কি আর অস্বীকার করা যায়! তার ওপর প্রথম মহাযুদ্ধে মেসোপটে-মিয়ায় জার্মানদের লড়াইয়ে মিঞার অসাধারণ এবং চাঞ্চল্যকর বীরত্বের কাহিনী এবং নানারকম আজব অভিজ্ঞতার কথা ঢাকা শহরে কে না-জানত!

মরুভূমির এক ভয়ংকর লড়াই-এর কথা। শত্রুপক্ষ পুরো এক হপ্তা ধ'রে অবিরাম তীব্র আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। তার দলের প্রায় সব সেপাইরাই নাকি একের পর এক গুলি খেয়ে, কিংবা বেওনেটের খোঁচায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেছে। কেউ-কেউ নাকি নিখোঁজও হয়ে যায়। নানারকম কৌশল আর ধোকাবাজি ক'রে মিঞা জার্মানদের বর্বর আক্রমণ থেকে এক জনশূন্য ট্রেন্‌চের বালির তলায় লুকিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল।

চীনে কালির মতো কালো মরুভূমির রাত। চারদিক স্নুন্‌সান্। মাঝে-মাঝে পশ্চিমি হাওয়া উঁচু-নিচু বালির ঢিপিতে ধাক্কা খেয়ে শোঁ-শোঁ আওয়াজ ক'রে উঠে থেমে যায়। একদিকে অসাধারণ ক্লান্তি আর সন্ত্রাস। তার ওপর পুরো এক হপ্তার তৃষ্ণায় এবং অনশনে মিঞার এমন অবস্থা হয়েছিল যে, পায়ের তলায় বালিকণাগুলোকে চিনির দানা ভেবে মুখে পুরে দেয় আর কি। যেন সে মরীচিকা দেখছে? খিদে পেলে তো বেড়ালে লোহা খায়! কিন্তু সে-লোহাই বা কোথায়! তাছাড়া বিদেশে-বিভুঁইয়ে, এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে, তার লাশ প'ড়ে থাকবে এবং তাতে শেয়াল-শকুনিদের উদরপুষ্টি হবে, কথাটি সে কিছুতেই

মনে আমল দিতে পারছিল না। কেমন ক'রে তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে যাবে এ-দুশ্চিন্তা তার মস্তিষ্কে জমাট হয়ে বসেছে। এমন সময় শত্রুপক্ষের দু-তিনটি আহত সৈন্য অন্ধকারে পালাতে গিয়ে হঠাৎ ট্রেন্‌চের মধ্যে পড়ে গেঁথে গেল। মিঞা বেশ খানিকক্ষণ মৃতের মতো ভান ক'রে রইল। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে একটু ক'রে এগোয়, আবার চুপটি মেরে প'ড়ে থাকে। এইভাবে খানিকটা এগুতেই মিঞা বুঝতে পেল, দৈত্যের মতো দেখতে ঐ তিনটি জার্মানই অক্কা পেয়েছে। 'ওরে চাচা, আপনা জান্ বাঁচা'—পূর্ববঙ্গের বহুপ্রচলিত এই প্রবাদটি, সুদূর মেসোপটেমিয়ার তারকাখচিত, অবসাদজড়িত, মরুভূমির বিনিদ্ররাতে, একটি অবাধ্য মাছির মতো তার মনের চারিদিকে ভন্‌ভন্ ক'রে পাক খেতে লগেল। মিঞা যতই সেটাকে তাড়াবার চেষ্টা করে, ততই মাছিটার জেদ বাড়ে। এক-দিকে দাউ-দাউ জ্বলছে জঠরের আগুন, অন্যদিকে দোজখের আগুন। কী সাংঘাতিক দ্বন্দ্ব! এ দুয়ের সংঘাতে মিঞা এক নিদারুণ বিভ্রান্তির গহ্বরে পড়ল। কী করবে! সে কী করবে! তা হলে কি পাগল হয়ে যাবে! নাকি সে পাগল হয়ে গেছে। তার মানবিক বৃত্তিগুলো—বুদ্ধি, বিবেচনা, ঘৃণা এ-সবই একের পর এক শুকনো ফুলের মতো তার হৃদয় থেকে খ'সে পড়তে থাকল। সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে যে, তার দুর্বল, শুষ্ক, মুমূর্ষু শরীর ক্রমশই একটা পশুর শরীরে রূপান্তরিত হচ্ছে। কী সাংঘাতিক যন্ত্রণা! কী অসহ্য! 'হায় আল্লাহ!' নীলাম্বরের দিকে চেয়ে সে হাঁটু গেড়ে বসল। 'এ বেনেয়াদ্ খোদা এ কেয়ামতের দিনের মালিক, এ তামাম্ জাঁহার পালনেওয়ালা। তুমি রহিম, তুমি করিম! তোমার এই হতভাগ্য খিদমতগারের সব কসুর মাপ করো।' এই ব'লে শত্রুপক্ষের মৃত সৈন্যদের প্রথম একটিকে তার উদরে কবর দিল। এই স্বল্পাহারে তার জঠরাগ্নি এতই ক্ষেপে উঠল যে বাকি দুটিরও পর-পর একই গতি হ'ল! যুদ্ধক্ষেত্রের এই অসাধারণ নৈশভোজনের পর থেকে, দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থে, আখ্‌তার মিঞা, দিন-দিন একটি হাতির মতো বাড়তে থাকল।

মহাযুদ্ধ শেষে উনিশ শো আঠারোর পাঁচই নভেম্বর মিঞা যখন ঢাকায় ফিরল, তাকে চেনা দায়, এমন-কি তার মার পক্ষেও। উচ্চতায় প্রায় সাড়ে-ছয় ফুট, বুকের ছাতি ষাটের কাছাকাছি।

এই অসাধারণ গল্পের কথক ছিল, তিরিশের টেররিস্ট আন্দোলন দমনে নিযুক্ত, বালুচ্ রেজিমেণ্টের এক সেপাই এবং আখ্‌তার মিঞার মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধের সাথী, জনৈক বুজ্‌দিল শাহ।

মহাযুদ্ধ শেষ হলেও. বন্দুকের সঙ্গে মিঞার সম্পর্কটি কিন্তু র'য়ে গেল। তার কারণ হয়তো এই যে, একদিকে তার শরীরের এক নতুন আসুরিক শক্তির সঞ্চার এবং অফুরন্ত সময়, অন্যদিকে প্রেমহীন কুমার-জীবনের একঘেয়েমি। তাছাড়া মাঝে-মাঝে শহরের ইটপাটকেলের জঙ্গল এবং ধুলোবালি ছেড়ে, মুক্ত আকাশের তলায়, গাছপালার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে তার ভালোই লাগে।

এক নতুন শখ আখ্‌তার মিঞাকে পেয়ে বসল। বুড়িগঙ্গার চরে বেলে হাঁস, ডাহুক, পানকৌড়ি ইত্যাদি যাবতীয় খাবার পাখি শিকার করা তার নিয়মিত উইক্-এণ্ড নেশা হয়ে দাঁড়াল।

বিনা কারণে হিংসাত্মক কার্যকলাপ তার কাছে ছিল নিতান্তই অর্থহীন। এ-রকম সময়ে, অনর্থক হিংসার কবল থেকে হিন্দুদের আশ্রয় দিয়ে গুরুতর ঝুঁকি নিতেও সে বিন্দুমাত্র ইতস্তত: করেনি। কিন্তু অযথা নিরীহ পাখিদের হত্যার কথা জিজ্ঞেস করলে আখ্‌তার মিঞা, খাবার উদ্দেশ্যে প্রাণীহত্যার ন্যায্যতার সমর্থন জানিয়ে তর্ক করে।

সব ব্যাপারে মিঞার মৌলিকত্বের কথা আগেই বলেছি। পাখি শিকারের বেলায়ও এই মৌলিকত্বের কোনো ঘাটতি দেখা দিল না।

একবার এই শিকারে তার সব কার্তুজ ফুরিয়ে গেল অথচ, একটি পাখিও ঘায়েল হ'ল না। পরাজয় শব্দটি তার অভিধানে কখনো স্থান পায়নি এবং এখনো পাবে না, এই প্রতিজ্ঞা করার সঙ্গে-সঙ্গেই মিঞার মাথায় এক উদ্ভট আইডিয়া খেলে গেল। ঝটপট সে নিজেকে বিবস্ত্র ক'রে নিল। দুই কাঁধে দুটি থলি ঝোলাল। চরের ছোটো-ছোটো গাছগুলোর মাঝে গিয়ে, ডালের অনুকরণে হাতদুটি উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ দেখলে মনে হবে যেন অবিকল শীতের পাতাছাড়া ছোট্ট বটগাছটি। শিকারীও উধাও, বন্দুকও। এই দেখে পাখিগুলো একে-একে আবার ফিরে আসছে। হাল্কা বাতাসে পুকুরের জলের মৃদু আলোড়নের মতোই মিঞার মনে আনন্দের ছোট্ট-ছোট্ট ঢেউ খেলে যায়। একটি-দুটি ক'রে হাঁসগুলো এসে গাছের ডালে নিশ্চিন্ত মনে বসতে শুরু করল। আখ্‌তার মিঞা এমনই নিশ্চল এবং স্থবির যেন তার পায়ে সত্যিই বটগাছের শেকড় গজিয়েছে। একটি খয়েরি রঙের হাঁস তার বাঁ কাঁধে বসল। মিঞা তার ডান হাত নামাল। একটু থামাল। তারপর খুব আস্তে-আস্তে পিঠ ঘেঁষে সেই হাতটি বাঁ কাঁধের কাছে নিয়ে হাঁসের ল্যাজে ধ'রে, এক হ্যাঁচকা টানে নামিয়ে থলেতে পুরে দিল। কয়েক মিনিট পর আরেকটি এসে বসল। এটিকেও একই কৌশলে ধ'রে ফেলল। এই অভাবনীয়

এবং অত্যন্ত মৌলিক উপায়ে সারা বিকেলে মিঞার শিকারের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল মোট চব্বিশটি পাখি। আখ্‌তার মিঞার অশ্রুতপূর্ব এবং অবিশ্বাস্য শিকার-কাহিনীর যে এইখানেই ইতি নয় সে-কথায় পরে আসছি।

রমজানের মাস। সারাদিন নির্জলা উপোসের পরে আমাদের পাড়ার সব মুসলমানেরা হাত ধুয়ে নামাজ পড়ে। একত্র হয়ে ইফতার করে। আখ্‌তার মিঞা, মসজিদের দরজায় ভিখিরীদের, ছোলাভাজা, ফুলোরি, পেঁয়াজি, মুড়ি ইত্যাদি কিনে বিলি করে। পুণ্য করবার উদ্দেশ্যে নয়, নিছক মানবিকতার খাতিরে। ধর্মীয় আচার, রীতিনীতির বাহ্যিক প্রকাশে তার তেমন আগ্রহ নেই। কিন্তু যাদের আছে তাদের প্রতি কোনোপ্রকার অবজ্ঞা অথবা অশ্রদ্ধা প্রকাশে সে নিতান্তই বিমুখ। মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধের সময় নানা ধর্মের সেপাইদের সঙ্গে একত্রে লড়াই করা এবং সকল অবস্থায় সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার হবার যে একক অভিজ্ঞতা তার হয়েছিল, সে-কথা সে কোনোদিনই ভোলেনি। সেদিন থেকেই মানবজাতির সহধর্মিতায় সে বিশ্বাসী। ব্যক্তিগত কোনো কারণেই হোক, কিংবা অন্যদের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধার খাতিরেই হোক, রমজানের এক মাসকাল, আখ্‌তার মিঞা শিকার থেকে ছুটি নেয়। সংযমের এই কালটিতে, জীবন তার কাছে নিরানন্দ এবং একঘেয়ে মনে হয়। ঈদ-উল্‌-ফিতর-এর পরদিন থেকেই তার হাত-পা আবার নিশপিশ করে। শিকারের ধান্দায় তার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে।

হপ্তার পর হপ্তা, মাসের পর মাস পাখি শিকারের একঘেয়েমিতে মিঞার মনে এমন ক্লান্তি এল যে, নতুন কিছু শিকারের ধান্দায় সে মেতে উঠল। ঢাকা থেকে ভাওয়ালের দিকে যেতে যে জঙ্গল পড়ে তাতে সবরকম শিকারই তো পাওয়া যায়। তাছাড়া, বনে-বাদাড়ে একা ঘুরে বেড়াবার আনন্দই বা কম কিসের।

আমাদের পাড়ার পর্তুগিজ গির্জের কম্পাউণ্ডের ভেতর একটি মস্ত পেয়ারা গাছ ছিল। আমি আর শম্ভু পেয়ারা খাবার উদ্দেশে সেদিকে এগোচ্ছি, দেখি আখ্‌তার মিঞা কম্পাউণ্ডের কল থেকে এক কুঁজো খাবার জল নিয়ে তার দোকানের দিকে যাচ্ছে। কাছাকাছি আসতেই শিকারের গপ্পো শোনাবার জন্যে তাকে, আমরা দু-জনে, গাজিগাজি ক'রে ধরলাম। মিঞার যুদ্ধ এবং শিকার-কাহিনীর মজুতের কোনো শেষ নেই। অতিরঞ্জনেও মিঞার জুড়ি নেই। তা সত্ত্বেও, মৌলিকত্বে গপ্পোগুলো নিতান্তই সরস এবং বলার ঢঙও তেমনি রসাল। কথার সঙ্গে পাকা অভিনয়ের মিশ্রণে, এগুলো, তার মুখে এতই জ্যান্ত হয়ে ওঠে

যে, ঘটনার প্রবাহ শুধু অব্যাহত থাকে না, যেন সেগুলো শ্রোতার প্রত্যক্ষেই ঘটছে। ডেন্টিস্ট না-হয়ে যদি পেশাদারী গল্পের কথক হ'ত, তা হলে মিঞার পশার বেশি ছাড়া কম হ'ত না।

পাড়ার বেশিরভাগ কিশোরদের কাছে সে ছিল, আক্ষরিকভাবে, টার্জানের মতোই এক অসাধারণ হিরো এবং এ-কারণেই মিঞার সঙ্গে তাদের খুব ভাব জ'মে উঠেছিল। তার খাকি হাফসার্টের বোতামওয়ালা বুকপকেট দুটি, তাদের জন্যে, সর্বদাই লজেন্স আর পিপারমেন্টে ঠাসা থাকে। তার এই কিশোরপ্রীতি অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখে; যাই হোক, রোমাঞ্চে, উত্তেজনায় এবং চাঞ্চল্যে তার শিকারকাহিনীগুলো, রণক্ষেত্রের কাহিনীর চাইতে কোনো অংশে কম ছিল না।

সেবার সারাদিন ধ'রে জঙ্গলে ঘুরে-ঘুরে মিঞা, খরগোশ-হরিণ তো দূরের কথা, একটি ছোট্ট ঘুঘু কিংবা তিতির পক্ষীরও সন্ধান পেল না। আজ পর্যন্ত সে কিছু-না-কিছু হাতে ক'রেই ফিরেছে। তাই আজ খালি হাতে ফিরলে লোকেই-বা বলবে কী! এ-কথা ভেবে তার অহমিকায় এমনই প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল যে, মিঞা তক্ষুনি সংকল্প করল, রাতটা জঙ্গলে কাটিয়ে পরদিন নিদেনপক্ষে একটা তিতির পক্ষী কিংবা বনমোরগ শিকার ক'রে ফিরবে। তাছাড়া জঙ্গলে রাত কাটাবার বেশ-একটা নতুন অভিজ্ঞতাও হবে। সঙ্গে যে-খাবার এবং জল এনেছিল তার অনেকটাই অবশিষ্ট আছে। কাজেই চিন্তা কিসের! যাই হোক, এত বড়ো বপু নিয়ে তো আর গাছে চ'ড়ে রাত কাটানো সম্ভব নয়। এই মনে ক'রে মিঞা নিরাপদে, নিশ্চিন্ত মনে, নিদ্রা দেবার একটি জায়গার সন্ধানে বেরুল। খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি করবার পর, ঝোপের আড়ালে, শরের মতো লম্বা ঘাসে ঢাকা, মস্ত বড়ো প্যাকিং বাক্সের মতো একটা জিনিস দেখে মিঞা চম্‌কে গেল। বিস্তৃত এই জঙ্গলের আশেপাশে, জনমানবের তো কোনো বসতি নেই। কোত্থেকে এটা এল? কৌতূহলে খানিকটা এগুতেই সে দেখল যে, ঐ-বাক্সটা একটা ইঁদুর মারবার কলের মতোই। সরু সুত্‌লি দিয়ে গাছের ডালের সঙ্গে বেঁধে খাঁচার দরজাটা ফাঁক ক'রে রাখা আছে। আরো কাছে গিয়ে ভেতরে উঁকিঝুঁকি মারতেই সন্দেহ হ'ল যে খাঁচার অন্ধকারে কী একটা খসখস্ আওয়াজে নড়ছে-চড়ছে। চম্‌কে গেলেও প্রথম মহাযুদ্ধের বীর যোদ্ধা এত অল্পেতে ঘাবড়াবার পাত্র নয়। এ-রকম পরিস্থিতিতে তার দুঃসাহসিক বৃত্তিগুলো এক অজানা কারণে সুড়সুড়ি দিয়ে জেগে ওঠে। মিঞা তার বন্দুকটা নেড়েচেড়ে সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিল। তারপর একটা দেয়াশলাইর কাঠি ধরিয়ে উঁচু ক'রে ধরতেই

দেখতে পেল, দড়িতে বাঁধা একটা কুচকুচে কালো ছাগল খাঁচার অন্ধকারে মিশে গিয়ে ভয়ে জড়সড় হয়ে আছে। মিঞাকে দেখেই দড়ি ছিঁড়ে যেন ছুটে এগিয়ে আসতে চাইছে। এবার মিঞার কাছে খাঁচার রহস্যটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। 'বাঃ ; খাসা, খাসা। দরজাটা নামিয়ে দিয়ে এই খাঁচার মধ্যে শুয়ে নিশ্চিন্ত মনে একটা ঘুম দেওয়া যাবেখন।' ছাগলটা মিঞাকে কাছে পেয়ে যেন তার প্রাণ ফিরে পেল। কৃতজ্ঞতাবোধে, উ হুঁহুঁ, উ হুঁহুঁ, উ হুঁহুঁ ক'রে, অবিকল ওস্তাদ গাইয়ের মতো গলা কাঁপাতে থাকল। মিঞার মোলায়েম লোমশ শরীরের সঙ্গে নিজের গা ঘঁষে, কালো চতুষ্পদটি অনির্বচনীয় এক আনন্দে মেতে উঠল। মিঞাও তাকে নিতান্তই নিকট মনে ক'রে তাকে জড়িয়ে ধরল, গায়ে হাত বুলিয়ে দিল। এদিকে সারাদিনের হুজ্জুতির পর তার চোখের পাতায় যেন জগদ্দল নেমেছে।

বনের রাত যেমনই নিঝুম তেমনই ঠুন্‌কো। সরব একটানা ঝিল্লির ডাক সারা বনটার মধ্যে এমনভাবে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, মনে হয় যেন দু-তিনটে এরোপ্লেন একইসঙ্গে, একই গতিতে উড়ছে। শরতের ঘন নীল আকাশের নক্ষত্রের মতোই অসংখ্য জোনাকি জ্ব'লে উঠেই নিভে যায়। মাঝে-মাঝে প্যাঁচা আর তক্ষকের ডাক ঝিল্লিরবের একঘেয়েমিকে ভেঙে দিচ্ছে। বিকল জলের কলের মতো ফোঁটা-ফোঁটা শিশিরবিন্দু গাছের পাতা থেকে গড়িয়ে খাঁচার ছাদে প'ড়ে টুপটাপ্ আওয়াজ করে। শুকনো পাতার ওপর দিয়ে মাঝে-মাঝে নিশাচর প্রাণীরা খাবার সন্ধানে ঘুরঘুর করে। আরো যে কত অপরিচিত রহস্যময় শব্দ তার হিসেব করা কঠিন। শহরের আওয়াজ থেকে কী স্বতন্ত্র! কখন যে মিঞা ঘুমের গভীরে তলিয়ে গেল টেরও পেল না।

অনেকক্ষণ একটানা ঘুমোবার পর মিঞার মনে হ'ল ছাগলটা অস্বাভাবিকরকম উশ্‌খুশ্ করছে। তার কানের কাছে মুখটা এনে অদ্ভুত একটা চাপা আওয়াজে কিছু বলবার চেষ্টা করছে। টুঁটি টিপে ধরলে যে-রকম আওয়াজ বেরোয় অনেকটা সে-রকম। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় মিঞা তার গায়ে হাত বুলিয়ে তাকে ঘুম পাড়াতে গেলে, চতুষ্পদটা রীতিমতো মাথা দিয়ে ধাক্কা মারতে থাকল। দু-একটা পাখির অস্পষ্ট ডাক শোনা গেল। রাত কাবার হয়ে এল নাকি! কিন্তু খাঁচার বাইরে এখনো যে ঘুটঘুটটি অন্ধকার! হঠাৎ খাঁচাটা মস্ত এক ঝাঁকুনি খেয়ে মটমট ক'রে উঠল। মিঞার চোখে অবশিষ্ট তন্দ্রাটুকু এবার উবে গেল। স্বপ্ন দেখছে না তো? একটু কান পেতে থাকতেই মিঞার মনে হ'ল খাঁচার বাইরে একটা-কিছু নিঃশব্দে

ঘোরাফেরা করছে। এ-কথা ভাবতে-ভাবতেই খাঁচার দরজাটাকে নিয়ে কে টানা-টানি শুরু করল। পরমুহূর্তেই খাঁচাটা আগের মতোই আবার নড়বড় ক'রে উঠল। চিড়িয়াখানার জন্তুজানোয়ারদের খাঁচার সামনে দাঁড়ালে যে উৎকট গন্ধ পাওয়া যায় সে-রকম একটা দুর্গন্ধ মিঞার নাকে ভেসে এল। যাই হোক, ব্যাপারটা অবিলম্বে তদারক করা দরকার, এ-কথা ভেবে এগিয়ে গেল। একটা দেয়াশলাইর কাঠি ধরিয়ে খাঁচার দরজায় শিকের ফাঁক দিয়ে তাকাতেই মিঞার চক্ষুস্থির।

গলিত পিচের মতো চকচকে কালো অন্ধকারে টর্চের মতো দুটো কী জ্বলছে! ঐ-আলো কিসের তা ঠাহর করবার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু ঝাপ্‌সা-মতো যেটুকু দেখা গেল, তাতেই মিঞার শরীরে উত্তেজনা এবং রোমাঞ্চের বান ডাকল। সত্যি কথা বলতে কি বড়ো কিছু শিকারের জন্যে সে তো তৈরি হয়ে আসে নি। যাই হোক, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে। যুদ্ধক্ষেত্রে এ-রকম কত অপ্রত্যাশিত, আচম্‌কা পরিস্থিতিরই তো সে সহজে মোকাবিলা করেছে। শিকার যত বড়োই হোক-না কেন, যদি ঠিকমতো নিশানা ক'রে, দুই চোখের মাঝখানের বিন্দু-টিতে কয়েকটি ছর্‌রাগুলি বসিয়ে দিতে পারে, ঘায়েল হবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। তাছাড়া তার হাত-পা'ই বা বন্দুকের চাইতে কম কিসের। এই হাত দিয়েই তো গণ্ডায়-গণ্ডায় জার্মানদের শূন্যে উঠিয়ে মাটিতে আছড়ে মেরেছে—ভলিবলের মতো এখান থেকে ওখানে ছুঁড়ে দিয়েছে। কিন্তু কই! কোথায় গেল টর্চের মতো সেই চোখ। নিমেষের মধ্যে জানোয়ারটা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল! হঠাৎ খাঁচাটা এমন অসম্ভবরকম দুলে উঠল যে তার কাঠের পাটাতনগুলো খ'সে পড়ে আর কি। মিঞা তক্ষুনি ট্রিগারে হাত দিল। চারদিকে জমাট নিস্তব্ধতা। হয়তো একটা শুক্‌নো শালপাতা হবে, ঠাস ক'রে মাটিতে পড়ল। পোকামাকড়দের চলাফেরাও থেমে গেছে। দারুণ অনিশ্চয়তাপূর্ণ এক মুহূর্ত! হঠাৎ খাঁচার ছাদে, সাংঘাতিক আওয়াজে, কী একটা ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছাদটা মিঞার মাথায় পড়েছিল আর কি! জন্তুটা নিশ্চয়ই গাছে চ'ড়ে, ছাদ দিয়ে খাঁচায় প্রবেশ করবার চেষ্টা করছে। পরমুহূর্তেই দরজার সামনে লাফিয়ে প'ড়ে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। মিঞা দরজার আড়ালে বন্দুক উঁচিয়ে রইল। অন্ধকারের ভেতর থেকে জানোয়ারটা এবার হঠাৎ দৌড়ে এসে দরজায় প্রচণ্ড জোরে একটা থাবড়া মারল। পুরো খাঁচাটা চুরমার হয়ে গেছিল আর কি! মিঞা শিকারের দিকে নিশানা ক'রে পর-পর বন্দুক চালাল। পাখি মারার ছর্‌রাগুলি যতই তার গায়ে লাগছে, জানোয়ারটাও বিরক্তিতে, ততই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। একেকবার খাঁচাটাকে ধাক্কা মারে,

গুলি খেয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই মিঞ্রার কার্তুজগুলো সব খালি হয়ে গেল। এখন মিঞ্রা করে কী! বন্দুকটা নামিয়ে রাখল। খাঁচার দরজাটাকে খানিকটা ফাঁক ক'রে দিয়ে আড়ালে ঘাপটি মেরে রইল। দু-এক ফোঁটা শিশিরজলের টুপটাপ্ আওয়াজ বনের নিস্তব্ধতাকে সরব ক'রে তুলল।

মনে হ'ল খাঁচার তলায় খুব আস্তে-আস্তে কিছু নড়াচড়া করছে। তারপরই মিঞ্রা দেখল যে, নিঃশব্দে, তার পেছনের দু-পায়ে ভর ক'রে জানোয়ারটা খাঁচার দরজাটা ধ'রে দাঁড়িয়ে উঠেছে। লাফ দিয়ে ভেতরে উঠে আসে আর কি! এই একক মুহূর্তটির জন্যেই মিঞ্রা এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। যেই না দরজার ফাঁক দিয়ে মাথা গলাল, বিদ্যুৎবেগে দরজাটাকে বিরাট জন্তুটার গর্দানের ওপর নামিয়ে দিল। তার একটা থাবাও চাপা পড়ল। অন্য থাবাটা দিয়ে দরজাটা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করল। মিঞ্রা তার পুরো শক্তি আর ওজন দিয়ে তার ওপর চেপে বসল। সাংঘাতিক এক ধস্তাধস্তিতে খাঁচার মেঝের এক দেওয়ালের কয়েকটা পাটাতন খ'সে পড়ল, সে এক তুমুল কাণ্ড। মেসোপটেমিয়ার মরুভূমিতে সেই অসাধারণ নৈশভোজনের পর তার গায়ে যে আসুরিক শক্তি জন্মেছিল, মিঞ্রা আজ তা পরখ করবার প্রথম সুযোগ পেল। সে অবাক হয়ে আবিষ্কার করল যে, পূর্ণবয়স্ক একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগারের গর্দান চেপে রাখতে একমাত্র তার বাঁ হাতই যথেষ্ট। এ-রকম দুটো বাঘ একসঙ্গে এলেও কোনো অসুবিধে হ'ত না। তার শরীরের এই প্রচণ্ড শক্তির খবর পেয়ে যেমন সে চমকে উঠল, তেমনি গর্বে তার শরীরের মাংসপেশীগুলো নেচে উঠল। প্রায় সুদীর্ঘ ত্রিশ মিনিট ধস্তাধস্তির পর বাঘটা ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। মিঞ্রা কিন্তু কোনো ঝুঁকি নিতে চাইল না। বুদ্ধি আর ধূর্ততায় পশুজগতে বাঘের যে জুড়ি নেই, এ-কথা তো মিঞ্রা ভালো ক'রেই জানে। তাই বাঘটা যে ধোঁকাবাজি করছে না, কে বলতে পারে! এইভাবে আরো খানিকক্ষণ কাটল। তারপর ব্যাপারটা যে-ধরনের একটা নাটকীয় মোড় নিল, মিঞ্রা তার জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না।

একটা বনমোরগ ডেকে উঠল—কুক্করু কু, কুক্কর কু। সে-ডাক শুনে দু-একটা কাকও ডাকল। তারপর আরো কয়েকটা কাক, বসন্ত বাউল এবং হাড়ি-চাঁচার ডাক শোনা গেল। এই ঘন শালবনে ভোরের আলো প্রবেশ করতে স্বভাবতই বেশ দেরি হচ্ছিল। অনেক দূর থেকে একটা অদ্ভুত আওয়াজ মিঞ্রার কানে ভেসে এল। কিছুক্ষণের মধ্যে সেই আওয়াজ একটা গোলমালের আকার ধারণ করল।

মাদল, ঢাক, ঢোল, নাকারা, ঢ্যারা, ক্যানেস্তারা ইত্যাদির আওয়াজের সঙ্গে মানুষের চিৎকার! এই গোলমালের আওয়াজ ক্রমশই স্পষ্টতর হচ্ছে। কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরের আবছা আলোয় শালগুঁড়ির ফাঁক দিয়ে তাকাতেই দেখা গেল যে এক জনতা – হাতে বর্শা, লাঠি, মাছ ধরবার টঁ্যাটা, কোঁচ – এ-সব নিয়ে এগুচ্ছে। মেসোপটেমিয়ার যোদ্ধার মনে না এল কোনো আশঙ্কা, না এল কোনো চিন্তা। হঠাৎ ঢাক, ঢোল, টিনের আওয়াজ থেমে গেল। চিৎকার চেঁচামেচিও। লোকগুলো স্থিরদৃষ্টিতে খাঁচার দিকে চেয়ে আছে। ভীষণ তৎপরতার সঙ্গে, নিজেদের মধ্যে কি কানাঘুষো আরম্ভ করল। তারপর, আবার একদম চুপ্। হঠাৎ ঢাক-ঢোল-ন্যাকারা-ক্যানেস্তারা, যুদ্ধের দামামার মতো একই সঙ্গে বেজে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে জনতাও ক্ষিপ্ত হয়ে লাঠি, টঁ্যাটা, কোঁচ, বর্শা উঁচিয়ে, 'মার' মার' চিৎকারে এগুতে থাকল। খাঁচার দরজাটি প'ড়ে বন্ধ আছে। তার পিছনে আখ্‌তার মিঞা। হঠাৎ তার বুকের মধ্যে একটা ভয় লাফ দিয়ে উঠল। যুদ্ধোত্তর জীবনে এই তার প্রথম ভয়। হয়তো একটা ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে। হয়তো তার জান নিয়ে টানাটানি হবে। আখ্‌তার মিঞা দু-পা দিয়ে খাঁচার দরজাটাকে চেপে ধ'রে, তার দু-হাত খাঁচার বাইরে উঁচিয়ে ধরল। তারস্বরে চিৎকার করতে থাকল, 'আমি মানুষ আমি মানুষ।' মিঞার লোমশ কালো শরীরটিকে দেখে জনতা ততোধিক হকচকিয়ে গেল, এ কী! বাঘের খাঁচায় বনমানুষ কী ক'রে এল। ভূতপ্রেত নয় তো? খাঁচার দরজার তলায় নেতিয়ে-পড়া বাঘের শরীরটা কাশের মতো লম্বা-লম্বা ঘাসে ঢাকা প'ড়ে আছে। এদিকে মিঞা তার সর্ব শক্তি দিয়ে তেমনি আর্তনাদ ক'রে যাচ্ছে—'আমি মানুষ, আমি মানুষ।' তার বিরাট পেটের খোলের ভেতর থেকে এই নাদ্ উঠে শালের ডগায় ধাক্কাখেয়ে, উউষ্…উউষ্… উউষ্ ক'রে প্রতিধ্বনি করতে থাকল। জনতা লক্ষ করল যে আখ্‌তার মিঞা তার ডান হাতের তর্জনী নিচের দিকে ক'রে কী একটা নির্দেশ করছে। তারা এক পা-দু'পা ক'রে এগুচ্ছে, কিন্তু এই তর্জনী-নির্দেশের কোনোই হদিশ পাচ্ছে না। আচম্‌কা এক দম্‌কা হাওয়ায় খাঁচার সুমুখের ঘাসগুলো নুয়ে পড়তেই বাঘের মুণ্ডুটা মুহূর্তের জন্যে দেখা দিয়ে আবার ঢাকা প'ড়ে গেল। ব্যাপারটা পুরোপুরি খোলশা না-হ'লেও জনতার বুঝতে দেরি হ'ল না যে খাঁচার ভেতর এই কালো, লোমশ জীবটা বাঘটাকে কোনো বিপদে ফেলেছে। এই মনে ক'রে তারা সন্তর্পণে এগুতে থাকল। তারপর সব খামোশ্। জনতার চোখ ছানাবড়া। হঠাৎ ঢাক-ঢোল-নাকারা-ঢ্যারা-ক্যানেস্তারা ভীষণ জোরে বেজে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে শুরু

হ'ল নৃত্য। আখ্‌তার মিঞা খাঁচার ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে ধেই-ধেই ক'রে নাচতে থাকল। সারা শালবনটা একদিকে নৃত্যসংগীতের উল্লাসে আর অন্যদিকে মিঞার নাচের তালে কেঁপে উঠল।

আমি আর শম্ভু স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে অসাধারণ কাহিনীটি শুনছি, এমনসময় আখ্‌তার মিঞা 'ব্যাস' এই ব'লে নাটকীয়ভাবে উঠে পড়ল। আমরা দু-জনে লাফ দিয়ে তক্ষুনি তার হাত ধ'রে ফেললাম। নাছোড়বান্দার মতো বলি, 'না না। এইখানে গপ্পো শেষ করলে চলবে না। এমন জবরদস্ত, দুঃসাহসিক শিকার-কাহিনীর কথা কেউ জানল না, এ কী ক'রে সম্ভব হয়।' আখ্‌তার মিঞা 'সময় নেই আর একদিন হবে' এইসব ব'লে নানারকম নখরাবাজি করে, আমরাও নাছোড়বান্দা। মিঞা অবিশ্যি আমাদের এ-কাকুতিমিনতির জন্যেই অপেক্ষা করছিল। তারপর সংক্ষেপে যা বলল তা অনেকটা এইরকম।

এ অসাধারণ বীরত্বপূর্ণ শিকারকাহিনী ঢাকাবাসীদের কানে যেমন ক'রেই হোক, তাকে পেঁ ৗছে দিতে হবে। তাছাড়া, বাঘের লাশটা দেখালে জেলার সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে নগদ পুরস্কারও পাওয়া যাবে।

পরদিন বেলা তিনটে নাগাদ আমাদের ইসলামপুর বাবুরবাজার পাড়ায় অসাধারণ উত্তেজনা। পাড়াশুদ্ধু লোক—এমন-কি পর্দানশিন্ জুবেদা, জয়নাব, সিতারাও রাস্তার দু-পাশে ভিড় ক'রে ভীষণ উৎকণ্ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। নবাব বাড়ির ফটকে খোদ্ নবাব সাহেবও উপস্থিত। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল বাবুরবাজারের পুলের ওপর দিয়ে আখ্‌তার মিঞার জলুস্ এগিয়ে আসছে। আরেকটু এগুতেই দৃশ্যটি স্পষ্ট হয়ে উঠল। সামনে নাকারাবাদকেরা, পেছনে—মিঞা, বন্দুক হাতে। গায়ে তার বহুপরিচিত পোশাক—মিলিটারি খাকি হাফ-সার্ট, মালকোঁচামারা ধুতি, ক্যাম্বিসের জুতো। মুখে মৃদু হাসি। স্ফীত, প্রশস্ত বুক। চলার রকমটি দেখে মনে হয়, ঠিক যেন ছোটোখাটো একটি পাহাড় গজগমনে এগিয়ে আসছে। তার পেছনে কুড়িটি লোকের কাঁধে-রাখা লম্বা বাঁশ-দুটি থেকে বিরাট রয়েল বেঙ্গল টাইগার ঝুলছে। ল্যাজসমেত বারো ফুটের বেশি চাই তো কম নয়। বিকেলের পড়ন্ত আলোতে তার ডোরাকাটা, মর্তমান কলার রঙের লোমশ অবয়বটি কুচকুচে কালো বাহকদের মাঝখানে প'ড়ে এমনই জাঁকালো বৈষম্য সৃষ্টি করেছে যে, বাঘটা দূর থেকে ঠিক সদ্য পালিশ-করা একটি সোনার ভাস্কর্যের মতো ঝলমলিয়ে উঠেছে। কী অসাধারণ সুন্দরী প্রাণী। যেমনই তার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুষমা, তেমনি বহিঃরেখার ছন্দ। প্রাণহীন অবস্থায়ও

যে একটি প্রাণী এত অসাধারণ সুন্দর হ'তে পারে, এ-বাঘটিকে যাঁরা দেখেছেন শুধু তাঁরাই জানেন। এমন প্রাণীকেই তো যথার্থ শাদুর্ল বলা যায়। এক কথায় সৃষ্টিকর্তা যেন তাঁর সৌন্দর্যের ভাণ্ডার উজাড় ক'রে দিয়েছেন তার গায়ে।

এতক্ষণে মিছিল আমাদের পাড়ার মস্‌জিদের সামনে এসে পড়েছে। আখ্‌তার মিঞার বন্ধুরা, মোল্লারা, মস্‌জিদের দোতলার আঙিনা থেকে পুষ্পবৃষ্টি করল। জনতার অবিরাম করতালিতে কানে তালা লেগে যায়। সাত্তার মিঞা, ঝুল্লুর মিঞা, মির্জাসাহেব, কাল্লু মিঞা, অক্ষয়বাবু, ব্রজবাবু এবং আখ্‌তার মিঞার আরো অনেক বন্ধুরা সমস্বরে ব'লে উঠল, 'জব্বর দেখাইলা মিঞা, জব্বর।' হঠাৎ একটা মস্ত সাদা গোলাপ আখ্‌তার মিঞার প্রশস্ত, স্ফীত বুকের ছাতিতে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ল। কত ফুলই তো এতক্ষণ তার সর্বাঙ্গে প'ড়ে নিচে লুটিয়ে পড়েছে। কই, মিঞা তো সেগুলোকে কুড়োবার কোনো চেষ্টাই করেনি। কিন্তু এ-গোলাপটিকে একটি ছোটো টিয়েছানার মতোই দু-হাতে আল্‌তো ক'রে তুলে খানিকক্ষণ নাকের ডগায় ধ'রে রাখল। তার মুখের মৃদু হাসিটি মুখের এপাশ থেকে ওপাশ অব্দি ছড়িয়ে পড়ল। তারপর, সেটিকে বুকপকেটের বাটন্‌-হোলে গুঁজে দিল। এই জনসমুদ্রের ভেতর থেকে কে এই ফুল ছুঁড়ে দিল? এই রহস্যময় প্রশ্নটি, মিছিল শেষ হবার পরেও, অনেকের মনেই ঘোরাফেরা করতে থাকল।

মিছিল আর কয়েক গজ এগুতেই খোদ নবাবসাহেব উঠে এসে আখ্‌তার মিঞার গলায় অত্যন্ত সুগন্ধি ফুলের একটি মালা পরিয়ে দিলেন। তারপর, পাশে নোকরের হাতে-রাখা রুপোলি রেকাবি থেকে লাল রেশমী ফিতে লাগানো একটি স্বর্ণপদক তুলে মিঞার ছাতিতে পরিয়ে দিয়ে বললেন, 'শাব্বাশ্‌ মিঞা, শাব্বাশ্‌। মুকরর্‌রর, মুকরর্‌রর্‌!'

এই ঘটনার জের শেষ হ'তে-না-হ'তেই আরেকটি জাঁকালো ঘটনা ঘটল। বাঘ নিয়ে ঢাকায় প্রবেশের জয়োল্লাস মিছিলের মতোই আরেক মিছিল বেরুল। মিছিলের সামনে এবং পেছনে ভ্যাঁপ্‌পো, ভ্যাঁপ্‌পো আওয়াজে দুই বিরাট ব্যাণ্ড পার্টি। রঙবেরঙের জামা-পরা খালি পায়ে সারি-সারি কুলিদের মাথায় ঢেউ-খেলানো গ্যাসের বাতি। মাঝখানে সাদা জুড়িঘোড়ার ফিটন্‌ গাড়িতে ঈষৎ বাদশাহী ঢং-এ বসা একটি অসাধারণ পুরুষ। গায়ে রেশমী আচ্‌কান, হাতে মিছিলে প্রাপ্ত ফুলটির মতোই একটি সাদা গোলাপ। মাথায় জরিদার কালো মখমলের জমকালো লক্ষ্ণৌই টুপি। গলায় বেলফুলের মালা। মুখে খুশির জোয়ারে

বাঁধ দেয়া হাসি। দুলহার বেশে, ওয়ারল্ড-রিনাউণ্ড ডেন্টিস্ট, প্রথম মহাযুদ্ধ-প্রত্যাগত বীর যোদ্ধা এবং শিকারি, মিঃ জেড্ এম আখ্তার। পাশে তেমনি জমকালো লাল ওড়নায় ঢাকা শরমিলা দুলহান।

পরদিন আখ্তার মিঞার বিশ্বস্ত বন্ধু অক্ষয়বাবুর কাছে শোনা গেল যে, মিছিলের দিন ঐ ধপধপে সাদা বড়ো গোলাপটি নাকি জুবেদারই হাত থেকে এসে মিঞার বুকে টোকা মেরেছিল।

“প্রসন্ন কুমার”

প্রসন্নকুমার

চৌকাটের সামনে সেকেলে একটি আয়না। আশেপাশে দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম – ভাঁজ করা বিলিতি ক্ষুর, সাবান, বুরুশ ইত্যাদি। একটি ছোটো বাটিতে কালো রঙের অল্প পরিমাণ তরল পদার্থ। সকালের স্বচ্ছ আলোয়, জল-চৌকিতে ব'সে বৃদ্ধ, অথচ সবল, গুরুগম্ভীর এক পুরুষ। হাতে মিনিয়েচার টুথ-ব্রাশের মতো দেখতে একটি তুলি। এটি কালো রঙে ডুবিয়ে অনেক দিনের তা-দেয়া গোঁফে এবং পাট-করা চুলে বুলিয়ে দিচ্ছেন। গায়ে সাদা ফতুয়া এবং পাড়-ছাড়া কুচ-কানো ধুতি। পায়ে খড়ম। চুল-গোঁফের প্রসাধন সেরে কুচোনো ম্যানচেস্টারি 'নয়নসুখ' ধুতি এবং গিলে-করা ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবী পরলেন। ঘরের কোণ থেকে, মাথায় কারুকার্য-করা মোটা লাঠিটি হাতে নিলেন। চালচলনে বিশেষ তাড়া নেই। চুপ ক'রে কী ভাবতে-ভাবতে লাঠিটাকে আবার দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখলেন। দেখে মনে হ'ল যেন প্রসাধনের অনুবর্তিতায় কিছু একটা বাদ পড়েছে। পুরোনো, মস্ত বড়ো কাঠের আলমারি খুলে এক টুকরো তুলো, সুগন্ধি আতরে ভিজিয়ে, ডান দিকের কানে গুঁজে দিলেন। আরেকবার আয়নার দিকে তাকিয়ে লাঠি তুলে সন্তর্পণে দোতালার সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন। উঠোনের বাঁ পাশে দোলায়মান পোষা কাকাতুয়াটি প্রত্যহ এইসময় মনিবকে দেখে মহা-উল্লাসে তারস্বরে চিৎকার ক'রে ওঠে। তিনি নিজের হাতে তার মুখে দুটি ছোলা পুরে দিয়ে বলেন, 'বল, হরে রাম হরে কৃষ্ণ'। তারপর উঠোন পেরিয়ে বৈঠক-খানায় তক্তপোশের ওপর তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসলেন।

গোপাল! – এই হাঁকে সমস্ত বাড়িটা যেন থরথরিয়ে উঠল। পুরাতন, অতি অনুগত এবং বিশ্বস্ত বিহারী ভৃত্য গোপাল, অম্বুরী তামাক সেজে টিকেতে ফুঁ দিতে-দিতে গড়গড়া রেখে গেল। একটু বাদেই তিনি জুড়িঘোড়ার গাড়িতে চ'ড়ে রোগী দেখতে বেরুলেন।

ইনি তৎকালীন পূর্ববঙ্গের অতি খ্যাতনামা বৈদ্যরাজ শ্রীকালীকুমার সেন মহাশয়ের প্রথম পুত্র শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন। স্থান উনিশশো পঁচিশ-ছাব্বিশের ঢাকা

শহর। পেশা কবিরাজি। পুরুষানুক্রমে অন্তত আড়াইশো বছর ধ'রে সেন-পরিবারে একই পেশা চ'লে এসেছে। এই বংশের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা নাকি অনেককাল আগে কাশীধাম থেকে পূর্ববঙ্গে এসেছিলেন।

প্রসন্নকুমারের ঔরসে প্রথম স্ত্রীর গর্ভে পাঁচটি কন্যা এবং তিনটি পুত্র জন্মায়। এই স্ত্রী বিয়োগ হবার পর তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী পারগ্রহণ করেন। তাঁর গর্ভে জন্মায় আরো বারোটি সন্তান—সাতটি পুত্র এবং পাঁচটি কন্যা। মোট কুড়িটি। এমন পুরুষের আকৃতি এবং প্রকৃতি, কিঞ্চিৎ মেদ থাকা সত্ত্বেও, নর-শার্দূলের মতো হবে এতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে। শিরা-উপশিরায় নীলরক্ত না-বইলেও অনেকেই যে তাঁকে ছোটোখাটো জমিদার ব'লে ভুল করবে, এতেই-বা দোষের কী। দৈর্ঘ্যে ছয় ফুট। পুরুষ্টু শরীর। বিরাট মুখমণ্ডল—লাল মুলোর মতো রাঙা। এককথায় ডাকসাইটে। এই বিরাট পরিবারে, আমার স্থান, ধারাবাহিকভাবে ছিল সপ্তদশ।

খানিকটা পিতামহের খ্যাতির দরুন খানিকটা নিজের ক্ষমতায়, প্রসন্নকুমারের পশার বেশ জ'মে উঠেছিল। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে ঢাকায়, তথা পূর্ববঙ্গে খাবার-দাবারের সচ্ছলতা এবং অন্যান্য জিনিসের দাম অবিকল শেরশাহ-র যুগের মতো না-হ'লেও, এত সস্তা ছিল যে আজকের পাঠকেরা শুনে হয়তো তাই মনে করবেন। যেমন দু-আড়াই সেরি ইলিশ মাছ চার আনায়। এক-কুড়ি ডিম দু-আনায়। শীতকালে এক টাকায় কুড়ি সের দুধ। ব্রহ্মদেশের সরু সেদ্ধ চাল তিন টাকায় এক মণ। এক ভরি সোনার দাম ষোল টাকা। ছ'খানা ঘরের বারান্দা-উঠোনওয়ালা বাড়ির ভাড়া কুড়ি টাকা হ'লেও বেশি মনে হ'ত। অন্তত আমাদের জিন্দাবাহার গলি, ইসলামপুর এলাকায়। তাই এত বড়ো পরিবারের লালন-পালন প্রসন্নকুমারের পক্ষে মোটেই কষ্টকর ছিল না।

প্রসন্নকুমারের সাধারণ শিক্ষা কতদূর হয়েছিল জানা নেই। ইংরেজি বলতে তাঁকে কেউ কোনোদিন শোনেনি। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় আয়ুর্বেদশাস্ত্র ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ। রোগী পরীক্ষার সময় অনবরত সুশ্রুত, চরক, বাগভট, চক্রপাণি দত্ত থেকে রোগ-সম্পর্কিত উপযুক্ত শ্লোক আওড়াতেন। আয়ুর্বেদ চিকিৎসাবিদ্যা ছিল তাঁর হাতের মুঠোয়। কঠিন রোগে পীড়িত অনেক লোককেই ডাক্তারী চিকিৎসায় বিফল হয়ে, তাঁর ওষুধে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে দেখেছি।

একদিন সকালবেলায় প্রসন্নকুমার যথারীতি বৈঠকখানায় এসে বসেছেন। এমনসময় একটি ঘোড়ার গাড়ি এসে দরজার সামনে দাঁড়াল। লুঙ্গি পরা দুটি

লোক একটি অসুস্থ ছেলেকে কোলে তুলে ভেতরে এল। প্রসন্নকুমার তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসেছিলেন। একটু এগিয়ে, হাত ধ'রে, রোগীকে তক্তপোশে বসালেন। তার দিকে তাকিয়ে একটি সংস্কৃত শ্লোক আওড়ালেন। লোকটির গায়ে ময়লা গেঞ্জি। তারই ভেতর দিয়ে শরীরের প্রত্যেকটি হাড়, পুরোনো ছাতার শিকের মতো ফুটে বেরুচ্ছে। কঙ্কালসার শরীরের অনুপাতে তার মাথাটি এতই বড়ো যে, আমার চোখে পাটকাঠির ডগায় একটি পূর্ণবর্ধিত তালের মতো দেখাল। লোকটি অত্যন্ত দুর্বল। তাই ধুঁকছে। এমন-কি কোটরে ঢোকা চোখদুটি খুলে রাখতেও তার কষ্ট হচ্ছে। পেটের চেহারাটা অবিকল জলে-ভরা ভিস্তির থলিটির মতো। পা-দুটিও অতিকায় মানকচুর মতো ফোলা। দেখেই মনে হয় যে তার আয়ু সীমিত।

রোগীকে ওষুধ দেবার আগে, রোগের ইতিহাস জানা, নাড়ী, চোখ, জিহ্বা ইত্যাদি পরীক্ষা করা—প্রসন্নকুমার, এ-সবের কিছুই প্রয়োজন মনে করলেন না। সরাসরি তাঁর একজন কম্পাউণ্ডারকে ব্যবস্থাপত্র লিখে নিতে বললেন। ওষুধ-গুলোর মধ্যে একটির গালভরা নাম আমার এখনো কানে লেগে আছে। নামটি ছিল বিজয় পটপটি—মুক্তো, সোনা, রুপো, পারদ, বেক্রান্ত অর্থাৎ পোকরাজের মিশ্রণে তৈরি। অন্য সব খাবার বন্ধ রেখে ক্রমশ দৈনিক আধ সের থেকে বাড়িয়ে পাঁচ সের পর্যন্ত দুধ খাবার পথ্য স্থির ক'রে দিলেন। রোগীকে এক মাস পরে আবার দেখা করতে বললেন। এবং তাকে এই ব'লে আশ্বাস দিলেন যে, রোগী এবার নিজেই হেঁটে আসতে সমর্থ হবে। প্রসন্নকুমারের এই প্রচণ্ড আত্ম-প্রত্যয় দেখে আমি স্তম্ভিত।

সেদিন তিনি মধ্যাহ্নভোজনে বসেছেন। কাঁসার থালার মাঝখানে সরু গোবিন্দভোগ ভাতের একটি নিখুঁত গোলাকার স্তূপ। তার ওপর একটি ছোটো ঘিয়ের বাটি। হঠাৎ দেখলে একটি ক্ষুদ্র সাঁচীস্তূপ ব'লে মনে হ'তে পারে। এই স্তূপের চারিদিকে নানারকম খাবারের বাটি সাজানো। পাশেই মস্ত জলের গেলাস। সব-ক'টি বাসনেই খোদাই-করা 'প্রসন্নকুমার' নামটি পশ্চিমের প্রতিক্ষিপ্ত আলোতে জলজল ক'রে উঠেছে। আমি প্রসন্নকুমারের আশেপাশে ঘুরঘুর করছি। আমার মনে একটি প্রশ্ন কিছুক্ষণ থেকেই আনাগোনা করছে। সেটি তাঁকে না জিজ্ঞেস করা পর্যন্ত আমার মনে শান্তি নেই। তিনি আমার দিকে মুখ তুলতেই ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা বাবা, ঐ আধমরা লোকটি কি সত্যি-সত্যিই আবার সুস্থ হয়ে উঠবে?' তিনি মুখে একটি গ্রাস পুরে দিয়ে শুধু একটি আওয়াজ করলেন,

হু ঁ-উ-উ। তাঁর এই অতি সংক্ষিপ্ত অথচ সন্দেহাতীত জবাবে বিস্ময়ে আমি সেখানেই জ'মে গেলাম।

এই ঘটনার কয়েক হপ্তার পর একদিন আমি দোতালার রাস্তার ধারের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। নিচে রোগীদের তেমন ভিড় নেই। জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড গরম। তাই প্রসন্নকুমার তাঁর সমবয়েসীদের নিয়ে আজ রোয়াকে বসেছেন। সবাইর হাতে একটি ক'রে হাত-পাখা। সেগুলো থেকে-থেকে হাতির কানের মতো নড়াচড়া ক'রে উঠছে। গাড়ি ঘোড়া এবং লোকজনের চলাচল, ফিরিওয়ালার হাঁক-ডাকে আমাদের জিন্দাবাহার গলিটি বেশ রমরমা হয়ে উঠেছে। হুঁকোয় ফুড়ুত-ফুড়ুত টানের মাঝে, আড্ডাও তেমনি জমেছে। এমনসময় আমাদের গলির মুখে মাছরাঙা রঙের বোতামওয়ালা গেঞ্জি এবং সবুজ আর লাল দাবার ছকৃকাটা লুঙ্গি-পরা তরতাজা একটি মুসলমান যুবককে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। মাথায় এক ঝুড়ি সিঁদুর রঙের আম, আর একটি মস্ত পাকা কাঁঠাল। ডান হাতের তর্জনীতে উপবিষ্ট, কাঁচা সবুজ রঙের রেশমী বলের মতো মোলায়েম ফুটফুটে একটি টিয়ে শাবক। টিয়ে শাবকটি কাছ থেকে দেখবার লোভে আমি তৎক্ষণাৎ রোয়াকে এসে হাজির হলাম। লোকটি ঠিক আমাদের বাড়ির সামনে এসে থামল। ঝুড়িটি নামিয়ে ঢিপ ক'রে প্রসন্নকুমারের পায়ে মাথা ছোঁয়াল। তিনি চম্‌কে পা সরাতে গেলেন। কিন্তু যুবকের হাত তার আগেই, শেকলের মতো পা-দুটি জড়িয়ে ফেলেছে। যুবকটি হাত-জোড় ক'রে বলল, 'বাবু, আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না, এই বান্দার নাম সামসুদ্দিন। আমি উদরী রোগে ভুগে-ভুগে প্রায় মরতে বসেছিলাম। আপনার চিকিৎসায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি। অল্পবিস্তর ক্ষেতে কাজকর্মও করছি। বান্দার এই সামান্য উপহার গ্রহণ করলে খুশি হব।' প্রসন্নকুমারের পক্ষিপ্রীতির কথা অনেকেরই জানা ছিল। তিনি টিয়ে শাবকটি আলতো ক'রে তুলে নিয়ে সেটিকে চুম্বনের স্বরে আদর করতে-করতে লোকটিকে উদ্দেশ ক'রে বললেন, 'এত সব কেন?' এই ব'লে তিনি গোপালকে একটি খাঁচা আনতে বললেন। এ-ধরনের ঘটনা অভূতপূর্ব না-হ'লেও, প্রসন্নকুমারের চোখে-মুখে একটি অস্ফুট পরিতোষের ভাব ক্ষণকালের জন্যে দেখা দিয়ে আবার মিলিয়ে যায়। হুঁকোয় একটি হাল্‌কা টান দিয়ে বললেন, 'সবই ঈশ্বরের ইচ্ছে।'

এখন বেলা প্রায় বারোটা। রোগী দেখার পালা শেষ ক'রে প্রসন্নকুমার লাল ডোরাকাটা গামছা প'রে স্নানের আয়োজন করছেন। এই মুহূর্তটিতে তিনি পুজো-

আহ্নিকের অভ্যেসমতো একটি জরুরী নিয়ম পালন করেন। শত বাধাবিপত্তি অসুবিধে থাকলেও, এ-নিয়ম পালনে কোনোদিন ত্রুটিবিচ্যুতি হ'তে দেখিনি। আলমারি থেকে ছোটো একটি গোল কৌটো বের ক'রে বারান্দায় রাখা জলচৌকিতে বসলেন। সরষে পরিমাণের একটি বড়ি কৌটোটা থেকে বের ক'রে টক্ ক'রে মুখে পুরে দিয়ে এক গ্লাস জল খেলেন। গোপাল গড়গড়া সাজিয়ে পাশে রেখে গেল। খুব হাল্‌কা টান দিতে-দিতে পশ্চিমের আকাশের দিকে অপলক চোখে তিনি তাকিয়ে আছেন। দৃষ্টি সুমুখের সব বাড়ির ছাদ ডিঙিয়ে দূরে বিশাল বেল গাছটার মাথার ওপর দিয়ে অনন্ত নীলিমায় মিশে যায়। শান্ত সৌম্যকান্তি। ঠিক যেন প্রাচীন মিশরের পাথরে খোদিত ফ্যারাওর একটি মূর্তি। অত বড়ো পরিবারের চিন্তাভাবনা, নানারকম সমস্যা, প্রভুত্ব, ক্রোধ—সব ছুটি নিয়ে অনেক দূরে চ'লে যায়। সম্ভব হ'লে এই সময়টিকে তিনি বেঁধে রাখেন একটু বাদেই গোপাল এসে মনে করিয়ে দেয় যে স্নানের জল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

সেন-পরিবারের সরষে পরিমাণ আফিম খাওয়ার রেওয়াজ নাকি অনেক কালের। আমার ঠাকুরমাকেও খেতে দেখেছি। কী শক্ত বুড়া। দীর্ঘ পঁচানব্বই বছর অব্দি বেঁচে ছিলেন। আমার দিদিমাও খেতেন, তিনিও প্রায় ঐ-রকম বয়সেই দেহত্যাগ করেছিলেন। সম্পূর্ণ মজবুত দু-পাটি দাঁত এবং লাঠির মতো শক্ত শরীর নিয়ে শেষদিন পর্যন্ত স্বপাক রান্না ভোগ ক'রে গেছেন। এমন সৌভাগ্য ক'জনের হয়। আয়ুর্বেদশাস্ত্রমতে টনিক হিসেবে ঐটুকু আফিম প্রচুর দুধের অনুপানে খেলে নাকি মানুষ সবল ও দীর্ঘায়ু হয়। প্রসঙ্গত ব'লে রাখি যে আমার কনিষ্ঠতম ভ্রাতার যখন জন্ম হ'ল, বাবার বয়েস তখন পঁচাত্তর বছর।

প্রসন্নকুমার কীরকম ডাকসাইটে লোক ছিলেন, সে-কথা আগেই বলেছি। মেজাজও ছিল তেমন মানানসই। ছেলেমেয়েদের সামনে স্বভাবতই স্বল্পভাষী এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ। আমি তো দূরের কথা, বৈমাত্র দাদা-দিদিদের পর্যন্ত তাঁর সামনে মুখ তুলে কথা বলতে দেখিনি। একদিকে শ্রদ্ধা, আরেকদিকে ভয়—এ-দুয়ের মিশ্রণে তাঁর এবং বাড়ির বাসিন্দাদের মাঝে একটি যে অদৃশ্য পাঁচিল গ'ড়ে উঠেছে, সে-সম্বন্ধে তিনি বিন্দুমাত্রও সচেতন নন। প্রভুত্বের প্রচণ্ড অহমিকার দাপটে, এ-পাঁচিল শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন পাহাড়ের মতো ঢাকা প'ড়ে থাকে। তাঁর অসন্তোষ এবং ক্রোধ—এ দুটি বৃত্তি যাতে চাড়া না-দিয়ে ওঠে, এ-ব্যাপারে সবাই সতর্ক, কারণ তাঁর ক্রোধ যে কখনো সংযমের বাঁধ ছাপিয়ে যাবে না, এমন কথা কে বলতে পারে।

একদিন গ্রীষ্মের ছুটির দুপুরে শ্লেট পেন্সিল নিয়ে, জানলার ধারে ব'সে অঙ্ক কষছি। খড়খড়ির ভেতর দিয়ে রাস্তার নানারকম দৃশ্য দেখতে-দেখতে কখন যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম টেরও পাইনি। হঠাৎ ফস্‌কে গিয়ে আমার হাতের শ্লেটটি জানলার ফাঁক দিয়ে রাস্তায় প'ড়ে যেতেই মুহূর্তের মধ্যে ঠুনকো কাচের গ্লাসের মতো চুরমার হয়ে গেল। বাবা পাশে শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন। আওয়াজ শুনতেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হ'ল ?' এই গর্জনে দরজা-জানলাগুলো ঠকঠক ক'রে উঠল। আমার মুখ থেকে টুঁ শব্দটি বেরুচ্ছে না। আতঙ্কে ঘরের ভেতর সব-কিছু যেন ধোঁয়া-ধোঁয়া হয়ে গেল। কোন বালকের এত দুঃসাহস যে, এমন পিতার সামনে মিথ্যা উচ্চারণ করে। আওয়াজের কারণ জানবার সঙ্গে-সঙ্গেই চোখমুখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়ছে। এমন অবস্থায় সাধারণত বেশি নয়, একটি, বড়ো-জোর দুটি, উষ্ণ বচনই দোষীর পক্ষে যথেষ্ট শাস্তি হ'ত। সেদিন কেন জানি না, এতই রেগে গেলেন যে উঠে গিয়ে আলমারি থেকে চাবুকের মতো সরু বেত বের ক'রে আমার হাতে এবং পিঠে সপাং-সপাং ক'রে বেশ-কয়েক ঘা বসিয়ে দিলেন। এমন পরিস্থিতিতে অনেক মায়েরাই অসহায় সন্তানকে পিতার ক্রোধের কবল থেকে রক্ষা করেন। বাবার অস্বাভাবিক রাগ দেখে মা আমার ধারকাছ দিয়ে ঘেঁষবারও চেষ্টা করলেন না। আপাতদৃষ্টিতে, ঘটনাটি মোটেই অসাধারণ নয়। সেটি মনে রাখবার প্রধান কারণ এই যে, তৎকালীন একটি শ্লেটের দাম ছিল, খুব বেশি হ'লে এক আনা কি দু-আনা। তাঁর অত্যধিক গম্ভীর প্রকৃতির আড়ালে একটি স্নেহশীল পিতা যে লুকিয়েছিল, সে-খবরও আমি মাঝে-মাঝেই পেয়েছি। তাই দোষের তুলনায় দণ্ড বেশি হওয়ায়, আমার অভি-মান, সমুদ্রে ভাসন্ত, একটি বিবাট তুষার স্তূপের মতো, হৃদয়ে জমাট হয়ে রইল।

প্রসন্নকুমারের সঙ্গে স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দেবীর সম্পর্কটা ছিল একেবারেই অসমান। এতে প্রেম কিংবা বন্ধুত্বের কোনো স্থান ছিল না। অন্তত আপাত-দৃষ্টিতে নয়। তা সত্ত্বেও, যেদিন বাইরে রোগী দেখতে যাবার তেমন তাগিদ থাকত না সেদিন, তিনি নিজের মতো ক'রে স্ত্রীকে সঙ্গ দেন।

এমন একটি দিনে প্রসন্নকুমার গুটি-গুটি ক'রে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। উনুনের ওপর মস্ত একটা লোহার কড়াইতে মাছ কিংবা তরকারির ঝোল টগবগ করছে। হেমাঙ্গিনী দেবী একটা পেতলের হাতা দিয়ে সেটিকে নাড়া-চাড়ায় ব্যস্ত। স্বামীর প্রবেশের সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি মাথায় ঘোমটা তুলে দিলেন। প্রসন্নকুমার রান্নার তালিকা জিজ্ঞেস করেন। তার পরের দৃশ্যটি আমার চোখে

বিশেষরকম কৌতুকপ্রদ মনে হ'ল। দৃশ্যটি এইরকম—একটি গুরুগম্ভীর পুরুষ; পরনে তাঁর শীতকালের পোশাক—কলারওয়ালা সেকেলে কোট, ভাঁজ-করা গরদের চাদর, গলার দু-পাশ দিয়ে পিঠের ওপর ঝুলে পড়েছে। কুচোনো 'নয়নসুখ' ধুতির কোঁচাটি মাটিতে লুটোচ্ছে। পায়ে পালিশ-করা বাদামী রঙের পাম্-শু। এই পোশাকে পুরুষটি, বঁটিদায় ব'সে, পাকা গিন্নীর মতো তরকারি কুটছেন।

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর সশ্রদ্ধ ভয় এবং বিস্ময়টাই ছিল বেশি। ছেলেমেয়ে এবং অন্যান্য লোকদের সামনে স্বামীকে তিনি সর্বদাই কর্তা ব'লে সম্বোধন করেন। চালচলনে বস্তুত সবদিক থেকেই স্বামী ছিলেন কর্তা। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'ফিউডাল লর্ড'। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের ব্যবধান কম ক'রে হলেও প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের। শুনেছি, বিয়ের সময় হেমাঙ্গিনী দেবীর বয়স ছিল পনেরো কি ষোলো। সামান্য লেখাপড়া জানা গরিবঘরের গাঁয়ের মেয়ে। একেই তো এত বড়ো পরিবারে বিয়ে। তারপর, প্রায় সমবয়েসী কিংবা বয়োজ্যেষ্ঠ আটটি সৎ-সন্তানের মায়ের ভূমিকা গ্রহণ করা—এই দায়িত্বের গুরুভার পালনে, এত অল্প বয়সের যে-কোনো কুমারীই হকচকিয়ে যাবেন। তাই, মনে-মনে হয়তো কিঞ্চিৎ হীনমন্যতায় ভুগতেন। স্বভাবে তিনি বেশ চাপা ছিলেন। তাছাড়া এমন ডাকসাইটে স্বামীর প্রভাবে কোন্ স্ত্রীই-না সহজে দ'মে যান!

সবেমাত্র বিকেল হয়েছে। লাল-সাদা ডোরাকাটা গামছা প'রে প্রসন্নকুমার পশ্চিমের বারান্দায় রাখা জলচৌকিতে বসেছেন। পাশে এক বাল্‌তি জল। তাতে একটি ছোট্ট পেতলের ঘটি একটি দলচ্যুত কচুরিপানার মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। স্নানের আগে আফিম খাওয়ার মতো আরেকটি নিয়ম, তিনি এ-সময় কঠোরভাবে পালন করেন। তাই এ-প্রহরটি আমি ঘড়ির দিকে না-তাকিয়েই ব'লে দিতে পারি। অর্থাৎ কাঁটায়-কাঁটায় সাড়ে চারটা। সূর্য দূরের বিশাল বেল গাছটার মাথায় একটি সোনার অলংকারের মতো ঝকঝক করছে। মধ্যাহ্ন-ভোজনের কিছুকাল পরেই শরীরের পঞ্চভূতের একটির, অর্থাৎ অম্লের আধিক্যে তিনি এতই অস্থির বোধ করেন যে গলার আঙুল দিয়ে, প্রায় সমস্ত খাবার না বের ক'রে দেয়া পর্যন্ত তিনি স্বস্তি পান না। অথচ এ-অভ্যাসটির ফলে তাঁর কর্মশক্তিতে কোনোই ঘাটতি দেখা যায় না। বরঞ্চ এ-নিয়মটি সেরে, তিনি যেন এক নতুন উদ্যমে বাকি দিনটি কাটান। রোগী দেখার ফাঁকে-ফাঁকে, সমবেত পাড়াপ্রতিবেশীদের আড্ডায় তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

তক্তপোশের ডান ধারে কয়েকটি র‍্যাকে পর-পর কয়েকটি হুঁকো। প্রত্যেক-

টির ডগায়, সাজানো কল্‌কে। সাদা চাদরের পটভূমিকায় এই হুঁকো-ক'টি, আমার চোখে অবিকল এক সারি তালগাছের মতো দেখায়। গোপাল, অথবা কোনো কম্পাউণ্ডার প্রয়োজনমতো হুঁকো ধরিয়ে দেয়। এ-হুঁকোগুলো শ্রেণী এবং বর্ণের ভিত্তিতে চিহ্নিত। প্রথমটি ব্রাহ্মণদের, দ্বিতীয়টি প্রসন্নকুমার এবং তাঁর বিশিষ্ট কয়েকজন সমবয়সীদের। তৃতীয়টি নিম্নবর্ণের লোকদের এবং চতুর্থটি মুসলমানদের। কোন্ অতিথিকে কখন কোন্ হুঁকো দিতে হবে, এ-বিষয়ে সাধারণত তিনি নিজেই নির্দেশ দেন। কখনো-বা রোগীর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে ভুলে যান। এ-রকম সময়ে কম্পাউণ্ডাররা, তাঁকে বিরক্ত না-ক'রে, নিজেদেরই বুদ্ধি-বিবেচনায় অতিথির হাতে হুঁকো তুলে দেয়। ভুলচুক যে হ'ত না এমন কথা বলা যায় না। এবং হ'লে পর তার ফলাফল কী হ'ত সে-কথায় পরে আসছি। যাই হোক, প্রতিদিন হুঁকো ধরাবার সঙ্গে-সঙ্গে নিয়মিত আগন্তুকেরা প্রত্যেকেই তাঁদের পকেট থেকে একটি ক'রে ছোট্ট কাঠের নল বের ক'রে তাঁদের সম্মুখে রাখেন। এ-দৃশ্যটি আমার কাছে অত্যন্ত মজাদার লাগে। মনে হয় বুড়োদের এক্ষুনি তাস কিংবা পাশার মতো হুঁকোর নলের একটা খেলা শুরু হবে! এই চাল দিল ব'লে। তাঁদের মধ্যে একজন, অর্থাৎ সীতানাথ মোক্তার, প্রত্যহ একটি কলাপাতার নল বানিয়ে আনেন। তিনি এটি মুখে লাগাবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার কেন জানি মনে হয় যে, ভেঁপুর মতো এটি বেজে উঠবে। হুঁকোটি নাগরদোলার মতো চক্রাকারে এক হাত থেকে আরেক হাতে ঘুরে বেড়ায়। সে-সময় যে যার নলটি হুঁকোর ফুটোয় পরিয়ে নেন। বৈঠকখানা ঘর থেকে সুগন্ধি তামাকের ধোঁয়া পাকিয়ে উঠে সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। আলাপ-আলোচনার বিষয়বস্তু গতানুগতিক হ'লেও ঘরটি গম্‌গম্ ক'রে ওঠে।

একদিন ঢাকার বিত্তবান্ গন্ধবণিক রূপচাঁদ সাহার কোনো-এক আত্মীয় সূতিকা রোগগ্রস্তা তাঁর স্ত্রীর জন্যে ওষুধ নিতে এসেছেন। প্রসন্নকুমার তাঁর জুনিয়র কম্পাউণ্ডার অক্রূরকে তামাক পরিবেশন করতে বললেন। তারপর, নিবিষ্ট মনে রোগীর ইতিবৃত্তান্ত শুনতে থাকলেন। অক্রূর হুঁকো ধরিয়ে গন্ধ-বণিকের হাতে দিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই প্রসন্নকুমারের চোখের কোণে লাল রঙ দেখা দিল। তিনি তেরছা নজরে অক্রূরের দিকে একবার কট্‌মট্ ক'রে তাকালেন! আরেকবার তাকাতেই দেখা গেল যে তাঁর চোখ পুরোপুরি রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে। ভ্রূযুগল কুঞ্চিত এবং সংযুক্ত হয়ে যেন একটা গিট লেগে গেছে।

অক্রূরের চেহারা দেখে মনে হ'ল যেন তার বুকে ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। ব্রাহ্মণের হুঁকো যে গন্ধবণিকের হাতে চ'লে গিয়েছে, এ-কথা তার বুঝতে আর বাকি রইল না। নিজের ভুল শোধরাবার উদ্দেশ্যে সে তাড়াতাড়ি র‍্যাকের তৃতীয় হুঁকোটি ধরবার চেষ্টা করতেই প্রসন্নকুমার তাঁর ডান হাতের তর্জনীটি উঁচিয়ে ধরলেন। গন্ধবণিক ওষুধ নিয়ে চ'লে গেলে প্রসন্নকুমার অন্দরমহলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। 'কুষ্মাণ্ড!' তাঁর মুখ থেকে তিন স্বরবিশিষ্ট এ-শব্দটি একটি কামানের গোলার মতো শোনাল। ওষুধে-ভরা কাঁচের আলমারিগুলো, এ-শব্দটির সংঘর্ষে ঠুনঠুনিয়ে উঠল। তারপর ধীরে-ধীরে রাস্তার ঘোড়ার গাড়ির চাকার শব্দে মিলিয়ে গেল।

প্রসন্নকুমারের ধারণায়, এতগুলো সন্তান-সন্ততির বিরাট পরিবারের সুষ্ঠু পরিচালনার পক্ষে, সংসারের শীর্ষে তাঁর অস্তিত্বই যথেষ্ট। তাঁর চোখে পরিবার যেন ঘড়ির মতো একটি যন্ত্র—খাওয়া-পরা নামক চাবিটি দিলেই তা ঠিক-ঠিক চলতে থাকবে। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গপ্পোগুজব, পাঁচরকম বিষয়ের আলাপ-আলোচনা, তাদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া, ছেলেমেয়েদের এমন-কি স্ত্রীর সঙ্গে কোনোরকম ঘনিষ্ঠতা দেখানো, এক কথায় একটি অন্তরঙ্গ পারিবারিক সম্পর্ক গ'ড়ে তোলা, তাঁর গরুগম্ভীর মেজাজের খেলাপ ছিল।

সন্ধের রোগী দেখার পালা শেষ ক'রে প্রসন্নকুমার এখন দোতলায় উঠে এসেছেন। পোশাকী জামাকাপড় ছেড়ে, হাতমুখ ধুয়ে, তিনি খাটে বসলেন। হেমাঙ্গিনী দেবী হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করেন। কখনো-কখনো প্রয়োজন হ'লে, হাত-পা টিপে দেন। কর্তার যাবতীয় সেবার জন্যে তিনি এ-সময়টিকে আলাদা ক'রে রাখেন।

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরম। প্রসন্নকুমার গোপালকে ডেকে বললেন, 'গড়গড়ায় কিছু কুচিবরফ আর গোলাপজল মিশিয়ে দে তো।'

এ-রকম একটি সন্ধেবেলায় রাঙাদা অর্থাৎ প্রসন্নকুমারের পঞ্চমপুত্র, একটি মস্ত শীল্ড হাতে ক'রে তাঁর সামনে হাজির হ'ল। বলা বাহুল্য, আমাদের মতো কয়েক-জন কনিষ্ঠদের ছাড়া, জ্যেষ্ঠপুত্রদের সঙ্গে প্রাত্যহিক দেখাসাক্ষাৎ তাঁর কমই হ'ত। লণ্ঠনের আলোয়, কাঠের ঘন কালো বার্নিশের পটভূমিকায়, সদ্য পালিশ-করা রুপোর অলংকরণ থেকে হীরের মতো আলো চম্‌কাচ্ছে। শীল্ডের মাঝখানে দ্রুত-গামী সুপুরুষের হুবহু একটি মূর্তি দেখে আমার চোখ বিস্ফারিত। এই আবছা আলোতে গোটা জিনিসটি জটিল কারুকার্য খচিত একটি মহামূল্যবান্‌ রাজকীয়

সম্পদের মতো দেখাল। দাদার প্রশস্ত বুকের ছাতিটা গর্বে প্রশস্ততর। শীল্ডটি পিতার চোখের সামনে ধ'রে বলল যে, তাদের কলেজের স্পোর্টস প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে সে এ-পুরস্কার পেয়েছে। হুঁকোর টান থামিয়ে তিনি শীল্ডটার দিকে আস্তে ক'রে ঘাড় বাঁকালেন। এক নজর দেখে নিয়ে আবার হুঁকোয় টান দিতে-দিতে বললেন, 'হুঁ। লেখাপড়া ঠিক চলছে তো?' রাঙাদা মাথা নিচু ক'রে শীল্ডটি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

প্রসন্নকুমার মস্ত পাশবালিশটিতে, কনুই চেপে হেলান দিয়ে বসেছেন। হাতে গড়গড়ার নল। পাশেই টুলের ওপর কালো পাথরের গেলাসে মিছরির সরবৎ রাখা আছে। হেমাঙ্গিনী দেবী সেটি এগিয়ে দিলেন। কর্তার মেজাজ বুঝে, এইসময় তিনি সংসারের নানা অভাব-অভিযোগের কথা তাঁর সামনে পেশ করেন। অমুকের বই কিংবা জামাকাপড় কিনতে হবে। তমুকের স্কুল কিংবা কলেজের মাইনে দিতে হবে ইত্যাদি। প্রসন্নকুমার চুপ ক'রে সব শুনে বলেন, 'হুঁ-উ-উ।'

এ-সময়টিতে প্রসন্নকুমার কোনো-কোনো দিন আমাকে এবং আমার অগ্রজকে কাছে ডেকে নেন। পিঠে হাত বুলোতে-বুলোতে আমাদের পড়াতে বসান। এমন দিনেই শুধু তাঁর কাছে আমাদের ছোটোখাটো আব্দার করার সাহস হয়।

এমন দিন দুর্লভ হ'লেও, পিতৃস্নেহের দীপ্তিতে তাঁর মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আমাদের কল্পলোকের পিতার ছবিখানির সঙ্গে তাঁর এ-মুখখানি হুবহু মিলে যায়।

খানিকক্ষণ বাদেই হেমাঙ্গিনী দেবী স্বামীর রাত্রিভোজনের ব্যবস্থা করেন। ছোটো এক বাটি ঘন দুধ এবং ভেজা ন্যাকড়ায়-জড়ানো গোনাগুন্‌তি দুখানা মিহি ময়দার রুটি—এটুকুই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। খাওয়া সারা না-হতেই গোপাল নতুন ক'রে গড়গড়া সেজে রেখে যায়। হুঁকোয় মৃদু টান দিতে-দিতে চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে। মশারি খাটিয়ে দিয়ে হেমাঙ্গিনী দেবী নিজের খাওয়াদাওয়া এবং সংসারের বাকি কাজটুকু সারতে নিচে চ'লে যান।

এখন সকাল প্রায় ন টা। প্রসন্নকুমার যথারীতি রোগীবাড়ি ভিজিটে যাবার সাজ-পোশাক প'রে নিচে নামলেন। পায়রাদের 'আয় আয়' ডাকে, উঠোনে মুঠো-মুঠো ধান ছড়ালেন। পায়রারা দলে-দলে নেমে এসে দানা খেতে থাকে। তারপর, কাকাতুয়াটিকে কয়েকটি ভেজা ছোলা পরিবেশন করলেন।

'বল হরে রাম, হরে কৃষ্ণ' উচ্চারণ করবার সঙ্গে-সঙ্গে, সাদা পাখিটিও পাখা ঝাপ্‌টা দিতে-দিতে এই নামোচ্চারণ করে। পাশের খাঁচায় রাখা টিয়ে শাবকটির

মুখের সামনে কাঁচা লঙ্কা তুলে ধরতেই, শাবকটি সেটিকে টেনে নিল। তার সামনে আরেকটি তুলে ধ'রে মুখে শিস্ দিতে থাকেন। প্রসন্নকুমারের মুখটি তাঁর নিজের নামের মহিমায় ভ'রে ওঠে। শিস্ দিতে দিতে তিনি বৈঠকখানার দিকে এগিয়ে যান।

আমি এবং আমার অগ্রজ, সবেমাত্র পশ্চিমের বারান্দায় আমাদের জলখাবার নিয়ে বসেছি। এমনসময় বৈঠকখানা থেকে প্রচণ্ড এক চিৎকার আমাদের কানে ভেসে এল। আমরা দুই ভাই দৌড়ে সেখানে উপস্থিত হলাম। দেখি একটা জোয়ান ছেলে, তার হাত-পা মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। কোমরে আরেকটি বাঁধ। ছেলেটির খালি গা। সকালের আলোয় তার ন্যাড়া মাথাটি একটি বড়ো কাঁচা বেলের মতো চকচক্ করছে। রক্তঘন বিস্ফারিত চোখ। তার থেকে আগুন ঠিক্‌রে পড়ছে যেন। তার কোমরের দড়িটিকে একটি লোক দু-হাতে টেনে রেখেছে। আর দুটি লোক তার হাত চেপে ধরেছে। লোকটি এই নাগপাশ থেকে মুক্ত হবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এই ধস্তাধস্তির ফলে তার চিকন কালো ঘর্মাক্ত শরীরের মাংসপেশীগুলো নেচে-নেচে উঠছে। সংসারের বিরুদ্ধে, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তার অভিযোগের সীমা নেই। সেই অভিযোগ তার ভারী কণ্ঠে, গালিগালাজের সংমিশ্রণে একটা প্রচণ্ড হট্টগোলের মতো শোনাচ্ছে। ইতিমধ্যে বৈঠকখানার বাইরে, দু-চারজন পথচারীরও ভিড় জমেছে। প্রসন্নকুমার শান্ত, অবিচলিত। হুঁকোটি নামিয়ে রেখে তিনি গোপালকে ডেকে পাঠালেন। ভেতর থেকে এক গেলাস জল এবং কিছু খাবার আনতে আদেশ করলেন। গোপাল ফিরে এলে তিনি নিজেই জল এবং খাবার যুবকটির মুখের সামনে ধরলেন। যুবকটি প্রসন্নকুমারের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল। তারপর তার মুখে, ভোরের আলোর মতোই ক্রমশ একটি হাসির রেখা ফুটে উঠল। প্রসন্নকুমার তার ঠোঁটে খাবার ছোঁয়াতেই যুবক সানন্দে তা মুখের মধ্যে টেনে নিল।

প্রসন্নকুমার যুবকের সঙ্গীদের কাছ থেকে তার অসুস্থতার স্থিতিকাল এবং আরো খুঁটিনাটি জেনে নিয়ে নানারকম ওষুধের ব্যবস্থা করলেন—পাচন, বিশেষ ধরনের নস্যি, মাথা ঠাণ্ডা রাখবার জন্যে তেমনি বিশেষ ধরনের একটি পট্টি, আরো কত-কী! সঙ্গীদের একটি কথা জোর দিয়ে বললেন, রোগী রাতে কোনো কারণেই উত্তেজিত না-হয়, সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে।

এই ঘটনার মাস-তিনেক পরেকার কথা। আমি, আমার অগ্রজ এবং প্রতিবেশী আরো দু-তিনটি ছেলে রোয়াকে ব'সে গল্পোগুজব করছি। এমনসময়

একটি স্বাস্থ্যবান্ এবং সুশ্রী যুবক আমাদের দরজার সামনে হাজির হ'ল। মাথায় একঝাঁক ঢেউ-খেলানো চুল। পরনে সাদা পাঞ্জাবি এবং আসমানী রঙের লুঙ্গি। মুখে সলজ্জ হাসি। হাতে একটি বাজারের থলি। বৈঠকখানায় ঢুকে প্রসন্নকুমারকে লক্ষ ক'রে তক্তপোশে মাথা ছোঁয়াল। 'এটি আমাদেরই পুকুরের'—এই ব'লে থলের ভেতর থেকে একটি রুই মাছ বের ক'রে মেঝেতে রাখল। সেখানে রাখতেই মাছটা একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে উঠল। সকালের আলোয় তার আঁশগুলো চুম্‌কি-বসানো একটি পোশাকের মতো ঝল্‌মলিয়ে উঠল। নিজের পরিচয় এবং কঠিন ব্যাধি থেকে তার সম্পূর্ণ আরোগ্যলাগের কথা বলতেই প্রসন্নকুমার তাকে চিনে ফেললেন। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে ডান হাতটি ওপরের দিকে তুলে বললেন, 'সবই তাঁর ইচ্ছে।' যুবকটিকে দেখে কে বলবে এই সেই দড়িতে-বাঁধা লোকটি।

এখন ভোরবেলা। পুবের একটি জানালা দিয়ে একফালি কমলা রঙের আলো আমার চোখেমুখে পড়তেই আমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখি প্রসন্নকুমার আয়নার সামনে ব'সে চুলে-গোঁফে কলপ দিচ্ছেন। টিকেয় ফুঁ দিতে-দিতে গোপাল গড়-গড়া নিয়ে এল। তিনি গোপালকে বাকি জানালাগুলো খুলে দিতে বললেন। কলপ-দেয়া থামিয়ে তিনি আকাশের দিকে চোখ তুললেন। তাঁকে দেখে মনে হ'ল যে, তিনি জোরে শ্বাস টেনে, এই সকালের হাওয়ায়, কিসের একটা গন্ধ ধর-বার চেষ্টা করছেন। গোপাল, বালতি ক'রে হাতমুখ ধোবার জল বারান্দায় রাখতেই তাকে বললেন, 'দেখে আয় তো নেবু গাছটায় ফুল ফুটেছে কি না।' একটু বাদেই গোপাল একটি ছোট্ট তাজা ফুল হাতে ক'রে ফিরল। চার পাপড়ির ফুলটির রঙ দুধের ফেনার মতো সাদা। তার কেন্দ্রস্থলে খুব হাল্কা বেগুনী রঙের আভাস। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'পুজোর আর ক'দিন বাকি আছে রে।' 'মাকে জিজ্ঞেস ক'রে আসি', এই ব'লে গোপাল নিচে নেমে গেল।

কলপ দেয়া শেষ ক'রে প্রসন্নকুমার বৈঠকখানার দিকে এগিয়ে গেলেন। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে ব'সে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র, প্রফুল্লকুমারকে তলব করলেন। প্রফুল্লকুমারের বয়েস পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে। চার কন্যা এবং দুটি পুত্রের পিতা। প্রসন্ন-কুমারের সামনে হাজির হয়ে মাথা নিচু ক'রে দাঁড়াতেই তাকে পুজোর আয়োজন করতে বললেন এবং এ-ও বললেন যে গত বৎসরের চাইতে এবারের উৎসব যেন আরো ধুমধাম ক'রে করা হয়। প্রফুল্লকুমার 'যে আজ্ঞে' ব'লে ভেতরে চ'লে গেলেন।

শরতের পুবের আকাশটি তামার রঙে আঁকা একটি জলরঙের ছবির মতো দেখাচ্ছে। এমন-এক ভোরে বড়ো-বড়ো গয়নানৌকো ক'রে, প্রসন্নকুমারের নেতৃত্বে আমরা সবাই আমাদের গ্রামের জলপথে রওনা হই। সারি-সারি পালতোলা নৌকোগুলো উত্তুরে বাতাসে শাঁই-শাঁই ক'রে এগিয়ে যায়। যেন কোনো অজানা অভিযানে। শহরের মুক্ত আকাশের তলায় জলে-ভাসার আনন্দ মনকে এক নতুন উচ্ছ্বাসে ভরিয়ে দেয়। বুড়িগঙ্গার ওপারের গ্রামের গাছগুলোর আবছা সবুজ-নীল রেখায় সীমানা টানা। কিছুক্ষণের মধ্যে নদী ছেড়ে আমাদের নৌকো খাল-বিলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যায়। কখনো-বা যায় জলে-ডোবা ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে। আরেকটু এগুতেই কচুরিপানায় ঢাকা জলপথে নৌকাগুলো ঘষা খেয়ে খস-খস আওয়াজ করে। শরীর শিউরে ওঠে। তবু কেন জানি ভালো লাগে। মাদার, জাম, জিওল, জামরুল গাছের ফাঁকে-ফাঁকে সূর্য হঠাৎ-হঠাৎ চমকে ওঠে। একটা লম্বা খাল থেকে বেরিয়ে আবার জলে-ডোবা ধানক্ষেতে পড়তেই দূরে আমাদের পুকুর-পাড়ের গগনচুম্বী অর্জুন গাছটার চূড়া দেখা গেল। সমবেত কণ্ঠে সবাই ব'লে ওঠে, 'এসে গেছি, এসে গেছি।'

প্রসন্নকুমারের পরিচালনায় আমাদের পুজো-বাড়িটা উৎসবমুখর হয়ে উঠতে বিলম্ব হ'ল না।

ঢাকের বোলের সঙ্গে, কাঁসরঘণ্টা শাঁখ আর উলুধ্বনিতে আমাদের বেলতলী গ্রামটা এক সামগ্রিক উত্তেজনায় মেতে উঠল।

দিন শেষ হয়ে সন্ধ্যা নেমে আসে। লাঠি হাতে একটি পুরুষ এসে পুজো-মণ্ডপের মুখোমুখি রাখা একটি চেয়ারে বসলেন। আতরের একটি হাল্কা সুগন্ধ উঠে ধুপের গন্ধকে সুবাসিত ক'রে তুলল। তাঁর পরনে গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি আর কালো কুচোনো ধুতি। কোঁচাটি মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ে জাপানী হাতপাখার মতো দেখাচ্ছে। পুরুষটি চেয়ারে ঈষৎ হেলান দিয়ে গড়গড়ার নলটি মুখের সামনে ধরলেন। চেহারায় এবং ব্যক্তিত্বে এ-লোকটি এতই স্বতন্ত্র যে, সমবেত লোকদের জোড়া-জোড়া চোখ এই কেন্দ্রবিন্দুতে মিলিত হ'ল। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলার উদ্দেশ্যে এগিয়ে এল। ঢাকীরা পিঠে ঢাক বেঁধে নিল। তাদের হাত নিশ্‌পিশ্‌ ক'রে ওঠে। পুরুতমশাই পঞ্চপ্রদীপ হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে উঠতেই ঢাকের ঐকতানে এবং বোলে, বাহিরবাড়িটি একটি নাচঘরের মতো গম্‌গম্‌ ক'রে উঠল। একদিকে ঢাকীদের সঙ্গে ধুনুচি-নর্তকের বেদম প্রতিযোগিতা, অন্যদিকে প্রসন্নকুমারের নির্দেশে তুবড়ি, আতশবাজি, চরকি ইত্যাদির চমকপ্রদ

প্রদর্শনী—সব মিলে বাদ্যকর, নর্তক, দর্শক, এক সাময়িক উন্মাদনায় ক্ষেপে ওঠে। কিছুক্ষণ পরেই প্রসন্নকুমার অন্দরমহলের দিকে এগিয়ে গেলেন।

আজ মহাষ্টমী। পুজোমণ্ডপের সামনে গ্রামবাসীদের মস্ত জমায়েত। প্রসন্ন-কুমার বাহিরবাড়ির বারান্দায় চেয়ারে বসেছেন। পাশেই অনেক ধুতি এবং লুঙ্গি থাক ক'রে রাখা আছে। এ-উৎসবের দিনে তাঁর মিতব্যয়ী স্বভাব ছুটি নিয়ে, উদারতায়, হৃদয়ের একূল-ওকূল ছাপিয়ে যায়। হিন্দু-মুসলমান ভাগ-চাষী এবং প্রজারা তাঁর পায়ের ধুলো নেয়। তিনি সবার হাতে একটি ক'রে ধুতি কিংবা লুঙ্গি এবং পোড়ামাটির থালাবাসন তুলে দেন। কেউ-কেউ তাঁর কাছে অল্পবিস্তর অর্থসাহায্য পেয়েও ধন্য হয়। ছোটোখাটো জমিদারের ভূমিকা পালন ক'রে, প্রসন্নকুমার তাদের ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করেন। সমবেত লোকেরা খুশি হয়ে 'কর্তা'র স্তুতি গাইতে-গাইতে বাড়ি ফিরে যায়।

বিকেলবেলা। প্রসন্নকুমার তাঁর মাতৃদেবীর স্মৃতিমন্দিরটির পাশে এসে বসেছেন। সুমুখে একটি লম্বা খাল। দক্ষিণে একটি পুকুর। খালের ওধারে জলে আধোডোবা বিস্তৃত ধানক্ষেত। দুটি ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে একটি সরু নৌকো লগি ঠেলে শাঁই-শাঁই ক'রে এগিয়ে যায়। পুবের আকাশে শরতের মেঘ-মালার চূড়াগুলো অস্তগামী সূর্যের জাফরানী আলোয় তুষারশৃঙ্গের মতো ঝলমল করে। স্মৃতিমন্দিরের দক্ষিণে মাদার এবং জিওলের কয়েকটি ডাল পুকুরের জলে হেলে পড়েছে। ডালে এবং গুঁড়িতে কয়েকটি ডিঙি-নৌকো বাঁধা। এই নৌকোয় ক'রে আমাদের গ্রামবাসী ছাড়াও অন্য গ্রামের বাসিন্দারা তাদের অসুস্থ ছেলে-মেয়ে এবং আত্মীয়-অনাত্মীয়দের নিয়ে বিনামূল্যে প্রসন্নকুমারের চিকিৎসালাভের আশায়, উপস্থিত হয়েছে। পিলে-বের-করা ম্যালেরিয়া রোগী থেকে হাঁপানী, হৃদ্‌রোগ, আমাশা, ক্ষয়রোগ—কিছুই বাদ নেই। তিনি তাদের নানারকম ফল-মূল-পাতা-ছালের রস, কচি ডাবের কিংবা কাঁচা মুগ ডালের জল, আমলকীর মোরব্বা, পোড়া বেল, আরো কত-কী টোট্‌কা যে খেতে বলেন, তার ইয়ত্তা নেই। দুরারোগ্য রোগীদের ওষুধের ব্যবস্থা তিনি ঢাকায় ফিরে গিয়ে করেন। গত বছরের রোগীদের মধ্যে কেউ-কেউ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকা-শের বাসনায় উপস্থিত। উপহার হিসাবে কারো হাতে একটি কি দুটি অতিকায় লাউ কিংবা কুমড়ো। কারো হাতে-বা এক কাঁদি কলা। উপকারী লোককেই তো সবাই আদর করে। প্রসন্নকুমারের আশ্বাসবাণীতে নিশ্চিন্ত বোধ ক'রে রোগীরা, একে-একে, তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে জলপথে ফিরে যায়।

দিনান্তের রবি আমাদের বাড়ির শেষপ্রান্তের বাঁশঝোপের আড়ালে টুক্ ক'রে লুকিয়ে পড়ে। নানা বর্ণের রশ্মি-ক'টি এই ঝোপের ডগায় লেগে ময়ূরের পালকের মতো দেখায়। আলো-আঁধারের এক অপরূপ মায়ায় আমাদের বৃক্ষ-লতাপূর্ণ বেলতলী গ্রামটি ঘুমন্ত পরীর দেশের মতো এক গভীর রহস্যে ভ'রে ওঠে। প্রসন্নকুমার লাঠি ভর ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। মাতৃমন্দিরের চৌকাঠে মাথা ছুঁইয়ে, ধীরে-ধীরে তিনি পশ্চিম-দালানের দিকে এগিয়ে যান। শরীরটি সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পড়েছে। দূরে বিরাট জামরুল গাছের তলায় অন্ধকারে বৃদ্ধ সুপুরুষের মূর্তিটি ক্রমশ আবছা হয়ে মিলিয়ে যায়।

আমি

দু-খণ্ডে বিভক্ত সেকেলে মস্ত বাড়ি। দেখতে আশেপাশের আর-পাঁচটা বাড়ির মতোই বৈশিষ্ট্যহীন। ছোটো-ছোটো ঘর। সংখ্যায় অনেক। অবিরাম লোক-জনের চলাচল। সিঁড়িতে, বারান্দায়, উঠোনে, কলতলায়—যেখানে যাই-না কেন—একটা ধাক্কাধাক্কি লাগে আর-কী। এই ভিড়-ভাড়াক্কার মধ্যে আমি প্রায়ই হারিয়ে যাই। আমি আছি কি নেই, সে-কথাও অনেকে ভুলে যায়। ভোর হতে-না-হতে গোটা বাড়িটা একটা অসাধারণ কর্মচাঞ্চল্যে জেগে ওঠে। নানারকম আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙে যায়। ইচ্ছে থাকলেও বেশিক্ষণ গড়াগড়ি দেবার উপায় নেই। প্রায় কাক ডাকার সঙ্গে-সঙ্গেই, বিছানা তোলার পাট থেকে নিয়ে, ঘর-ঝাঁট দেওয়া, মোছামুছি শুরু হয়ে যায়। উঠে বারান্দায় এসে দাঁড়াই। নিচে কলতলায় গুচ্ছের বাসনকোসন ছড়ানো—গণ্ডায়-গণ্ডায় থালা-ঘটি-বাটি-গেলাস, কড়াই, হাতা, গামলা, ডেগ্‌চি—আরো যে সংসারের কত টুকিটাকি তার ইয়ত্তা নেই। গোপাল সেগুলো মাজতে বসেছে। এঁটোকাঁটার মধ্যে দেখি রুইমাছের মস্ত একটা শিরদাঁড়ার কাঁটা। তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে সেটি অবিকল একটা হাতির দাঁতের চিরুনির মতো দেখায়। এক পা-দু-পা ক'রে নিচে নেমে আসি।

কলতলার পাশেই নাবার ঘর। সেখানে এক কোণে, বাড়ির মেয়েরা কেউ কাপড় কাচে, কেউ-বা গায়ে জল ঢালে। আমার সামনে তাদের কোনো আব্রু নেই। সকালবেলার মোলায়েম আলো তাদের ভেজা বক্ষস্থলে নেচে-নেচে বেড়ায়। রান্নাঘরের দিকে এগুতেই দেখি বড়োবৌদি একটা কুলোয় চাল ঝাড়তে বসে-ছেন। নিখুঁত লয়, ছন্দ আর ধ্বনিতে, তাঁর হাতে এই কাজটি, বিশেষ ধরনের নৃত্যসংগীতের মতো শোনায়।

আমার দিকে পেছন ফিরে কে-একজন মশলা বাটছেন। মা, মাথা নিচু ক'রে জাঁতিকাটা সুপুরির মতো, সূক্ষ্ম আলুর কাঠি কাটছেন। তাঁর কি আমার দিকে তাকাবার সময় আছে? তিনি তো দিনরাত সংসারের কাজেই ডুবে আছেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি তিনি কাছে নেই। রাতে যখন শুতে যাই তখনো

"নবাবপুরের বড় চৌকিতে সেদিন রাবণবধের পালা চলছিল"—আমি

তিনি কাছে নেই। একদিকে এই বিরাট সংসারের দায়িত্ব, আরেকদিক কর্তার সেবা—কোন্‌দিক তিনি সামলাবেন।

আলোবাতাসের অভাবে আমাদের বাড়ির নিচতলাটা বিশ্রী অন্ধকার হয়ে থাকে। শীতে, গ্রীষ্মে, সর্বদাই একটা সোঁদা গন্ধে ভরা। তারই সঙ্গে রান্নাঘরের ধোঁয়া এবং নানারকম ভাজা-মশলার গন্ধ মিশে মাঝে-মাঝে নিশ্বাস নেয়া দায় হয়ে পড়ে। বর্ষাকালের ভিজে হাওয়ার দরুন ঘরের দেয়ালগুলোর ওপর নানারকম আবছা ছবি ফুটে ওঠে। কখনো অপরিচিত অনেক মুখাবয়ব, কিংবা ভয়ংকর সব অবাস্তব জন্তু-জানোয়ার, কিংবা পেঁজা তুলোর মতো শরতের মেঘমেলা। কখনো-বা রাজপুত্তুর ঘোড়ায় চ'ড়ে, তলোয়ার উঁচিয়ে চ'লে যায় ধুলোর মেঘ ওড়াতে-ওড়াতে। তারই ভেতর দিয়ে, সীমান্তে পাহাড়ের চূড়ায়, নামহীন কেল্লার অস্পষ্ট রেখা উঁকিঝুঁকি মারে। সেই দুরন্ত ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ আমি স্পষ্ট শুনতে পাই। প্রতি বছর দেয়ালির আগে, কিংবা পরে, রাজমিস্ত্রীদের মোটা-মোটা চুনে-ডোবা তুলির পোঁচে এ-ছবিগুলো ঢাকা প'ড়ে যায়। আষাঢ়-শ্রাবণে কোন্‌-এক অদৃশ্য চিত্রকর এসে আবার নতুন সব ছবি আঁকে। ছুটির দিনের অলস দুপুরে নানা আজব ছবি আমার চোখে ধরা দেয়। রহস্যময় ঘোমটা-দেয়া এই জগৎটা আমাকে এক রূপকথার রাজ্যের জানান দেয়। আমার কল্পনা, পায়রার ডানা পেয়ে শাঁই-শাঁই ক'রে আকাশের দিকে ছুটে যায়। উত্তেজনা ও গর্বে আমার বুকের ছাতি ফুলে ওঠে; পরদিন সেগুলো আর খুঁজে পাব না, এই আশঙ্কায়, পোড়া কাঠকয়লা কিংবা পেন্সিল দিয়ে তার বহিঃরেখা স্পষ্ট ক'রে এঁকে দিই। কী চমৎকারই-না কাটে অফুরন্ত অবসরের এই দুপুরগুলো।

আমার বয়েস এখন আট কিংবা নয়। নিজের এবং বৈমাত্র ভাইবোনদের উপস্থিতি ছাড়া, আত্মীয়-স্বজনের অনবরত আসা-যাওয়া এবং বিয়ে-থা লেগেই আছে। এ-রকম সময়ে, আমাদের বাড়িটা, অবিকল আজকালকার ভাড়াটে বিয়েবাড়ির রূপ নেয়। স্বাভাবিক সময়েও দু-বেলা প্রায় ষাট-সত্তর জন লোকের পাত্ পড়ে। দুপুরে কিংবা রাত্তিরে, নিচে নামতেই দেখি, অন্ধকার খাবার ঘর ছাড়াও, আশেপাশে, সর্বত্র সারি-সারি কাঁসার থালা, জলে-ভরা গেলাসের ওপর ভর ক'রে আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, ঘন সবুজ পুকুরের জলে, সোনালী পদ্ম-পাতা চিকমিক্ করছে। এ-দৃশ্যটি আমার চোখে এতই ভালো লাগে যে, যতক্ষণ-না খাবার ডাক পড়ে, ততক্ষণ এ-জায়গাটিতে ঘুর-ঘুর করি। একদল পুরুষের

খাওয়া শেষ না-হতেই, চট্‌পট্‌ থালা-গেলাস মেজে নিয়ে, আরেকদলের পাত্‌ পড়ে। ঠিক যেন স্টীমারঘাটের একটি হোটেল।

এইমাত্র অক্রূর বাজার ক'রে ফিরেছে। প্রতিদিনের মতো মেয়েরা বাজার দেখার উদ্দেশ্যে ছুটে এল। তার থলিতে নানারকম তরিতরকারি। হুবহু মুগুরের মতো দেখতে একটি আস্ত লাউ। পুঁইশাকের আঁটিটা সাপের মতো কুণ্ডুলি পাকিয়ে আছে। দুটো মোচা আরো কত-কী। ঘন তামার রঙের মোচার গায়ে মাখনী রঙের ফুলগুলো মেয়েদের খোঁপায় কনকচাঁপার মতো দেখায়। এক আঁটি কচু-শাকের পাশে, অর্ধবৃত্তাকারে চালকুমড়োর ফালিটা যেন শুক্লপক্ষের একাদশীর চাঁদ। আর ঐ-যে থোড়ের টুকরোটা! অচেতন অবস্থায় অনেকেই তো সেটিকে হাতির দাঁত ব'লে ভুল করতে পারে। মেয়েরা অধৈর্য হয়ে বলে, মাছ কই, মাছ কই? অক্রূর কিছু না-ব'লে মশলাপাতি, এবং আরো টুকিটাকি বের করে। মুখে দুষ্টুমি-ভরা হাসি।

সবশেষে তার থলি থেকে বেরুলো একজোড়া ধলেশ্বরীর ইলিশ। রুপোলী মাছদুটি মেঝেতে রাখতেই আমার দিদি এবং ভাইঝিদের মধ্যে, মাছকাটা নিয়ে রীতিমতো কাড়াকাড়ি লেগে যায়। তাঁদের মধ্যে এই ছুতোনাতা নিয়ে অনবরত রেষারেষি লেগেই থাকে। মজার ব্যাপার এই যে, যেদিন অক্রূর সরপুঁটি, ফলি, ট্যাংরা কিংবা মৌরলা আনে, সেদিন এই কুমারীদের হাজার ডাকাডাকি ক'রেও, সাড়া পাওয়া দায়।

এখন বেলা প্রায় নটা। একটা ঘোড়ার গাড়ি আমাদের বৈঠকখানার সমুখে অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছে। বাবা যথারীতি রোগীবাড়ি ভিজিটে যাবার উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছেন। আমি এবং আমার অগ্রজ মেঝেতে পড়তে বসেছি। আতরে-ভেজা তুলো কানে গুঁজতে-গুঁজতে তিনি আমাদের বলেন, 'চট্‌পট্‌ জামাকাপড় প'রে নাও। আমার সঙ্গে যাবে।' এই ব'লে তিনি বৈঠক-খানার দিকে নেমে যান। আমাদের প্রতি তাঁর এই পিতৃসুলভ স্নেহের প্রকাশ মাসে দু-মাসে একবার দেখা যায়। তাড়াতাড়ি পাট-করা হাফ্‌ প্যাণ্ট সার্ট আর জুতো-মোজা প'রে নিই। এমন দিনে আনন্দে, পুলকে, এক অনিশ্চয়তার রহস্যে আমার মন নেচে ওঠে। বাড়িতে খেলার সাথীর অভাব না-হ'লেও অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে বাড়ির এবং ছোটো পাঠশালার দেয়ালের সীমায় বদ্ধ, এই ক্ষুদ্র জগৎ থেকে সাময়িক মুক্তি পাবার উত্তেজনায় আমার হৃদয় ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে। এই

উত্তেজনায় এবং সর্বগ্রাসী এক কৌতূহলের মিশ্রণে, ঘোড়ার গাড়ির, একবার এদিকের আরেকবার ওদিকের জানালায় মুখ বাড়িয়ে কত-কী যে দেখি।

গাড়ি-ঘোড়া এবং লোকজনের বেজায় ভিড়। তারই মধ্যে থেকে কে-একজন বাবাকে সেলাম করে। নানারকম আওয়াজ, হাজার রকম নক্সাকাটা ঘুড়ির দোকান। হাতে-বোনা লুঙ্গি-শাড়ির দোকান। এই দোকানগুলোতে যেন রঙের হাট লেগেছে। যেন কোনো ওস্তাদ শিল্পী কখনো সরু কখনো মোটা তুলি, সারি-সারি রঙের বালতিতে ডুবিয়ে, তাঁর সব নিষিদ্ধ প্রবৃত্তির বাঁধ ভেঙে, রঙের পোঁচ মেরেছেন। তারপর তেলেভাজা বেগুনি পেঁয়াজি, বাখরখানি, পরোটার গন্ধের সঙ্গে মোগলাই রান্নার জাফরানী সুগন্ধ নাকে যেতেই জিভে জল আসে। খাবার ভঙ্গিতে আমার চোয়াল অজান্তে নড়তে থাকে।

জাপানী খেলনা আর নানা রঙের বেলুন-বলের দোকান। কাবুল থেকে আমদানী করা বেদানা আর আঙুরের দোকান। সূক্ষ্ম-সুগন্ধি আতরের দোকান। নৌকোঘাট থেকে দৌড়ে-আসা কুলিদের মাথায় নানা সাইজের, নানা রঙের আমের ঝুড়ি। সোনারুপোর গয়নাগাটির দোকান। আর ঐ-যে, নবাববাড়ির ফটকের একটু পরেই যাত্রা-থিয়েটারের পোশাকের দোকান! সেখানে কী যে নেই! রাজা-রাজড়া, নবাব-বাদশাহের-মখমলের জোব্বা। সোনারুপোর জরির নক্সায় সেগুলো কী জম্‌কালোই-না দেখায়। তাদের মধ্যে একটি কালো রঙের জোব্বা যেন ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে। সেটি কি সাহজাহানের? ঢাল-তলোয়ার, তীর-ধনুক, নানারকমের টুপি, পাগড়ি, মুকুট, চামর, বিশ্বামিত্রের দাড়ি আর উষ্ণীষ—না কি নারদের? পর-পর সাজানো। এত বড়ো গোঁফজোড়াই বা কার? ভীম না কুম্ভকর্ণের? পাশেই যে শ্মশানকালীর মতো এলোচুল। এটি তো সূর্পণখার মাথায়ই শোভা পায়। তারপরই বাদামী রঙের শিবের জটা, বাঘের ছাল, আর ত্রিশূল। এটাই কি তাঁর তাণ্ডব নৃত্যের বেশ? নিচের সারিতে মেয়েদের নানারকম জামাকাপড়। এমন-কি কোনো কৃশতনু যুবতীর বক্ষস্থল।

রাবণের দশানন দেখে বুকের ভেতরটা বেশ-একটু ঢিপ্‌ঢিপ্‌ ক'রে ওঠে। কী ভয়ংকর তার রুদ্র মূর্তি। পুলোমা, তাড়কা, বকাসুরের মুখোশগুলো চোখে পড়তেই আমি চোখ বুজে ফেলি, যদি ঘুমের ঘোরে তারা আবার দেখা দেয়। এ-দোকানগুলোতে লোকজনের কী ভিড়!

আরেকটু এগুতেই কালাচাঁদ সাহার বিখ্যাত মেঠাই-মণ্ডার দোকান। তাছাড়া, কালীমন্দির, গির্জে, মসজিদ—এ-সবের ছবি বায়োস্কোপের মতো, একের

পর এক, চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যায়। মাঝে-মাঝে দ্রুত বিলীয়মান দৃশ্য-গুলো অস্পষ্ট হয়ে যায় দেখে মনে হয় বাড়ি থেকে কত দূরে চ'লে এসেছি।

দু-তিনটি রোগীবাড়ি ভিজিটের পর বাবা কোচোয়ানকে নবাববাড়ির দিকে গাড়ি ঘোরাতে বলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা এই বাড়ির বিশাল ফটকটি পার হই। বিস্তৃত সবুজ মাঠের এক প্রান্তে, পোড়ামাটি রঙের ছোটো-ছোটো মিনার-গম্বুজওয়ালা একটি অট্টালিকা। তার ওপাশেই, নিচে, বুড়িগঙ্গা নদী চিক্‌চিক্‌ করে। পাট-চুন-বালিবাহী পালতোলা নৌকো জাহাজের মতো ঢেউ তুলে উজানে এগিয়ে যায়। স্বচ্ছ নীল আকাশের তলায় এ-দৃশ্যটি, সূক্ষ্ম তুলিতে আঁকা একটি কিষানগড় ঘরানার ছবির মতো লাগে।

সেখানে পৌঁছুতেই দেখি চারদিকে নোকর-চাকর, বন্দুকধারী সেপাই-সামন্ত, ঘোড়ার আস্তাবল, ত্রেপলের হুড্‌-দেয়া ফোর্ড গাড়ি, আরো কত লোকজন। তাদের মধ্যে একজন আমাদের দোতলায় অন্দরমহলে নিয়ে আসে। মস্ত-মস্ত খিলান—থাম-ওয়ালা ঘর, নানারকম ফুল-লতা-পাতার নক্সায় ঘেরা। দরজার ওপর রেশমী পাড়-দেয়া খুব সরু চিকের পর্দা। তার ভেতর দিয়ে আবছা লোকজনের চলাচল অত্যন্ত রহস্যময় দেখায়। নোকরানি আদাব জানিয়ে চিক্‌ তুলে ধরতেই, থিয়েটারের মতো, অসাধারণ জাঁকালো এক দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হ'ল। দৃশ্যটি আমার কল্পনালোকের বিলাসময় নবাবী জগতের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়।

রুহিতনের আকারের, রঙবেরঙের, কাঁচ-বসানো দরজা আর জানালা। তার ভেতর দিয়ে রামধনুর মোলায়েম আলোয় সমস্ত ঘরটি উদ্‌ভাসিত। সেই রঙে রঞ্জিত মস্ত ঝাড়লণ্ঠনটির স্ফটিকগুলো নানাবর্ণের তারার মতো ঝিকমিক করে। পায়ের তলায় জটিল নক্সাকাটা, মখমলের মতো নরম গালিচা। দুধের রঙের দেয়াল, উঁচু-নিচু সোনার লতাপাতায় অলংকৃত। গিলটি-করা মস্ত খাট, যেন চারটি ফুলদানির ওপর ভর ক'রে আছে। খাটের ওপর হাল্কা গোলাপী রঙের, মস্‌লিনের মতো ফিন্‌ফিনে, ভাঁজ-করা মশারি, একটি চাঁদোয়ার মতো ঝুলছে। ডানদিকে মোষকালো গোল মার্বেলের টেবিল। তার ওপর সূক্ষ্ম খোদাই-করা রুপোর গড়গড়া। তারই পাশে আরেকটি টেবিলে পানদান, রুপোর গেলাস, আতরদান আর চমৎকার একটি তামা এবং পেতলের হাত-ওয়ালা গাড়ু। তার গায়ে কী উৎকৃষ্ট মানেরই-না কারিগরি! গাড়ুর সংলগ্ন একটি শ্বেতপাথরের বাটি। তাতে কয়েকটি গোলাপের পাপড়ি ভাসছে। সাদার ওপর সাদার কী বাহার! খাটের তলায় মস্ত পিক্‌দান এবং জরির কাজ-করা চটি। আমার দৃষ্টি

ঘরের কোণে যেতেই সেঁটে গেল। দেখি সেখানে নানা রঙের মাঞ্জায় ভরা লক্ষ্ণৌই লাটাই আর চীনে কাগজের ঘুড়ি। সেগুলো ছোঁয়ার এবং পাবার লোভে আমার মন অশান্ত হয়ে ওঠে, হাত নিশ্‌পিশ্‌ করে। ঘুড়ি ওড়ানোয় নবাব-সাহেবের নেশা এবং ওস্তাদির কথা ঢাকা শহরে কে-না জানে।

অর্ধশায়িত অবস্থায় নবাব মখমলে-মোড়া, বিশাল তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আছেন। নবাব-বাদশাহদেরই এমন চেহারা হয় বটে। বেদানার মতো গোলাপী গায়ের রঙ। নীল টানা চোখ আর কটা চুল। হাতে আতরে-ভেজা রেশমী রুমাল। সেটি মাঝে-মাঝে নাকের ডগায় তুলে ধরছেন। তার সুবাস ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর শরীরটি একটি দামী কাশ্মীরী শালে ঢাকা। জ্বর হয়েছে কি? ঐ অবস্থায়ই ডান হাতটি ঈষৎ তুলে তিনি বাবাকে সশ্রদ্ধ আদাব জানালেন। চোখ বুজে বাবা নবাবসাহেবের নাড়ী পরীক্ষায় মনোনিবেশ করলেন। তারপর ডান হাতটি ছেড়ে, বাঁ হাতটি টিপে ধরলেন। আমার চোখ একবার নবাবের, আরেকবার ঘুড়ি-লাটাইটার ওপর ঘোরাফেরা করে। এমনসময় অন্দরমহলের চিক্ সরিয়ে অল্পবয়েসী একটি ফুটফুটে মেয়ে, রঙবেরঙের প্রজাপতির চালে, কামরায় ঢুকল। পরনে রেশমী সালোয়ার, কামিজ, মাথায় ওড়না। হাতে একটি রেকাবী। তার ওপর তিনটি কাঁচের গেলাস। আমাদের সামনে এসে, প্রথমে নবাবসাহেবকে, তারপর, আমাদের আদাব জানিয়ে চোস্ত উর্দুতে বলল, 'ফল্‌সে কি সরবৎ! নোশ্‌ ফরমাইয়ে।' নবাবসাহেবের ভ্রূ-দুটি বাঁকিয়ে উঠল। তিনি ঈষৎ তিরস্কারের স্বরে হুকুম করলেন, 'চাঁদিকা গ্লাসমে লে আও!' 'জো হুকুম!' ব'লে মেয়েটি অন্দরমহলে ফিরে গিয়ে, ক্যাওড়ার খোশ্‌বোদার, ফলসার সরবৎ রুপোর গেলাসে ঢেলে আনল।

নবাববাড়ির নিখুঁত আদব-কায়দা নিয়ে ঢাকা শহরে, নানারকম খোশগপ্পো প্রচলিত আছে। শুনেছি বর্তমান নবাবের প্রপিতামহ নাকি এ-ব্যাপারে নোকর-চাকরদের বিশেষরকম তালিম দিয়েছিলেন, যে-তালিম ঢাকা শহরের অনেক বিত্তবান্ লোকেরাই আদব-কায়দার চরম নিদর্শন ব'লে মেনে নিয়েছিলেন।

একদিন বৃদ্ধ নবাব যথারীতি খানাপিনায় বসেছেন। নবাবের আনাভি-লম্বিত সাদা দাড়ি। ইস্পাহানি মালাই কোরমার সঙ্গে বোগ্‌দাদি বিরিয়ানি খাবার বেলায় নবাবের দাড়ির জঙ্গলে অকস্মাৎ কয়েকটি ভাত ঝুলে থাকতে দেখা গেল। তারপর আরো কয়েকটি। এইবারে তাঁর শ্মশ্রুগুচ্ছ ক্রমশই একটি ভাতের মৌচাকের মতো হয়ে উঠল। নবাবের সেদিকে কোনোই খেয়াল নেই ব'লে

সদ্য-নিযুক্ত এক নোকর নবাবসাহেবকে খুশি করার উদ্দেশ্যে অতি উৎসাহে ব'লে ওঠে, 'হুজুর, আপকা দাড়িমে চাউল লটক রহা হ্যায়।' সেই শুনে বৃদ্ধ নবাব তেলেবেগুনে জ্ব'লে উঠলেন। এত বড়ো আস্পর্ধা। নোকরকে গালিগালাজ করতে-করতে বলেন, 'বে-বেয়াকুফ। বত্‌তমিজ! জাহিল, জঙ্গলী কাঁহিকা! খবরদার! আয়েন্দা ইস্ কিসিমকা বাত কিয়া তো মু তোড় দেগা!' নোকর ভয়ে জড়সড়। তার মনে হ'ল এই-বুঝি সে বরখাস্ত হয়। সঠিক কী বলা উচিত ছিল, সে-ব্যাপারে, নবাবসাহেব খানাপিনা থামিয়ে তক্ষুণি তাকে তালিম দিতে শুরু করলেন। যদি ভবিষ্যতে কোনো অতিথির সামনে বেয়াদপি ক'রে বসে। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে সরাসরি কিছু না-ব'লে, সে-কথাটি ঘুরিয়ে, চোস্ত্ উর্দুতে, রূপকের অলংকরণে বলতে হবে যে, 'হুজুর, শাখেমে গুল্, আউর হ্যায় দো বুলবুল।' নবাবের হুকুমে হতভাগা নোকরকে এটি একশোবার কান ধ'রে ওঠ-বোসের সঙ্গে পুনরাবৃত্তি করতে হ'ল।

বৃদ্ধ কবিরাজ মশাইয়ের সামনে বেগমসাহাজাদীরা স্বভাবতই পর্দানশিন্ হবার প্রয়োজন মনে করেন না। মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের ফিকে মেয়েদের দেখার পর, এই মেয়েদের কীরকম অবাস্তব মনে হয়। এই অসাধারণ রূপসীদের ছবি তেলরঙে আঁকা বত্তিচেল্লির 'ভেনাস'-এর মতো আমার হৃদয়ের চিত্রশালায় আজও ঝুলছে। এ-যে সব রূপকথার মানুষ। রক্তমাংসে গড়া মানুষ কি এতই সুন্দর হয়। এ কি মানুষ, না ফুল। না কি কোনো ফুলের বাগিচা। এমন-কোনো বাগিচার দিকে তাকিয়েই কি মির্জা গালিব লিখেছেন, তমাশা গুলশন, তমান্না-এ চিদন—অর্থাৎ ফুলবাগিচার রূপ দেখতে চাই, আবার ফুল তুলতেও চাই। কী কোমল কৃশতনু। গণ্ড যেন সদ্য-পারা রৌদ্রচুম্বিত কোনো বেহস্তের আপেল। দেহের বহিঃরেখা যেন কালবৈশাখীর বিদ্যুতের মতো, শুধুই বক্ররেখার নির্যাস—থেকে-থেকে ঝিলিক মারে। সপ্তসিন্ধুর উত্তাল ঢেউয়ের মতো কেবল উত্থান আর পতন। দেহের রঙও সিন্ধুর ফেনার মতোই ধবধবে। সুর্মায়-ঘেরা তাদের হাল্কা রঙের চোখগুলো যেন রাতের আকাশে নক্ষত্রের নীল ফুল। ত্বক যেমনই মসৃণ তেমনই আঁটসাঁট। সব মিলে নিখুঁত সুরে বাঁধা আটো-তারের একটি বাদ্যযন্ত্র। হাত দিলেই ঝন্‌ঝনিয়ে উঠবে! বিকল্প কত উপমাই তো মনে আসে—ওস্তাদ কারিগরের হাতে বারুদে ঠাসা সদ্য-তৈরি তুবড়ি। এটাই-বা মন্দ কী। দেশলাইয়ের কাঠি ছোঁয়ালেই হয়। শোঁ-শোঁ ক'রে কতরকম রুপোলী

তারা—রুনুকি-ঝিল্লি ছড়াতে-ছড়াতে, আকাশে উঠে মেঘের গায়ে ঠেকবে। নিম্ন-গামী হয়ে কত পিয়াসী তরুণের হৃদয়ে আগুন ধরিয়ে দেবে।

এই পরীরা আমাদের দু-ভাইকে, অনেকরকম জিনিস টুকরি বোঝাই ক'রে উপহার দেন। তুলোর গদিতে সাজানো কাবুলি আঙুর। এই গদিতে সেগুলো মহামূল্যবান্ রত্নের মতো দেখায়। তাছাড়া বেদানা, মনাক্কা, কিশমিশ, আখ-রোট বাদাম পেস্তায় ঢাকা গাজরের হালুয়া। আরো কত-কী। পরবর্তীকালে, কখনো-কখনো আবার মাঞ্জা-দেওয়া, সুতোয় ভরা লাটাই, আর খোদ নবাব-সাহেবের জন্যে তৈরি বিশেষ নক্সার ঘুড়িও পেয়েছি। ঝুড়ির জিনিসের তুলনায় এগুলোই আমাদের মন বেশি জয় করে।

নবাববাড়ির রূপকথার এই জগৎ থেকে বেরিয়ে আমাদের ঘোড়ার গাড়ি ডানদিকে ঘুরে যায় কোতোয়ালির দিকে। অল্পক্ষণের মধ্যেই গাড়িটা এই থানার বাঁ পাশের সরু রাস্তাটিতে প্রবেশ করে। অপরিচিত নানারকম আওয়াজ কানে ভেসে আসে—ঠক্ঠক্, খুট্খাট্, খ-অ-অ-স, খ-অ-অ-স। আরো যে কত-রকমের শব্দ আর গন্ধ তার হিসেব কে করে। কী আজব দুনিয়া! এমনটি ভূভারতে আর কি কোথাও আছে? বাড়িগুলো যেমনই সরু, তেমনই লম্বা; প্রস্থে খুব বেশি হ'লেও চার কিংবা পাঁচ ফুট। উচ্চতায় তিন থেকে পাঁচ-ছ-তলা। গায়ে-গায়ে এমনই সাঁটা যে দেখলে মনে হয় কোনো অতিকায় এক দানবের হাতের প্রচণ্ড চাপে বাড়িগুলো চেপ্টে গিয়ে এই অদ্ভুত আকার ধারণ করেছে। খিলান-ওয়ালা, কিংবা চৌকো পায়রার খোপের মতো ছোটো-ছোটো জানালা এবং জালি। তারই চারপাশে নানারকম মুসলমানী নক্সা। দরজাগুলো নিতান্তই সংকীর্ণ। বড়োজোর একটি রোগা-পট্কা লোক তার ভেতর দিয়ে সহজে পার হতে পারে। বাড়ির ভেতরটা এমনই অন্ধকার যে, রোদ-বাতাসের সম্পর্কে আসা যেন ঘোরতর অপরাধ। এই অন্ধকূপের মধ্যে মানুষ কী ক'রে থাকে। তা সত্ত্বেও এ-বাড়িগুলোর স্থাপত্যসংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্য দেখে তাক্ লেগে যায়। বাড়ির বাসিন্দারা ততোধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

প্রত্যেক বাড়ির সুমুখের বারান্দায় এবং ঘরে নানা বয়সের কর্মব্যস্ত লোক। তাদের খালি গা। হাতে অর্ধচন্দ্রাকার লোহার তৈরি মস্ত একটি অস্ত্র। দেখলেই মেরুদণ্ডটা সিরসির ক'রে ওঠে। তার নিচের দিকটা তলোয়ারের মতো ধারালো। রাস্তার প্রতিক্ষিপ্ত আলোয়, সেটি থেকে-থেকেই চমক্ দিয়ে ওঠে।

প্রাপ্তবয়সে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি-আবিষ্কৃত, এ-ধরনের একটি অস্ত্রের নক্সা

দেখে আঁতকে উঠেছিলাম। তফাৎ এইটুকু যে, এটি ছিল যন্ত্রচালিত। জোড়া-জোড়া ঘোড়ায় টানা একটি রথ। তার পেছন দিকে ইস্পাতের অর্ধচন্দ্রাকার ফলা—চক্রাকারে সমান্তরালভাবে সাজানো। দেখতে অবিকল, শায়িত মস্ত একটি টেবিল-ফ্যানের মতো। তার তলায় দাঁতওয়ালা আরেকটি খাড়া চক্র। ঘোড়ার গতির সঙ্গে-সঙ্গেই এই ফলাগুলো এমন বেগে ঘুরতে থাকে যে, নাগালের মধ্যে যা-কিছু আসবে, ফলার এক কোপেই সেটি খণ্ড-খণ্ড হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে।

লোকগুলো তাদের দু-পায়ের পাতার মাঝে শ্যাওলা রঙের একটি কঠিন বস্তুকে চেপে ধরেছে। এই ভয়ংকর অস্ত্রটির সাহায্যে সেটিকে কাটছে। তাদের হাত-দুটি ঢেউয়ের ছন্দে একবার উঠছে আর নামছে। দৃশ্যটি যেমনই অদ্ভুত, তেমনি আকর্ষণীয়। আমি কিছুতেই চোখ সরাতে পারছি না। বাবাকে জিজ্ঞেস করতেই সংক্ষেপে তিনি বলেন, 'শাঁখ কেটে শাঁখা তৈরি করছে।' কেউ-কেউ কাটা-শাঁখকে পাথরে ঘ'ষে পালিশ করছে। আবার কেউ-বা ঘষছে গোটা একটি শাঁখ। শাঁখের বিশুদ্ধ এবং পবিত্র সাদা বর্ণটি যে শ্যাওলার মতো একটি বিশ্রী প্রলেপে ঢাকা থাকে, বাবার কাছে এ রহস্যটি শুনে আমার বিস্ময়ের সীমা নেই। তাদের মধ্যে দু-একজন চোখে চশমা এঁটে, সোনার বালার মতোই, সেগুলোকে নানারকম সূক্ষ্ম কারিগরিতে ভরিয়ে দিচ্ছে। শাঁখ কাটার এ-দৃশ্যটি আমার মনে এমনই দাগ কেটেছিল যে, পরবর্তীকালে, তার দু-একটা ছবিও এঁকেছিলাম।

পরদিন সকালে উঠে দেখি এক তাজ্জব ব্যাপার। রাতারাতি কোথা থেকে হারমোনিয়ম ও গানের মাস্টার হাজির হয়েছেন। ব্যাপার কী, সেটি তদারকের উদ্দেশ্যে দক্ষিণের দালানে গেলাম। হারমোনিয়মের ওপর গানের ময়লা খাতা। 'শেফালি তোমার আঁচলখানি, বিছাও শারদ প্রাতে', এই কলিটির সুর ধরার জন্যে ছোড়দি আপ্রাণ চেষ্টা করছে। মাস্টারমশাইয়ের ভাবখানা অবিকল ওস্তাদ মুসলমান গাইয়েদের মতো। মুখে পান, সামনে পানের ডিব্বা। মাঝে-মাঝে, একটু কেশে গলা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে, এক কান চেপে ধ'রে, গানের কলিটি বার-বার গাইছেন। অন্য হাতে সেই সুরের পর্দাগুলো টিপে ধ'রে দিদিকে চিনিয়ে দিচ্ছেন। চোখে গুরুসুলভ কিঞ্চিৎ বিরক্তির ছাপ। যাই হোক, এই ক'রে তিনি মাস-খানেকের মধ্যেই দিদিকে বেশ-কয়েকখানা গান শিখিয়ে দিলেন। মজার ব্যাপার এই যে, এইসব গান, দিদি বেসুরো গেয়েও, বিয়ের পরীক্ষায় দিব্যি অনার্স নিয়ে পাস ক'রে গেল। হারমোনিয়ম এবং গানের মাস্টারও, সেইসঙ্গে উধাও।

"শাঁখ কেটে শাঁখা তৈরী হচ্ছে"—আমি

সংগীতকলার সঙ্গে আমাদের পরিবারের সম্পর্কটা ছিল এ-পর্যন্তই। ললিতকলার সঙ্গে সম্পর্কটাও একইরকমের। বৈঠকখানার ঘরে ঝুলে-ঢাকা, দেবদেবীর বাঁধানো কয়েকখানা ছবি, আর উৎকট রঙ-করা কয়েকটা বাস্তবধর্মী বড়ো পুতুল। অথচ, সে-সময়ে ঢাকা, তথা পূর্ববঙ্গের, লোকশিল্প আঙ্গিকে রঙে-নক্সায় ছিল যেমনই সমৃদ্ধ তেমনই প্রাণবন্ত। সে-কথায় পরে আসছি।

এখন দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পাট চুকে গেছে। কর্মচঞ্চল, জনবহুল, আমাদের বাড়িটা এইসময়ে, দিনের বেলায় ভূত-পেত্নির রাজ্যের মতো, কিছুক্ষণের জন্যে একেবারে নিঝুম হয়ে পড়ে। আমাদের চোখে একটুকুও ঘুম নেই। গল্পের বই পড়ার এক অদমনীয় বাসনা আমাকে পেয়ে বসল। সারা বাড়ি তন্নতন্ন ক'রে খুঁজেও একখানা বই, এমন-কি রামায়ণ-মহাভারতও খুঁজে পেলাম না। চিকিৎসা-সংক্রান্ত বাবার কয়েকখানা ছেঁড়া পাতার বই আর খাতা, আর তেমনি জীর্ণ লক্ষ্মীর পাঁচালি আর পঞ্জিকা—বইয়ের সংগ্রহ বলতে এই মাত্র। এক কথায়, বিয়ে-থা, কিংবা কোনো পুজো-পার্বণ ছাড়া, সেন-পরিবারে দৈনন্দিন জীবনের ধারা একঘেয়েমির জাঁতাকলে পিষে হয়ে উঠেছিল নিতান্তই নীরস এবং ধূসর। এই ধূসরতা আমাকে মাঝে-মাঝে অস্থির ক'রে তোলে। মন উশ্‌খুশ্‌ করে, হাত নিশ্‌পিশ্‌ করে।

এমন অবস্থায় একদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম। আমাদের বাড়ির কয়েকশো গজের মধ্যেই বাবুরবাজার। হাঁটতে-হাঁটতে সেখানে গিয়ে পৌঁছই। সারি-সারি মুসলমানী খাবারের দোকান। ঘি, গরম মসলা, পেঁয়াজ-রসুন এবং হিং-এর গন্ধে সন্ধেবেলার হাওয়াটা মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। বড়ো-বড়ো লোহার পরাতে কালেজা-কা সালন, শামি আর শিক্ কাবাব, মাটন্ কাটলেট আর রোস্ট্, পরোটা, রুমালী রোটি, ফুরকা, ভাত, আরো কত কী। সালনের রঙটি দেখে মনে হয় যে, লাল লঙ্কার নির্যাসের একমাত্র উপকরণে এই খাবারটি তৈরি। এই থালার সারির শেষটিতে, জাফরানী রঙের রগরগে ঝোলে মাখা বড়ো-বড়ো চাঁপ। তারই পাশে একটি ধিমিধিমি আঁচের কাঠ-কয়লার উনুন। তার ওপর একটি লোহার ডেগচিতে, হলদে আর গাঢ় গোলাপী, চিকন ভাতের বিরিয়ানি। তার থেকে গরম ভাপ হাল্কা ধোঁয়ার মতো কুণ্ডুলি পাকিয়ে উঠে আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করল। এই জাঁকালো দৃশ্যটি আমার চক্ষু এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে অস্বাভাবিক-রকম সজাগ ক'রে তুলল। রসনেন্দ্রিয়ও ক্ষেপে উঠল ততোধিক। আমার চোখ ডেগচি এবং জাফরান রঙের পরাতটির ওপর সেঁটে গেল। আমার দশা তখন

বাঘের কবলে হরিণ শাবকের মতো। এমন অবস্থায় যা অবশ্যম্ভাবী তাই ঘটল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমিও এই প্রচণ্ড লোভের শিকার হলাম।

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসি। একটা কৌটোতে, মা-র রাখা একটি অচল দু আনি অনেকদিন ধ'রেই দেখি। চুপি-চুপি সেটিকে তুলে নিই। দ্রুতবেগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে, আমাদের পাড়ার মসজিদের সামনে হাজির হই। সেখানে, প্রত্যহই, একটি অন্ধ ভিখিরি, হাঁটু ভাঁজ ক'রে বসে। দেখতে অবিকল একটি দরবেশের মতো। সিমাইয়া রঙের তাব চুল এবং দাড়ি। খোলা হাত-দুটি প্রার্থনার ভঙ্গিতে বুকের সঙ্গে সংযুক্ত। পাশে একটি বাঁশের লাঠি। আকাশের দিকে মুখ তুলে বলে, 'এক প্যায়সা ইস্ আন্ধাকো দেওগে তো, মালিক তুম্‌কো লাখ্ দেগা।' সামনে একটি টিনের কৌটো। সেটির ভেতর পাইপয়সা আধ-পয়সা, এক পয়সা এবং কয়েকটি এক আনি প'ড়ে আছে। কৌটোর অন্ধকার গহ্বরে এই পয়সাগুলো, টাঁকশালের সদ্য-তৈরি মুদ্রার মতো ঝকঝক করে। সন্ধের স্তিমিত আলোয় বাড়িঘর লোকজন, ছায়ার মতো আবছা দেখায়। এক-হাত উঁচু থেকে অচল দু-আনিটা আমি কৌটোর ভেতর ফেলি। সঙ্গে-সঙ্গে খঞ্জনি এবং একতারার মতো সমবেত একটি ধ্বনি কৌটোর ভেতর থেকে সরল রেখায় উঠে এল। বৃদ্ধ অন্ধটি, খোদার কাছে, আমার এবং সন্তান-সন্ততির মঙ্গল ভিক্ষে করল। আমি এদিক-ওদিক তাকিয়ে কৌটোটি থেকে আলতো ক'রে দু-তিনটি এক আনি তুলে নিয়ে, এক দৌড়ে বাবুরবাজারের দোকানটির সামনে হাজির হলাম। এই বাদশাহী খাবার লোভে মানুষ কী-না করতে পারে। দোকানটিতে ঢুকে আমি আকণ্ঠ সেই খাবার খেলাম। আঃ। কী অপার্থিব, কী অবর্ণনীয় স্বাদ। রসনার কী অসাধারণ তৃপ্তি। এই একক অভিজ্ঞতাটি ভবিষ্যৎ জীবনে, আমার মনে এমনই এক গভীর ছাপ ফেলে যে, আজ পর্যন্তও তা মুছে ফেলতে পারিনি।

শ্রাবণের একটি রৌদ্রচুম্বিত বিকেলবেলা। যেদিকেই তাকাই-না কেন— রাস্তা-ঘাটে, ছাদে-কার্নিশে, বারান্দায়-রোয়াকে, দরজায়-জানালায়, গাছে-ল্যাম্প-পোস্টে—সর্বত্রই কালো-কালো বিন্দু। এক কথায় কালো বিন্দুর এক মহাসমুদ্র। গোটা ঢাকা শহর এক অস্বাভাবিক উত্তেজনায় আর উন্মাদনায় মেতে উঠেছে। আজ জন্মাষ্টমীর মিছিল বেরুবে। এমন জাঁকালো, এমন বিশালকায় এবং অসাধারণ চমৎকারিত্বপূর্ণ একটি ঘটনা, এই উপমহাদেশে আর কোথাও কি দেখা যায়। যে জাদুকরি হাত জগদ্‌বিখ্যাত মসলিন কাপড়ের স্রষ্টা, এই মিছিল সে-

হাতেরই এক আশ্চর্য কারিগরির যোগফল যেন। দু-দিন ধ'রে এই বিন্যাসপূর্ণ, সাত-রঙা মিছিল, ক্রমাগত পরিবর্তনশীল, অতিকায় একটি নক্‌সিকাঁথার মতো চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যায়। ঠিক যেন একটি ক্যালিডোস্কোপের ভেতর দিয়ে দেখছি। সক্রিয় অংশীদাররা হিন্দু হ'লেও, আক্ষরিকভাবে এ-মিছিল সর্বজনীন।

অপরাহ্নের সূর্য পশ্চিমের আকাশে হেলে পড়েছে। ধুলোর চিকের ভেতর দিয়ে দূরে, কালো পাহাড়ের মতো আবছা একটি পুঞ্জিত ছায়া দেখা যায়। তাই দেখে, কালো বিন্দুর সমুদ্রে উত্তেজনার মস্ত ঢেউ ওঠে। এই পাহাড়টি ভিড় ঠেলে কচ্ছপের চালে এগিয়ে আসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এই আবছা মূর্তিটা জাঁকজমক পোশাকে সজ্জিত একটি বাস্তব হাতিতে রূপান্তরিত হয়। 'আসছে, ঐ আসছে'—সহস্র কণ্ঠের এই আওয়াজ, বাবুরবাজারের দিক থেকে, আকাশে উঠে, একটি শব্দতরঙ্গের মতো আমাদের দিকে ভেসে আসে। কী উন্মাদনা! কী ঠেলাঠেলি! যতদূর চোখ যায়, শুধু রঙ আর রঙ থাকে-থাকে সাজানো। আক্ষরিকভাবে রঙের গাঙে যেন জোয়ার আসছে। হাতির পেছনেই কী অপরূপ এক দৃশ্য—গ্যালারির পর গ্যালারি। উচ্চতায় পঁচিশ থেকে ত্রিশ ফুট। বহুযুক্ত-গোরুর গাড়ির ওপর বসানো। এ-গাড়িগুলোকে টানছে জোড়া-জোড়া বলদ। এই গ্যালারির মাঝখানে একটি মঞ্চ। তার গর্ভগৃহে, খাঁটি সোনা কিংবা রুপোর চৌকি কিংবা সিংহাসন। সেখানে বৈষ্ণব দেবদেবীর মূর্তি। তার সামনে পৌরাণিক কাহিনীর মূকাভিনয় অথবা ভক্তিমূলক নাচ-গান চলে। কখনো-বা নিছক খ্যাম্‌টা নাচ। কী অসাধারণ এক জমজমাট ব্যাপার। অনেকটা প্রতিমার চালার আকারে, দু-পাশ দিয়ে উঠেছে কাঠ কিংবা বাঁশের কাঠামো। তাতে নানা নক্সার রাংতা আর শোলার অলংকরণ। এই কাঠামোর একের-পর-এক, নিশ্চল পুতুলের মতো, নানাভাবের, নানা জ্যান্ত মূর্তি, মেয়েদের পোশাকে। জরি, পুঁতি এবং চুম্‌কির কাজে, এবং কারবাইডের আলোর মালায়, এই পোশাকগুলো এমনই ঝলমল করে যে, চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

গ্যালারির সারি পার হবার পরই, ঢেউয়ের পর ঢেউ-এর মতো, নৃত্যরত সঙ-এর দল আসে। তাদের মুখে কবিগান, কীর্তন, বিদ্রূপাত্মক সামাজিক ছড়া, জাতীয়তাবাদী গান। হাতে খঞ্জনি আর করতাল। বাদ্য এবং কণ্ঠসংগীতের কী নিখুঁত ঐক্য। মনে হয় একটিমাত্র কণ্ঠ, একটিমাত্র বাদ্যের ধ্বনি। তারপরেই, রাজপুত বীরের বেশভূষায়, তলোয়ার উঁচিয়ে আসে অশ্বারোহীর দল। তাদের

দু-পাশে সারি-সারি রঙের ঝলমল নিশান, অতিকায় মখমলের ছত্র, পাখা, চামর, বর্শা, আরো কত-কী। সঙ্গে আছে ঢাক-ঢোল-নাকারা-শিঙা, এমন-কি ব্যাণ্ড-পার্টিও। সামরিক সংগীতের গম্‌গমে শব্দচাঞ্চল্যে আকাশ-বাতাস ভ'রে ওঠে। যেন কয়েকশো পাখোয়াজ একইসঙ্গে, একই বোলে বেজে উঠেছে। তারপর, আরো সঙ, আরো ঘোড়া, আরো হাতি, আরো গ্যালারি—এক অন্তহীন, সচল, সাড়ম্বর, অদৃশ্যপূর্ব প্রদর্শনী।

একবার, এই মিছিল, আমাদের পাড়ার মসজিদের সামনে দিয়ে যাবার সময় শত-শত মুসলমান, লাঠিসোঁটা, ইটপাটকেল হাতে নিয়ে এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে হাজার-হাজার লোক—দ্রুতগামী গাড়ির তলায় চাপা পড়ার ভয়ে মুরগীছানা যেমন দিক্‌বিদিক্‌-জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটে—ঠিক তেমনি ক'রে পালাতে থাকে। সে-পাড়ার অনেক হিন্দুই জখম হল অথচ মুসলমান-প্রধান পাড়ায় থেকেও, গোনাগুন্‌তি, আমরা কয়েকটি হিন্দুপরিবারের গায়ে, একটি সামান্য আঁচড়ও পড়ল না। বলা বাহুল্য, এই দাঙ্গা লাগাবার প্রস্তুতি আগে থেকেই করা হয়েছিল, সরকারি প্ররোচনায়। যতদিন-না স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল, ততদিন পর্যন্ত, মুসলমান পাড়াপড়শীরা দুধ-চাল-তেল-নুন থেকে নিয়ে বেঁচে থাকার যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস জোগাড় ক'রে দিল। কৈশোরের আমার এই একক অভিজ্ঞতাটি মানুষকে ভালোবাসতে এবং বিশ্বাস করতে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে।

দু-দিনব্যাপী মিছিলের পর জন্মাষ্টমী উৎসবের আরেকটি অত্যাশ্চর্য আকর্ষণ নবাবপুরের 'বড়ো-চৌকি'। মিছিলের মতো এটিও আরেক অসাধারণ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা।

সৌন্দর্যপিপাসু মানুষের সৃজনীশক্তির কি কোনো ঠিক-ঠিকানা আছে। যেমনি নক্সার ভার, তেমনি অলংকরণ, আর তেমনি অনুপাত-জ্ঞান। হিন্দু-মুসলমানী নক্সার কী অপূর্ব সমন্বয়। আর রঙের তো রীতিমতো দাঙ্গা লেগেছে। আগাগোড়া রাংতা, রঙীন কাগজ এবং কাপড় দিয়ে মোড়া। তার ওপর সোনা-রুপোর ছড়াছড়ি। নবাবপুরের সাবেকী ছাতা-পড়া বাড়িগুলো এবং রাতের কৃষ্ণবর্ণ আকাশের পটভূমিকায় চৌকিটি, নানা রঙের আলোর ঝলকানিতে, এক পরীর রাজ্যের মতো ডগমগিয়ে উঠেছে। চৌকির মাঝামাঝি উচ্চতায় দ্বিগুণ পূর্ণাবয়ব পুতুলখেলার মাধ্যমে, মহাভারত, রামায়ণ এবং অন্যান্য পালা রাতের পর রাত চলে। এইসব পুতুলের গঠন-গাঠন, আঙ্গিক, রঙ, হাত-পা-মাথা

ইত্যাদি নাড়াবার ভঙ্গি—এক কথায় তাবৎ নান্দনিক বিচার এবং সংযম দেখে, অজ্ঞাত, অশ্রুতকীর্তি শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধায়, আপনা-আপনিই মাথা নুয়ে পড়ে।

এই চৌকিতে আজ রাবণবধ পর্ব চলেছে। সে কী ভয়ানক দৃশ্য! যেমনি রাম-লক্ষ্মণের হাত-পা এবং মুখের ক্ষিপ্র গতি এবং মারাত্মক সব অস্ত্র নিক্ষেপ, তেমনি রাবণ তাঁর বিরাট খড়্গ, দ্রুত চালিয়ে, চারপাশের হাওয়াটাকে খণ্ড-খণ্ড ক'রে ফেলে। তার হাতের চকচকে এই অস্ত্রটির থেকে ঝটিকাক্ষুব্ধ মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুতের আলো-জিহ্বা লকলক করে। সেই আগুনে রাম-লক্ষ্মণ পুড়ে ছাই হয়ে যায় আর-কী! তাই দেখে আমার চোখের পলক থেমে যায়, বুক ধড়-ফড় ক'রে ওঠে। সব মিলে এক অদৃশ্যপূর্ব, অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। তাই তো, আজ এতকাল পরেও তার ছাপ, আমার মনে, গতকালের ঘটনার মতোই উজ্জ্বল হয়ে আছে। এতটুকুও ম্লান হয়নি।

জন্মাষ্টমী মিছিলের উত্তেজনা শেষ হতে-না-হতেই, আরেক নতুন উত্তেজনা আর অস্থিরতা আমাকে পেয়ে বসে। গত বৎসরের পুজোর দিনগুলোর অনুভূত আনন্দের অস্পষ্টস্মৃতি, ভবিষ্যতের নানা রঙের আশায় আমার মনকে ভরিয়ে দেয়। এক খুশির জোয়ার আসে। আমাদের বেলতলী গ্রামে পৌঁছতেই এই খুশি এক অফুরন্ত আনন্দে রূপায়িত হয়ে আমার মনের পাত্রটি উপচিয়ে পড়ে। এ-নিত্যলোক সত্যিই কী রসময়! কী মধুর! কী মুক্ত জীবন!

চারদিক জল—খাল, বিল, আর পুকুর। তারই মাঝে নানারকম অসংখ্য গাছ-পালা এবং লতায় ঘেরা বাড়িগুলো একেকটি দ্বীপের মতো দেখায়। কতরকম পাখি, কতরকম ফুল, কতরকম উগ্রমধুর সৌরভ! রূপসী বাংলার কী সম্মোহনী, সুকুমারী, সীমন্তিনী রূপ। সৃষ্টিকর্তা যেন আমাদের বেলতলী গ্রামের বেলায় উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগতের তাবৎ সমৃদ্ধির ভাণ্ডারকে উজাড় ক'রে দিয়েছেন।

একদিন সারা দুপুর নৌকো ক'রে খাল-বিলের মধ্যে ভেসে বেড়িয়ে এসে ঘাটে ডিঙিটা বেঁধে গলুইয়ের ওপর নিজেকে এলিয়ে দিলাম। ঘন বাঁশঝোপের তলায় ছায়াশীতল এ-জায়গাটি টাঙ যুগের চমৎকার একটি চীনে ছবির মতো লাগে। মাথার ওপরে বাঁশপাতাগুচ্ছের ভেতর দিয়ে সূর্যের প্রখর রশ্মিগুলো তারাবাতির মতো আলো ছড়ায়। চোখ ধাঁধিয়ে যায়। তাই উপুড় হয়ে শুই।

জলের ওপর আলোছায়ার জটিল এক নক্সা। গলুইয়ের তলায় এক চিলতে শান্ত স্বচ্ছ জলটুকুতে চোখ পড়তেই আমি প্রকৃতির অপার বিস্ময়ের মুখোমুখি হলাম। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মেনডেল তাঁর অণুবীক্ষণের ভেতর দিয়ে, এক ফোঁটা

জলে, অসংখ্য ক্ষুদ্র জীবনের অস্তিত্ব দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। আমার অবস্থা তাঁর চাইতে কম কিসের? শত-শত জীবাণু, জলচর পোকা, ঝাঁকে-ঝাঁকে মোরলা, ট্যাংরা, খুদে পুঁটি, বাঁশপাতা মাছ, কুচোচিংড়ি, বাম্‌, খুদে পোনা—আরো যে কত-কী তার ইয়ত্তা নেই। কী ভিড়। কী ঠেলাঠেলি আর মারামারি! জল ছেড়ে আমার চোখ ডাঙায় পড়তেই দেখি সেখানেও ঐ একই ছবি। মাত্র এক বর্গগজ প্রমাণ জমিতে কত-কী যে পিলপিল করে। কেঁচো, ক্যাড়া, শ্যামাপোকা, কাঠপিঁপড়ে, খুদে পিঁপড়ে, নালশো পিঁপড়ে, শামুক, নেউলে পোকা, গঙ্গাফড়িং, শুঁয়োপোকা, এমন-কি গুই সাপের বাচ্চা। প্রাণের কী অন্তহীন প্রাচুর্য। সৃষ্টির কী জটিল নক্সা।

এ-সব কথা ভাবছি, এমনসময় আমাদের পুরুতমশাইয়ের রান্নাঘরের দিক থেকে এক বিরাট চিৎকার ভেসে এল। দৌড়ে সেখানে উপস্থিত হলাম। আরো অনেকেই ছুটে এল। ঘরের দরজার পাশেই একটি থাম। তার গোড়ায় একটা ছোট্ট গর্ত। পুরুতমশাই চৌকাঠ পেরোতেই ঘন কাজলের মতো কুচকুচে, চকচকে একটা কালকেউটের বাচ্চা বেরিয়ে ফণা তুলে ধরে। থেকে-থেকেই ফোঁস-ফোঁস ক'রে উঠছে। এক বিঘত সাপটার কী সাংঘাতিক তেজ। কী হিংস্র তার চেহারা। ফণাটাকে এক অবিরাম ছন্দে দোলাচ্ছে। তার শরীরে বিদ্যুতের মতো যে-তরঙ্গ বইছে, তার শোভাই-বা কম কিসের।

আমাদের খুড়তুতো ভাইরা বেলতলী গ্রামেই থাকে। তাদের হাবভাব দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। তাদের চোখে কেউটে যেন একটি কেঁচোরই সামিল। তারা নিশ্চিত যে এই গর্তে আরো একটা-দুটো নয়, কয়েকগণ্ডা, সাপ-শাবক লুকিয়ে আছে। তাদের মধ্যে একজন চটপট খানিকটা চিনির শিরা বানিয়ে এনে গর্তে ঢেলে দেয়। অল্পকালের মধ্যেই ছোটো-বড়ো লাল পিঁপড়েরা, এক অবিশ্রান্ত অবিরাম সামরিক বাহিনীর মতো, দলে-দলে এই গর্তে ঢুকতে থাকে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ঘরের ভিতরে-বাইরে একটা ফাটল দেখা গেল। খুড়তুতো ভাইদের মতে, কালো সরীসৃপগুলোর, পিঁপড়েদের কামড় থেকে বাঁচার এটাই একমাত্র পালাবার পথ। তারা লাঠি হাতে সে-জায়গাটিতে, সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়াল। উপস্থিত সকলের মুখেই এক গভীর উৎকণ্ঠা আর প্রত্যাশার ছাপ। প্রতীক্ষমাণ জোড়া-জোড়া চোখ ঐ ফাটলের ওপর কেন্দ্রীভূত। বেশ খানিকক্ষণ এইভাবে কাটল। হঠাৎ ফাটলের ভেতর দিয়ে কয়েকটা বিষ পিঁপড়ে উঁকিঝুঁকি মেরে, এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে, আবার ফাটলের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

খুড়তুতো ভাইরা অসাধারণ উত্তেজিত। বলল, এগুলো স্কাউট, এগুলো স্কাউট। ময়দান ফাঁকা কিনা, দেখে গেল। এইবার কালাচাঁদ বেরুবে। ভাইদের এই অবিশ্বাস্য আত্মপ্রত্যয় দেখে আমাদের চোখ ছানাবড়া। তাদের এই কথা-ক'টি শেষ হতে-না-হতেই চায়ের চামচের মতো চ্যাপটা একটি মাথা ফাটলের মুখে দেখা দিল। আরেকটু বেরুতেই দেখা গেল, তার সারা গায়ে বিষ পিঁপড়ে জোঁকের মতো, লেপ্টে আছে। দূর থেকে ঠিক একটা কালো ফিতেব গায়ে লাল রেশমী সুতোর নক্সার মতো দেখাচ্ছে। বিষ পিঁপড়েরা যে কী মারাত্মক হয়, এবং ম'রে গেলেও যে কামড় ছাড়ে না, এই অবিসংবাদিত সত্যটি নিজের চোখে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলাম। কেউটে শাবকটা হাজার-হাজার পিঁপড়ের দংশনে এবং অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছে। এইটুকু সময়ের মধ্যেই লাল বিন্দুর মতো এই ক্ষুদ্র প্রাণীগুলো সাপটার এমনই হাল করেছে যে, ফাটল থেকে পুরো শরীরটাকে বের করবার মতো শক্তিটুকুও আর অবশিষ্ট রাখেনি। এমন অবস্থায় তার মাথায় লাঠির একটি বাড়ি পড়তেই কালো ফিতের মতো বস্তুটি মাটিতে নেতিয়ে পড়ল। এইভাবে একের-পর-এক. মোট ছাপান্নটি খুদে কেউটে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ভাইদের লাঠির শিকার হ'ল।

সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে। পুজোমণ্ডপের সামনে স্ত্রী-পুরুষ, ছোটো ছেলেমেয়েদের ভিড় জমেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢাকীদের সমবেত বোলের সঙ্গে, কাঁসর-ঘণ্টা, তুবড়ি, আতশবাজি, বোমা ইত্যাদির চমকপ্রদ প্রদর্শনী মিলে সমস্ত পুজো-বাড়িটা এক সামগ্রিক উত্তেজনায় মেতে উঠেছে। সারাদিনের নানারকম উত্তেজনা এবং সন্ধেবেলাব এই হৈ-হল্লা. এ-দুয়ের প্রভাবে নিদ্রায় আমার চোখের পাতায় জগদ্দল নেমে আসে। আমি আরতির মাঝেই, পশ্চিমের দালানে গিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ি। ভয়ে আমাব ঘুম আসে না কারণ, বাড়ির সবাই পুজোমণ্ডপে। তাছাড়া আমার এই শোবার জায়গাটি, মণ্ডপ থেকে, অন্তত তিনশো গজ দূরে। আমি একা চোখ বুজে প'ড়ে আছি, এমনসময় আমার মশারির তলায় কে এসে জায়গা নিল। ঘরের কোণে রাখা লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেল যে আমার পার্শ্ববর্তিনী ভরাযৌবনা এক নিকট আত্মীয়া। কয়েক মিনিট পর আমার এক দাদাও তাঁর পাশে ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে শুয়ে পড়ল। তারপর খসখসানি, চুড়ি-বালার ঠুনঠুনানি, ঝুনঝুনানি। তাঁদের সমবেত ঘন-ঘন গরম নিশ্বাস-প্রশ্বাসে, কার্তিকের গুমট রাত্রিটি ছোট্ট মশারিটির ভেতর অসহ্য হয়ে উঠল। আরো নানা অপরিচিত আওয়াজ কানে এল। ঘরের বাইরেই হঠাৎ ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক, আস্তে-আস্তে

বাড়তে থাকল। অল্পক্ষণের মধ্যেই এই ডাক এমন সরব হয়ে উঠল যে, কানে তালা লাগে আর-কী ; বিনা কারণে হঠাৎ আবার থেমে গেল। তারপর, কখন যে আমি গভীর নিদ্রায় অচেতন হয়ে পড়েছিলাম টেরও পায়নি।

আমাদের বেলতলী গ্রামের বাড়িতে শুধু শোবার জন্যেই তিনখানা পাকা দালান। দু'টি দালানের মাঝে প্রশস্ত উঠোন। সন্ধের পর যেখানেই যাই-না-কেন —সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে, খাটে, মেঝেতে, শুধু বিছানা আর মশারির জঙ্গল। বয়োজ্যেষ্ঠ এবং বিবাহিত কয়েকজন ছাড়া শোবার কারো তেমন-কোনো নির্ধারিত জায়গা নেই, সবাই খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে যে যেখানে পারে, শুয়ে পড়ে।

এই জায়গা-বদলের পালায় একদিন আমি ঐ ভরাযৌবনা আত্মীয়াটির পাশে স্থান পেলাম। মাঝ রাত্তিরে তিনি আস্তে ক'রে, আমাকে ঠেলে জাগিয়ে তুললেন। আমার কানে ফিসফিসিয়ে বললেন যে, তাঁকে মেয়েদের বিশেষ জায়গাটিতে যেতে হবে এবং প্রহরী হিসেবে আমাকে সঙ্গে যেতে হবে। অনুরোধটি নিতান্তই স্বাভাবিক কারণ এই জায়গাটির চারদিকে বাঁশ এবং চালতা গাছের ঘন ঝোপ। দিনেদুপুরেও সেখানে তক্ষক আর হুতোম পেঁচার ডাক শোনা যায়। তাছাড়া এ-জায়গাটির সঙ্গে ভূতপ্রেতের নানা কাহিনীও জড়িত আছে। প্রায় নিরাবরণ হয়ে, আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে আত্মীয়াটি হাঁটু ভাঁজ ক'রে বসলেন। আমলকী বনে, বসন্তের হাওয়ার মতো, একটানা একটি ধ্বনি। কর্ণেন্দ্রিয়তে সেটি পৌঁছতেই আমার শরীরে, এক অজানা রোমাঞ্চের তরঙ্গ বইতে থাকে। সমস্ত স্নায়ুকেন্দ্র সিরসির ক'রে উঠে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। পা শিথিল হয়ে আসে। আমার হাতের লণ্ঠনটির আলোয়, তাঁর দেহের অনাবৃত: নিটোল, মসৃণ অংশটি, চমৎকার একটি তানপুরার খোলের মত চকচক ক'রে উঠল। বাঁশ-চালতা বনের নিস্তব্ধতা, মধ্যপ্রহরের জমাট অন্ধকার, একটানা ঝিল্লিরব এবং লণ্ঠনের স্তিমিত আলো—সব-কিছু মিলে, আমার চোখের সামনের দৃশ্যটি এমনই এক নাটকীয় রূপ নিল যে স্ত্রী-অঙ্গের, বিভিন্ন অংশ, ইতিপূর্বে, আকস্মিকভাবে চোখে পড়লেও, এই অবিস্মরণীয় প্রহরটিতে, বেশ নজর দিয়ে দেখতে বাধ্য হলাম। তানপুরা। তা দেখতেও যেমন সুশ্রী শুনতেও তেমনি মধুর।

আজ কোজাগরী পূর্ণিমা। পুকুরপাড়। সন্ধেবেলায় আমি প্রায়ই এখানটায় বসি। মাছের ঘাই শুনি। লক্ষ্মীর পাঁচালী পাঠের একটানা সুরের মাঝে-মাঝে বিশুদ্ধ গাওয়া ঘিতে লুচি আর বেগুন ভাজার সুগন্ধ ভেসে আসে। উত্তর-পুব

কোণে বিশাল অর্জুন গাছটার ছায়া, পুকুরের জলে এমনভাবে পড়েছে যে, গাছটার কোথায় শুরু আর কোথায় যে শেষ তা বোঝা দায়। এই ছায়ার পশ্চাৎপটে অতি হাল্কা একটি রূপালী আভা খুব ধীরে-ধীরে ফুটে উঠতেই, এই পুঞ্জিত, তরল ছায়া, পুকুরের চকৃচকে জলে চীনে শিল্পীর মস্ত একটি তুলির আঁচড়ের মতো দেখাল। মনে হয়, অল্পক্ষণের মধ্যেই চন্দ্রোদয় হবে, এমনসময়, আমার সমবয়েসী ভাগ্নে পচা এসে আমাকে হাত ধ'রে সোজা নৌকোর ঘাটে টেনে নিয়ে গেল।

ডিঙি ক'রে আমরা একটু-একটু ক'রে, জলে আধোডোবা ধানক্ষেতের দিকে এগিয়ে যাই। সঙ্গে আমাদের প্রজা মধুসূদন ভাটিয়ালও আছে। সে দোতারাটি সুরে বাঁধে। দূরে বাঁশঝোপের ভেতর দিয়ে পুকুরপাড়ে, লণ্ঠনের আলোয় ঘোমটা-পরা এক বৌকে বাসন মাজতে দেখা যায়। তারই কাছাকাছি কোথা থেকে সমবেত উলুধ্বনি ধোঁয়ার মতো উঠে জামরুল-জিয়লের পাতার মধ্যে হারিয়ে যায়। দক্ষিণ পাড়ার কামাখ্যা সেনদের তুলসীমঞ্চের সাঁঝের প্রদীপটি এখনো টিপটিপ ক'রে জলে। চারদিক সুনসান্। হঠাৎ দূর থেকে কানে সন্সন্ আওয়াজ ভেসে আসে। আকাশের দিকে তাকাতেই দেখি, নক্ষত্রের চাঁদোয়ার তলায়, এক ঝাঁক পাখি, হয়তো-বা হাঁস, একটি সরলরেখার আকারে, দক্ষিণ দিগন্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের ডানায় কোজাগরীর হাল্কা সোনার রঙের ছোঁয়াচ লেগেছে। তাই দেখে মধুসূদন গান ধরে। গানটির যথোচিত নির্বাচনে সবাই সমস্বরে ব'লে ওঠে, বাঃ! বাঃ!

'সোনালী রঙের পক্ষীখানি,
ক্যাম্‌নে উইর‍্যা যায়।
যাও যদি পূবালী দ্যাশে,
কইও বন্ধুর কাছে,
দুঃখের নিশি ঝইর‍্যা যায়।
সোনালী রঙের পক্ষীখানি
ক্যাম্‌নে উইর‍্যা যায়।'

আকাশ থেকে চোখ নামাতেই এক অপূর্ব, অপার্থিব দৃশ্যের মুখোমুখি হলাম। জলে আধোডোবা বিস্তৃত, নরম ধানক্ষেত। শিশিরসিক্ত ধানের শীষগুলো চিক্-চিক্ ক'রে ওঠে। যেন একটি সূক্ষ্ম, দামী রেশমী চাদর বিছানো। জলের ওপর ঘন ছাই-নীল-সবুজ রঙের ধানক্ষেতের প্রতিচ্ছায়া। এই প্রশস্ত, সমান্তরাল, ছকের

ওপর, আকাশজোড়া একটি তামা-সোনা-রুপো-পারদ মিশ্রিত বৃত্ত। প্রাপ্তবয়সে, দেশবিদেশে কত চন্দ্রোদয়ই তো দেখেছি। সবই যেন পুষ্পরাজ ম্যাগনোলিয়ার কাছে, নেহাত একটি টগর ফুল। রূপসী বাংলার এ বিশিষ্ট ছবিটি মনে এলে, আজও আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তোলে। আমাকে নিয়ে যায় অনেক দূরে, অনাবিল এক সৌন্দর্যের জগতে, যেখানে জীবন খুলে দেয় হাজার খুশির দুয়ার।

আগুন

সেদিন ছিল ৺বিজয়া দশমী। বিকেল না-হতেই আমাদের বেলতলী গ্রামের সব মেয়েরা, আমার বৌদি-বোনেরা, ভাইঝি-ভগ্নীরা—সবাই এসে জমা হয়েছে আমাদের পুজোমণ্ডপে, মা দুর্গাকে বরণ করতে। তাদের মধ্যে আমার মা-ও ছিলেন। অনেকেরই গায়ে চওড়া লালপেড়ে ধবধবে সাদা শাড়ি। পাড়ের পাশে চকমকে জরির কাজ লালের বাহার যেন আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। নিচে সাদা-লালের খেলা বড়োই চমৎকার দেখাচ্ছিল। ওপরে সোনালী-হলদে রঙ মাখা অর্ধেক মুখ জুড়ে, শ্বেতপদ্মের পাপড়ির মতো, দেবীর ডাগর চোখের মণি যেন দুটি কালো কোহিনুর। আমার দৃষ্টি ওখানে যেতেই কয়েক মুহূর্তের জন্যে থেমে গেল। বৌদের কপালে লাল করমচার মতো মস্ত বড়ো-বড়ো তাজা লাল সিঁদুরের ফোঁটা। পায়ে তেমনই লাল আলতা। পাড়টা দিয়ে মাথার খানিকটা ঢেকে মুখের দু-পাশ দিয়ে নামিয়ে দিয়েছে। চাবির গুচ্ছ বাঁধা আঁচল গলায় জড়িয়ে দেওয়ায়, পাড় মুখের বহিঃরেখার সঙ্গে সেঁটে গিয়েছে। কুমারী মেয়েদের কালো জামরঙের মোলায়েম চুল পিঠের ওপর লুটিয়ে প'ড়ে কটিদেশের শ্রী আরো ফুটিয়ে তুলেছে। রঙবেরঙের জামা পরা কিশোরীদের ঘন কাজল দিয়ে ঘেরা চোখগুলো বরণের প্রদীপশিখার প্রক্ষিপ্ত আলোকে স্ফটিকের মতো ঝকঝক করছে, আর ঝকমক করছে বৌদের নাকের মুক্তাবসানো নথ, আর ছোট্ট হীরেগুলো। বাঙালী স্ত্রী-কান্তির দুই অনুপম বৈশিষ্ট্য—লাবণ্য এবং কমনীয়তা—এ দুইই যেন ভরা কলসীর মতো পুজোমণ্ডপের মধ্যে উপ্‌চে পড়ছে। সব মিলে গোলাপসুন্দরীর রচয়িতা, কালীঘাটের দক্ষ পটুয়া নিবারণ ঘোষের আঁকা একটি মাস্টারপিস্‌। অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে আমার মা-ও ঠাকুর বরণ করছেন। ঢাক, কাঁসর-ঘণ্টা এবং উলুধ্বনিতে সমস্ত পুজোমণ্ডপটা ক্রমশই উৎসবমুখর চূড়ান্ত মুহূর্তের দিকে এগুচ্ছে।

রুপোর-কৌটো থেকে অনেকটা সিঁদুর তুলে আমার মা-র তর্জনী দেবীর কপালের দিকে এগিয়ে গেল। 'একী! বৈশাখী বিদ্যুতের মতো ঠাকুরের খাঁড়াটা

হঠাৎ ঝিলিক মেরে উঠল কেন ? চোখে ভুল দেখছি না তো ! না, না ! এ-সব অলুক্ষুণে কথা মনে আনতে নেই !' এ-কথা ভেবে, কিংবা অন্য কোনো কারণেই হোক, ব্যাপারটা মা একেবারেই চেপে গেলেন।

কোজাগরী পূর্ণিমার তিন-চারদিন পরে বাবা অসুস্থ হলেন। তেমন কিছু নয়। সাধারণ জর। এভাবে আট-দশদিন কেটে গেল কিন্তু জ্বরের তেমন উপশম নেই। বাড়ির জ্যেষ্ঠদের, বিশেষ ক'রে আমার মেজোকাকা, বড়দা এবং মার চোখেমুখে একটা অব্যক্ত চিন্তার ভাব দেখা দিল। বিক্রমপুরে অজ পাড়াগাঁয়ে তখনকার দিনে কবিরাজি এবং অ্যালোপাথি চিকিৎসা যতটুকু সম্ভব ছিল, তাই করা হ'ল। বাড়ির আবহাওয়ায় কেমন যেন একটা থমথমে ভাব।

'ওঠ, ওঠ, শিগ্‌গির ওঠ, এক্ষুনি উঠে পড় !' এই চিৎকারে এবং অসাধারণ একটা ঝাঁকুনি খেয়ে আমি বিছানায় ধড়ফড় ক'রে উঠে বসলাম। রাত হয়তো তখনো দুটো কি তিনটে হবে। আমার চোখ তখনো বেশ তন্দ্রাচ্ছন্ন। ঐ অবস্থায় দেখি ছোটদি সামনে দাঁড়িয়ে—চোখ লাল, টস্‌টসে জলের ফোঁটা চোখ থেকে গড়িয়ে দুই গালে সরু পাহাড়ী স্রোতের মতো লাইন কেটেছে। আমাদের হায়-হুতাশ ক'রে বললেন, 'শিগ্‌গির চলো, বাবাকে শেষ-দেখা দেখে নাও !' এই ব'লে আমাকে এবং পিঠোপিঠি আমার তিন কিশোর ভাইবোনকে হাত ধ'রে —পশ্চিমের দালানে হুড়হুড় ক'রে টেনে নিয়ে এলেন। চারদিকে সাংঘাতিক কান্নার রোল উঠেছে। ঘর ভরতি লোকজন আমি বিস্মিত, স্তম্ভিত এবং বিহ্বল। আমার চোখ খুব ধীরে-ধীরে ঘরের একপাশ থেকে আরেকপাশের দিকে যাচ্ছে। একটা জায়গায় থামতেই দেখি মা বাবার বুকের ওপর মাথা রেখে অসহায় একটি শিশুর মতো চিৎকার ক'রে কাঁদছেন। দেখেই আমার চোখে বন্যা এল। উপস্থিত সবাই কাঁদছে। ধবধবে সাদা চাদরে ঢাকা। সৌম্য, প্রশান্ত-মূর্তি। বেশ তো সুন্দর ঘুমিয়ে আছেন ! এত কান্নাকাটি কিসের ! পাশের ঘরে গিয়ে কখন যে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম টেরও পাইনি।

ঘুম যখন ভাঙল তখন দেখি ঘরে আর কেউ নেই। আতঙ্কে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। পুবের আকাশে লাল মুলোর রঙ ধরেছে। মাকে খোঁজ করি। পুবের দালানের উঠোনে তাঁকে ঘিরে মেয়েরা কান্নাকাটি করছেন। কেউ-কেউ তাঁকে সান্ত্বনা দেবারও চেষ্টা করছেন। একটু এগোতেই দেখি পুজোমণ্ডপের দক্ষিণ ধারের পুকুরপাড়ে পুরুষদের ভিড়। হাল্কা নীলরঙের স্বচ্ছ একটা ধোঁয়া সবার মাথার ওপর দিয়ে উঠছে। সেটি পাকিয়ে-পাকিয়ে আকাশের রঙের সঙ্গে

মিশে ধুতুরাফুলের কেন্দ্রের মতো বেগুনী রঙে রূপান্তরিত হচ্ছে। এক পা, দু-পা ক'রে এগুলাম। ভিড়ের মাঝখান দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারতেই দেখি নিচে এবং ওপরে চেলাকাঠ দিয়ে বাবার দেহ ঢাকা। শুধু মুখটা বেরিয়ে আছে। মনে হ'ল কাঠে অল্পক্ষণ আগেই আগুন ধরানো হয়েছে। চিতার পাশে মস্ত বড়ো মাদার গাছটার একটা ডাল নেমে এসে বিলের গাঢ় সবুজ জলের সঙ্গে চুমোচুমি করছে। কয়েকটা ছোটো কচুরিপানা দলচ্যুত হয়ে, হাল্কা বাতাসে কাগজের নৌকোর মতো ভাসতে-ভাসতে মাদারের ডালটায় ধাক্কা খেতেই বিহ্বল হয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। একটা ফড়িং তার ওপর বসতে যাবে আর-কি, ঠিক সেই মুহূর্তে একটু হাওয়া লাগতেই আবার আস্তে-আস্তে পাশ কাটিয়ে চ'লে গেল। একটু দূরে আমাদেরই দু-তিনটে ডিঙি নৌকো ঘাটে বাঁধা আছে। সদ্য আল্-কাতরা-মাখানো কালো নৌকাগুলো সবুজ জলে প্রতিবিম্বিত হয়ে একদিকে সবুজের বৈভব যেমন বাড়িয়ে তুলেছে অন্যদিকে তেমনই তৈরি হয়েছে ঘনকালো রঙের কন্‌ভেক্স্‌ এবং কন্‌কেভের চমৎকার একটি নক্সা।

আগুন ঢেউ-খেলে-খেলে শুঁয়োপোকার মতো আস্তে-আস্তে চিতার ওপরের দিকে উঠছে। সামনে আগুনের জাফরানী লাল, আর তারই পেছনে পুকুরের জলের ঠাণ্ডা সবুজ। বাঃ! এ তো ভারী চমৎকার। এত সুন্দর রঙের খেলা এর আগে তো তেমন দেখিনি। এই পটভূমিকায় সমবেত লোকদের ছায়ার মতো কালো কৃশ দেহগুলো, আর তাদের কোমরে বাঁধা লাল গামছা – সব মিলে চমৎকার একটি ছবির মতো দেখাচ্ছে।

হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা চাপা স্বরে কে ব'লে উঠল, 'বল হরি, হরি বল।' ধোঁয়ার রঙ এবার নীল থেকে মোষের গায়ের ভুষোকালো রঙ ধরেছে। মাদার গাছটার পাতার আড়ালে, কোথাও কয়েকটা টিয়ে পাখি এতক্ষণ গা-ঢাকা দিয়েছিল। আতঙ্কে উড়ে গিয়ে দক্ষিণপাড়ার শিবমন্দিরটার চূড়ায় গিয়ে বসল। তাদের গলায় এবং বুকেও লাল রঙের ছোপ। আগুন ক্রমশঃ আরো প্রজ্বলিত হয়ে উপস্থিত সকলের মাথা ছাপিয়ে উঠছে। আগুন! আগুন তো এর আগে কতই দেখেছি – মোমবাতির আগুন, প্রদীপের আগুন, উনুনের আগুন, কর্পূরের আগুন, পাট-খড়ির আগুন, আরো কতরকমের আগুন। এ-সব আগুনই তো মানুষের কত উপকারে আসে। কিন্তু এ তো সে-রকম নয়। এর রঙ আলাদা, এর শব্দ আলাদা, এর গন্ধও একেবারেই স্বতন্ত্র। এর চেহারাটা কী সাংঘাতিক! এর চোখ কামারের কালো নেহাইয়ের ওপর গরম লোহার মতো টকটকে লাল।

এর চোখের মণিও তেমনি সদ্য-বলি-দেয়া পাঁঠার মতো থকথকে গাঢ় লালের দুটি পান্না। আর তারই কেন্দ্রবিন্দুতে বোয়াল মাছের চোখের মতো দুটি সাদা হীরের ভেতর থেকে প্রচণ্ড তেজের আলোর রশ্মি বড়ো-বড়ো রুপোলী আল্‌পিনের মতো ঠিক্‌রে পড়েছে। থোকা-থোকা চুলগুলো লাল শরের মতো ওপরের দিকে ছুটছে। যেন কাশবনে আগুন লেগেছে। চোখের নিচটাই-বা কী বিশ্রী দেখতে। যেন পৃথিবীর যত মদোমাতালদের মেদ জমা হয়ে বেলুনের মতো ফুলে উঠেছে। তার হাঁ-করা মুখের ভেতরটাও ক্ষুধিত কাকপক্ষীশাবকের মতো। কুশ্রী একটা তাজা ক্ষতের রঙের বিশাল গহ্বর। সেই গহ্বর থেকে তার লকলকে জিভটা একটা লাল কীর্তিনাশা নদীর মতো তড়িৎবেগে নেমে এসেছে, নতুন ডাঙা খুঁজছে যেন। পেলেই তাকে মুহূর্তের মধ্যে চেটে সাফ্‌ ক'রে দেবে। মাঝে-মাঝে জিভটাকে সুড়ুৎ-সুড়ুৎ আওয়াজে গুটিয়ে নিয়ে যেই-না ভেতরে ঢোকাচ্ছে, তক্ষুনি সাদা ইস্পাতের তৈরি গিলোটিনের মতো তার দাঁতগুলো ঝড়ের বিদ্যুতের মতো ঝিলিক্‌ মেরে উঠছে। একেকটা দাঁতই যেন একেকটা পাটি। গাছপালা, পাহাড়পর্বত, মানুষজন, যা-ই সামনে পাবে, চিবিয়ে, গুঁড়িয়ে কিমার মতো কুচিয়ে দেবে। বহুশীর্ষ সাপের ফণার মতো আগুন নাসারন্ধ্রের অন্ধকার গুহার ভেতর পাকিয়ে-পাকিয়ে বেরিয়ে এসে যেন হয়েছে তার বিরাট—একটা নয়, কয়েকটা—গোঁফজোড়া। শকুনির চোখের মতো গোল-গোল লাল পাথর বসানো দুই মাকড়ি কান থেকে ঝুলে কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। ঐ চোখগুলো যেন পৃথিবীর সব মৃতদের খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ভিড়ের মধ্য থেকে কে-একজন একটা লাঠি দিয়ে আগুনটাকে খুঁচিয়ে দিল। আগুনও কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমিয়ে পড়ে না কি! তাকেও কি বর্শার ফলকের খোঁচা মেরে জাগিয়ে দিতে হয়! মাতালকে মাতাল বললে সে যেমন ক্ষেপে ওঠে, আগুনও তেমনি সাংঘাতিক রকম ক্ষেপে উঠল। তার সেই গিলোটিনের মতো দাঁতগুলো ঘ'ষে-ঘ'ষে এমন বিকট আওয়াজ বের করতে লাগল যে, তার স্পন্দনে সব-কিছু কেঁপে উঠল। আমার পায়ের তলার মাটিটাও। পাশেই বাহির-বাড়ি ঘরের থাম্‌টা দু-হাত দিয়ে ধ'রে ফেললাম। আমার ভীষণ ভয় করছে। কী ভয়ংকর এর চেহারা। এ কি সেই অগ্নি—যার ক্রোধের ঘনঘটার গভীর গর্জনে সমস্ত খাণ্ডব বন কেঁপে উঠেছিল? যার উত্তাপে হাজার-হাজার পশু ভয়ানক চিৎকারে উর্ধ্বশ্বাসে দিক্‌বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাতে গিয়ে—অর্ধদগ্ধ অবস্থায় এবং গলিত নয়নে বিশীর্ণ হয়ে গিয়েছিল? এ কি সেই হুতাশন যার ঘূর্ণিহাওয়ায় পালিয়ে-যাওয়া ঈগল, চিল, শকুনদের বিরাট ডানাগুলো দাউ-দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠে,

পাক খেতে-খেতে খাণ্ডবের অগ্নিকুণ্ডে পুড়ে ভস্ম হয়ে গিয়েছিল? এবং দুর্যোধন কি এই সর্বগ্রাসী আগুনকে মনে ক'রেই নিরপরাধ, সমাতৃক পাণ্ডবদের জতুগৃহে আগুন লাগিয়ে তাদের পুড়িয়ে মারবার মানস করেছিল?

হঠাৎ বাবার মুখমণ্ডলের দিকে চোখ পড়তেই বুকের ভেতরটায় ধপাস ক'রে যেন একটা পাথর পড়ল। বাঘের মতো চেহারাটায় অমন ক'রে কে বিশ্রী কালো রঙ মাখিয়ে দিল? অত বড়ো ডাকসাইটে মুখটা এরই মধ্যে একটা পোড়া বেলের মতো কুঁকড়ে গেল কী ক'রে? না। না! এ-দৃশ্য আমি দেখতে পারছি না।

'মৈনমগ্নে বিদহ মাভিশোচ মাস্য ত্ব চে
চিক্ষিপো মা শরীরম্'...

হে আগুন। তোমার পায়ে পড়ি। দোহাই তোমার। তুমি এই মৃত লোকটিকে একেবারে ছাই কোরো না। এঁকে কষ্ট দিয়ো না। এঁর চামড়া বা এঁর শরীর এমনভাবে ছিন্নভিন্ন কোরো না। আগুনের এই ভয়ংকর চেহারা তো দেখছি সেই নরকের আগুনের মতোই। যার ছবি দেখে একদিন ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। অনেক দুঃস্বপ্ন দেখে নিদ্রাহীন রাত কাটিয়েছিলাম। দেখেছিলাম সে-অগ্নিকুণ্ডের ওপর বিরাট টগ্‌বগে তেলের কড়াইয়ে—পৃথিবীর পাপীরা মুসুরির ডালের মতো সেদ্ধ হয়ে মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। সেই টগ্‌বগে আওয়াজ যেন আমি এখনো শুনতে পাচ্ছি।

একটা মাটির মাল্‌সা থেকে বড়দা কয়েক হাতা ঘি চিতায় ছিটিয়ে দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গেই আগুন একটা আহত হিংস্র বাঘের রূপ ধারণ করল। যেন দাঁতমুখ খিঁচিয়ে, লাফাতে-লাফাতে শিকারীর গর্দান লক্ষ ক'রে এগিয়ে আসছে। বুম্-পট্-পট্-পটাশ। কাঠের আগুনের মধ্যেও কি বিস্ফোরক মেশানো আছে? এই শব্দের সঙ্গে-সঙ্গেই আগুনের স্ফুলিঙ্গগুলো ছুঁচোবাজির মতো চারদিকে ছুটছে। ভয়ে চিতার পাশের লোকেরা দু-হাত দিয়ে মুখ ঢাকল। পুকুরের দক্ষিণ দিকে কয়েকটা বড়ো আমগাছ ছিল। আগুনের এই ভয়ংকর মূর্তি দেখে, আর শব্দ শুনে সেখানকার দাঁড়কাকগুলো নিরাপত্তাহীন বোধ ক'রে, ক্রোয়্যাঃ, ক্রোয়্যাঃ, ক্রাঃ, ক্রাঃ চিৎকারে গাছগুলোর চারপাশ দিয়ে উড়ে বেড়াতে লাগল। যেন তাদের সমস্ত জ্ঞাতিগুষ্টিকে আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায় সতর্কবাণী প্রচার করছে। ভয় পাবারই কথা। আবার সেই কানফাটানো আওয়াজ, বুম্-পট্-পট্-পটাশ। সেই আওয়াজ গাছের ডালে আর জলে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি করতে থাকল। আখের পাতার মতো লম্বা-লম্বা আগুনের শিখাগুলো একটু সামান্য হাওয়া

লাগতেই কাত্‌ হয়ে, দোল খেয়ে, গাছগুলোকে লক্ষ্য ক'রে দক্ষিণের দিকে ছোটে। ক্রোয়াঃ, ক্রোয়াঃ, ক্রাঃ, ক্রাঃ। দেখতে-না-দেখতেই ছোটো কাক, শালিখ, চড়ুই, পানকৌড়ি, চিল, শকুন, শ্যামাপাখি—রাজ্যের যত পাখিরা আকাশে উড়তে আরম্ভ করল।

'পর্বতপ্রমাণ অগ্নি ভয়ংকর দেখি।
পিঞ্জর সহিত পোড়ে পোষনিয় পাখী॥
শারীশুক্‌ কাকাতুয়া সারস সারসী।
নানাজাতি বিহঙ্গ পুড়িল রাশি রাশি॥'

ঠাকুরমার কাছে হনুমানের লঙ্কাদাহনের বীভৎস কাহিনী শুনেছিলাম। সে ভয়ংকর দাবানলে নাকি শতশত হাতি-ঘোড়া, ময়ূর-ময়ূরী, ময়না, টিয়েপাখি এবং আরো হাজার রকম রঙবেরঙের পাখি পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল।

চিতার আগুন আরো লম্বা হয়ে, শাঁই-শাঁই ক'রে উঠে আমাদের গ্রামের এই নিরীহ পাখিগুলোর এই দশা করবে নাকি! হে ভগবান! দোহাই তোমার! ওদের যেন এ-সর্বনাশ না হয়! ভাবতেও আমার বুকের ভেতরটা বিলিতি ঢাকের মতো ঢুমঢুম ক'রে বাজছে। আমি তাড়াতাড়ি বাহিরবাড়ির নিচু দাওয়ায় ধপ্‌ ক'রে ব'সে পড়লাম।

বড়দা আবার বেশ-খানিকটা ঘৃতাহুতি করবার সঙ্গে-সঙ্গেই আগুন এক বিরাট কুণ্ডের রূপ ধরল। আগুন যেন এবার এক আগ্নেয়গিরির গহ্বর থেকে উঠছে। কুচকুচে কালো ধোঁয়ার-রেখায়-ঘেরা আগুনের রঙ এমনই লাল বৈভবে পরিপূর্ণ, এমনই তার জেল্লা যে, আমি আর তাকাতে না-পেরে দু-হাত দিয়ে চোখ ঢেকে হাঁটুর ওপর মাথা গুঁজলাম। কী অদ্ভুত! কী আশ্চর্য! চোখ বুজতেই স্পষ্ট দেখি ঘন অন্ধকারের গহ্বরের মধ্যে আগুনের সেই শিখাগুলো ঠাণ্ডা সবুজ রঙ ধরেছে। এ এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা! এর বিপরীতটাও কি তাহলে সম্ভব! কত ভোরের আলোতেই তো আমাদের পুকুরঘাটে ব'সে, তার উল্টোদিকে বৃষ্টিধোয়া তাজা সবুজ রঙের কলাবাগানটার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছি। চোখে পোকা কিংবা ধুলোর কণা ঢোকায় অকস্মাৎ কতবারই তো চোখ বুজেছি। কই! কখনো দেখিনি যে, কলাগাছগুলো আগুনের রঙ ধরেছে! এই লাল রঙটা আমার চোখের স্নায়ুগুলোর ওপর এক আজব প্রতিক্রিয়া ঘটায়। দীর্ঘ শিল্পীজীবনে রামধনুর সবচেয়ে শক্তিশালী এই বর্ণচ্ছটার সঙ্গে যখনই মোলাকাৎ হয়েছে তখনই চোখে অন্ধকার দেখেছি। তবুও তাকে আজ পর্যন্ত

বিখ্যাত আমেরিকান চিত্রকর বেন্‌-শান্‌ অঙ্কিত "ফায়ার বিস্ট" ছবির অনুকরণে—আগুন

আমার প্যালেট্ থেকে মুছে ফেলতে পারিনি। এমনই সাংঘাতিক তার আকর্ষণ-শক্তি।

নেহাৎ ছোটোবেলায় আমাদের বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই, নিতান্ত আপনজনের চিতায় সেই-যে ভয়ংকর আগুন দেখলাম, তা সারা জীবনের মতো আমার শিল্পী-মনের ওপর একটা গভীর ছাপ রেখে দিয়ে যায়। একবার এই আগুনের রঙে একটা একরঙা ছবি আঁকতে গিয়ে মাথার মধ্যে কী যে বিপর্যয় ঘ'টে গেল বুঝতে পারলাম না। মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে গেলাম। সাধে কি এই রঙকে সাংঘাতিক সব বিপদ-আপদ, যুদ্ধ-ধ্বংস, বিদ্রোহ-বিপ্লবের প্রতীক মনে করা হয়? আমি যতদূর জানি, একালের আরো দু-জন চিত্রশিল্পী আগুনের ভয়ংকর সম্মোহনী শক্তিতে সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হয়েছেন। একজন মেক্সিকোর রুফিনো তামায়ো এবং অন্যজন আমেরিকার বেন্ শান্—এ-দু-জনই আগুনের ভয়ংকর সব ছবি এঁকেছেন।

রঙের রাজা তামায়ো-র আঁকা আগুনের ছবিগুলোতে লাল—সোমরসের লাল, পোড়া-ইটের লাল, শরতের বার্চ, ডগ্‌উড্ আর মেপেল বৃক্ষের লাল, এমনই হরেকরকম লালের ব্যবহার দেখে শুধু শিল্পীদের এবং শিল্পরসিকদেরই নয়, একটি সরল অনভিজ্ঞ শিশুরও তাক্ লেগে যায়। বেন্ শানের ছবিতে শুধু আগুনের ভয়ংকর গম্ভীর রাজকীয় রুদ্রমূর্তি—তার মুখমণ্ডলে এমনই চোখ-ধাঁধানো সোনালী এক দীপ্তি যে, সিংহের কেশরের মতো অগ্নিশিখায় ঘেরা তার মুখ কালো কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখতে হয়—যেমন ক'রে দেখি আমরা গ্রহণের সময় সূর্যকে। আবার কখনো আগুন তাঁর ছবিতে এক বিরাট আদিম পশুর রূপ ধারণ করছে যার হাঁ-করা করাল বদনের লোল জিহ্বা পৃথিবীর সব জীবদের লাল রক্ত নিঃশেষে শুষে নিয়েছে—তার সেই লক্‌লকে জিভ, তার বিকট চোখ-মুখ-কান, হিংস্র ঠ্যাং-ল্যাজ—বস্তুত সমস্ত শরীরটাই প্রখর গ্রীষ্মের জলন্ত সূর্যের অস্তকালীন রঙ দিয়ে আঁকা, যেন তার শরীর শুধু কাঁচা মাংসের তৈরি, অনাবৃত, চর্মহীন। এমন-কি তার পায়ের নখগুলো পর্যন্ত বৃশ্চিকের বিষের থলির মতো লাল গরলে পূর্ণ। শুনেছি শৈশবে তাঁদের নিজেদের বাড়ির অগ্নিকাণ্ডে ধরা প'ড়ে যে সাংঘাতিক ভয় পেয়েছিলেন, এ-ছবি সেই নিদারুণ অভিজ্ঞতারই অসাধারণ অভিব্যক্তি। সে-ছবি রূপে যেমন ভয়ংকর, তেমনই সম্মোহনী।

ছবির সূত্রে আরেকজন শিল্পীর কথা এ-প্রসঙ্গে মনে আসছে। আগুন মানে তো শুধু রূপ আর রঙ নয়, আগুন মানে আলোও বটে। ছবির বেলায় আলোর

ভূমিকা একটা প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আলো যে কখনো-কখনো কত ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, তা হঠাৎ যে কারো চোখে ধরা পড়তে পারে। সেদিন অন্তত আমার তা-ই মনে হয়েছিল। আমার কাছে আজও তা সমান সত্য।

অনেকক্ষণ চোখ বুজে থাকার পর মাথা উঁচিয়ে মাদার গাছটার দিকে তাকাতেই চোখ ঝল্‌সে গেল। সূর্য গাছটার প্রায় মাথার ওপর এসেছে। তার রশ্মিগুলো সদ্য-ছাঁচে-ঢালা ইস্পাতের ছুঁচের মতো সোজা হয়ে সামনের পুকুরটাতে এসে ধাক্কা খেয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। পুকুরটাকে মনে হচ্ছে সূর্যের মুখোমুখি রাখা একটা বিরাট আরশি। তলা থেকে এই আলোতে আশেপাশের গাছগাছালির ডালপালাগুলো মুনিয়া পাখির বুকের পালকের মতো তামার রঙ ধরেছে। চিতার কাছের লোকজনদের নাকের ডগায়, থুত্‌নিতে এবং চিবুকের হাড়ে এই আলো লেগে মুখগুলো একেকটা জাপানী নৃত্যের মুখোশের মতো দেখাচ্ছে। সবার চোখ এই প্রক্ষিপ্ত আলোর ঝলকানিতে এমনই সংকুচিত হয়ে গেছে যে, মনে হচ্ছে চোখ নয় তো যেন নরকঙ্কালের দুটি কালো গর্ত। নিচে থেকে প্রক্ষিপ্ত এই নাটকীয় আলোতে কোন্ মানুষের চেহারাই-না বিকৃত এবং ভয়ংকর দেখায়! বহুদিন পরে একজন য়ুরোপীয় শিল্পীর কাজ দেখে, আবার চিতার পাশে দেখা সেই বিকৃত মুখোশের মতো মুখগুলোর কথা আমার মনে পড়ে গিয়েছিল। বিখ্যাত স্প্যানিশ শিল্পী গোইয়ার বিদ্রোহ সংক্রান্ত ছবিগুলোর কথা বলছি আমি। তাঁর ওই ছবিগুলোতে তিনি এমনই বিচ্ছুরিত আলোর আশ্চর্য ব্যবহার করেছেন।

ঠিকরে-পড়া আলো আর সরাসরি আলোর মধ্যে বিপুল পার্থক্য আছে—দু-রকম আলো দর্শকের মনে দু-রকম প্রতিক্রিয়া জাগায়। দান্তের লেখা 'দি ডিভাইন কমেডি' নামক মহাকাব্যে পরমসত্তাকে বর্ণনা করা হয়েছে সরাসরি চোখ-ধাঁধানো আলো রূপে, মহাজ্যোতিই হ'ল সর্বোচ্চ দিব্যতার স্বরূপ, যার সামনে মহাকবি আপনিই অন্ধ হয়ে গেছেন। কোন্ মানুষ তার চোখ খুলে থাকতে পারে একাধিক সূর্যের দিকে?

> 'And suddenly, as it appeared to me
> day was added to day, as if He who can
> had added a new sun to Heaven's glory.'

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দান্তে যে-রকম অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন,

আমাদের দেশের মহাসাধক ঠাকুর রামকৃষ্ণের বেলাতেও তেমনই অভিজ্ঞতার কথা পাই। মহামায়ার কৃপায় একদিন ঠাকুর দেখলেন, ঘরের কোণের ছোট্ট প্রদীপের আলোটি ধীরে-ধীরে প্রদীপ্ত থেকে আরো প্রদীপ্ত হয়ে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে উদ্‌ভাসিত ক'রে তুলল। সেই আশ্চর্য আলো তাঁর অন্তরে প্রবেশ ক'রে সমাধি অবস্থায়, এক দিব্য জ্যোতির মতো তাঁর দেহ থেকে চারদিকে বিচ্ছুরিত হতে লাগল। সেই জ্যোতি কি আগুন ছিল না আলো ছিল? না বৈশাখী ঝড়ের বিদ্যুৎ। এই অবস্থাতেই তো শ্রীমান নরেনের বুকে পা ছোঁয়াতেই প্রিয় শিষ্যর সমস্ত চৈতন্য চকিতে লুপ্ত হ'ল।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত তখনো স্বামী বিবেকানন্দ হননি, তখনো তিনি দিগ্বিজয়ী হননি। কিন্তু দিগ্বিজয়ী বীর অর্জুনও যে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ দেখে, ক্ষণিকের জন্যে সম্পূর্ণ বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলেন সে কথা আমরা মহাভারতে পাই। তখন কী ছিল কৃষ্ণের স্বরূপ? কী দেখে অন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে অর্জুন আর্তনাদ ক'রে উঠেছিলেন,

'তব ইদম্ উগ্রম্ অদ্ভুত রূপং দ্রষ্ট্বা
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতম্।'

কৃষ্ণের সেই ভয়ংকর রূপ দেখে শুধু অর্জুনের চোখই ঝলসে যায়নি, স্বর্গ-মর্ত-রসাতল—এ তিন লোকই সাংঘাতিক বিচলিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। ভক্তের দুর্দশা দেখে ভগবান, স্বয়ং তক্ষুনি তাঁর পরমভক্তকে দিব্যদৃষ্টি দিয়েছিলেন। তবু ভীষণ সাংঘাতিক সব বিকটদংষ্ট্রা দ্বারা বিকৃত, প্রলয়ের আগুনের মতো জ্বলন্ত, ভগবান কৃষ্ণের মুখমণ্ডল দেখে অর্জুন নাকি এতই আতঙ্কিত হয়েছিলেন যে, তাঁর দিগ্‌বিভ্রম হতে লাগল। কিছুতেই স্থির থাকতে পারছিলেন না, সহ্য করতে পারছিলেন না। ব্যাকুল হয়ে তিনি দেবেশকে তাঁর সেই ভয়ংকর রূপ সংবরণ করতে মিনতি জানালেন। অমনই জগদাধর ফিরে এলেন স্বাভাবিক রূপে।

কিন্তু কেই-বা আমার ঠাকুর রামকৃষ্ণ, কেই-বা আমার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ! কেনই-বা আগুনের এই ভীষণ রূপ প্রকটিত হ'ল! আর কেই-বা করল! কার কাছে আমি মিনতি ক'রে কাঁদব, আমাকে রক্ষে করো। শুধুই কি ভীষণ রূপ? তার সঙ্গে বিচিত্র শক্তি নয়? বিচিত্র শিল্পী নয়? বিচিত্র অস্ফুট মর্মর আর তার হঠাৎ বিস্ফোরণে কোনো দুর্বোধ্য সম্মোহনা মন্ত্রের মতো এক বিচিত্র ধ্বনির আবর্তন নয়?

ভিড়ের ভেতর থেকে কালো, রোগাপটকা, উস্কোখুস্কো চুলওয়ালা সদাকাকা

এগিয়ে এসে বাঁশের লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে দিলেন আগুনটাকে। মাল্‌সার থেকে আরো খানিকটা ঘি বড়দা আবার ছিটিয়ে দিলেন। অমনি আগুন অজস্র রক্ত-পিপাসু ধারালো বাঁকা তলোয়ারের মতো শাঁই-শাঁই ক'রে উঠে মাদার গাছটার মগডালটা জ্বালিয়ে দিতে চাইল। গাছের নিচের ডালপালাগুলোর ছাল ফেটে প্রায় অঙ্গারের রূপ ধরেছে। আবার জায়গায়-জায়গায় ভরা-গ্রীষ্মের পিচের রাস্তার মতো ফোস্কা পড়েছে। ঝল্‌সানো খয়েরি রঙের পাতাগুলোর ভেতরকার সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরাগুলো নিপুণ হাতের তৈরি লেস্ বা জালিকাজের মতো দেখাচ্ছে। পাতার ভরাট সবুজের আড়ালে যে এত অপূর্ব জটিল কারুকার্য লুকিয়ে থাকে, কে জানত! একটি অতি সাধারণ, অতি নগণ্য গাছের পাতায়ও যে উঁচু-দরের দক্ষ স্বর্ণকারের এত অসাধারণ কারিগরি থাকে—তা দেখে আমি যতই বিস্মিত, ততই রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম যেমন হয়েছিলেন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখে। প্রাপ্তবয়সে, এ-যুগের মহান শিল্পী Paul Klee-র জীবনীতে পড়েছিলাম যে উনি শুকনো পাতার ভেতরকার এই জটিল কাঠামো, অতি সযত্নে, দুটি কাঁচের মধ্যে সংরক্ষণ ক'রে রেখেছিলেন। প্রকৃতির এই আশ্চর্য সৃষ্টির নিদর্শনে মোহিত হয়ে তিনি এ-ধরনের—অর্থাৎ সূক্ষ্ম রেখার জালিভিত্তিক কয়েকটি অত্যন্ত মৌলিক ছবিও আঁকেন।

আমাদের কাঠুরে কার্তিকচাঁদ আর আমাদের ভুঁইমালী—এ-দু-জন মিলে বেশ কয়েকখানা বড়ো সাইজের চেলাকাঠ চিতার আগুনের ফাঁকে-ফাঁকে গুঁজে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘন কালো ধোঁয়া শোঁ-শোঁ ক'রে পাকিয়ে উঠে গাছপালা, আকাশবাতাস আচ্ছন্ন ক'রে দিল। চাটুর তলায় ভুসার মতো কালো এই ধোঁয়ার মাঝে-মাঝে আগুনের ছোটো ফুল্‌কিগুলো অমাবস্যা রাত্রির তারার মতো ঝল্‌মল্ করছে। তারই ফাঁক দিয়ে মাঝে-মাঝে হেমন্তের স্বচ্ছ নীল আকাশ গোল-গোল নীল কাঁচের মতো উঁকিঝুঁকি মারছে···'বল হরি, হরি বল।'

সদাকাকা, আর বোধ করি তুরতুরাদা দুটো বাঁশ দিয়ে চিতার আগুনকে বেশ ক'রে খুঁচিয়ে দিল। ঝিমিয়ে-পড়া পোষা সাপ যেমন সাপুড়ের খোঁচা খেয়ে ফণা তুলে, ল্যাজে ভর ক'রে দাঁড়িয়ে ওঠে, আর ফোঁস-ফোঁস আওয়াজে সাপুড়েকে ছোবল মারতে উদ্যত হয়, আগুনও তেমনি শত-শত তুবড়িবাজির মতো হুশ্-হুশ্ ক'রে ওপরের দিকে উঠে, বিদ্যুৎবেগে তার মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। কী হিংস্র তার চেহারা। বিশটা নরখাদক বাঘও এর সামনে কিছু নয়। আমার ভেতরটা একটা অজানা আসন্ন আশঙ্কায় ধক্‌ধক্ করতে থাকল।

বড়দা মাল্‌সাটাকে উপুড় ক'রে অবশিষ্ট সব ঘিটুকুই চিতায় ঢেলে দিলেন। আগুন এবার দাপিয়ে উঠে তার চূড়ান্ত রূপ ধারণ করল। কী সাংঘাতিক! কী ভয়ংকর, কী সর্বনাশা, কী সর্বগ্রাসী তার চেহারা! তার জোড়া-জোড়া চোখ যেন ফুটন্ত লোহার বৈকাল হ্রদ। তার মাথার চারপাশের থোকা-থোকা কেশর-গুলো বিরাট লাল লঙ্কার মতো বাঁকিয়ে উঠেছে। যেন একটা অতিকায় দানব শত-শত মশাল হাতে ক'রে উন্মাদ বক্ররেখার ভঙ্গিতে নাচছে। কী আবোল-তাবোল তার ছন্দ! কী আবোল-তাবোল তার লয়! প্রকৃতির সৃষ্টির মধ্যে এমন-কিছু কি আর আছে যা সামান্য হাওয়ার ছোঁয়াচেই এত মাতামাতি, পাগলামি করে! এ তো ভীম ভৈরবের নাচ! তিব্বতি-তনাকায় বজ্রপাণির চতুর্দিকের সহস্র শিখার আগুনও এর কাছে অতি নগণ্য, অতি তুচ্ছ। তার হাঁ-করা মুখের গহ্বর থেকে এবার—একটা নয়, সাত-সাতটা—আনাভিলম্বিত লকলকে জিভ যেন রক্তের সাতটা পাহাড়ী প্রস্রবণ। তার ভয়ংকর মুখমণ্ডল—চুল থেকে নিয়ে জিভের ডগা পর্যন্ত—সবটাই যেন পৃথিবীর তাবৎ লাল রঙের মিলনক্ষেত্র। রক্তজবার লাল, রক্তকরবীর লাল, পলাশের লাল, শিমুল ফুলের লাল, কৃষ্ণচূড়ার লাল, রঙ্গনের লাল, রডোডেনড্রনের লাল, বকুল-বটফল-লিচুর লাল, শীতের বাদাম পাতার লাল, তরমুজের লাল আবির-আলতার লাল, স্বর্ণসিন্দূর মকরধ্বজের লাল, মোরগের ঝুঁটির লাল, টিয়েপাখির ঠোঁটের লাল—আরো যে কতরকমের লাল, তার হিসেব কে করে! পৃথিবীর সব ইস্পাত কারখানার ফার্নেসের পুঞ্জিত উত্তাপে যেন লালের নির্যাস তৈরি হচ্ছে। আমার পলক নড়ছে না। আমি স্বপ্নাবিষ্ট, অর্ধ-অচৈতন্য।

আগুন যেমনই ভয়ংকর থেকে ভয়ংকরতর হতে লাগল, তেমনি আকারেও বৃহত্তর হতে থাকল। খুব ছোটোবেলায়, রূপকথার গল্পে, এক আদিম দৈত্যের কথা পড়েছিলাম। সেই দানব তার প্রতিটি নিশ্বাসের সঙ্গে একটা গ্যাসভর্তি বেলুনের মতো ফুলে-ফুলে উঠে সমস্ত বায়ুমণ্ডলকে ছেয়ে ফেলল। এই আগুনও তেমনি তার নিশ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বাড়তে-বাড়তে লাফাতে-লাফাতে আমাদের গ্রামের সব গাছগুলোতে সব কুঁড়েঘরের চালার খড়কুটোতে ছড়িয়ে পড়বে নাকি? কী সর্বনাশ! তাহলে কী হবে? ভাবতেও আমার মেরুদণ্ড সিরসির করছে। আমার কপালে জলবসন্তের গুটির মতো অসংখ্য ফোঁটার ঘাম জমছে।

কিছুদিন আগে আফ্রিকার জন্তু-জানোয়ারের একটা সিনেমা দেখেছিলাম। দেখে যেমন আমার পঞ্চেন্দ্রিয়তে রোমাঞ্চের তরঙ্গ উঠেছিল তেমনি বয়েছিল

আতঙ্কেরও। একটা ক্ষুধার্ত সিংহ একদল জেব্রাকে তাড়া করছে। জেব্রাগুলো স্বভাবতই সিংহের কবল থেকে নিজেদের রক্ষে করবার উদ্দেশ্যে মরি-কি-বাঁচি ক'রে ছুটে পালাচ্ছে। দলের মধ্যে সবচেয়ে শেষের জেব্রাটি পেছন-পানে তাকিয়ে, সিংহটা কতটা দূরে আছে দেখতে যাবে আর-কী, ব্যাস্। তার সঙ্গে একেবারে চোখাচোখি হয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে সাদা-কালো ডোরাকাটা জন্তুটা যেখানে ছিল সেখানেই জ'মে গেল। বাপরে বাপ্! পশুরাজের চোখের কী সাংঘাতিক মোহিনী শক্তি! কী লোলুপ দৃষ্টি তার! আমার আতঙ্কিত বুকের ভেতরটা রেলগাড়ির চাকার মতো ধক্-ধক্ করতে লাগল। আমার নিশ্বাস দ্রুততর হতে থাকল। আমার চোখ বিস্ফারিত, স্থির, ইস্ক্রুপ দিয়ে কেউ আটকে দিয়েছে। আগুনের সঙ্গে আমারও যে চোখাচোখি হ'ল। কী আক্রমণাত্মক তার চেহারা! আফ্রিকার এই নিরীহ জেব্রাটার মতো আমাকেও কি আগুন তার উদরে পুরে দেবে নাকি? হে অগ্নিশ্রেষ্ঠ, হে হুতাশন, হে দীপ্তিমান্ অগ্নি, হে জ্যোতির্ময় অগ্নি, হে সর্বদর্শী অগ্নি, হে পাপনাশক অগ্নি, হে সর্বভূতজ্ঞ অগ্নি, হে শুভ্রদীপ্ত, হে বৈশ্বানর, হে অঙ্গিরাশ্রেষ্ঠ, হে শত্রুহন্তা, হে প্রজ্ঞাবান্! আমি জানি তুমি প্রবুদ্ধ, তুমি অভীষ্ট ফলসাধক, তুমি সত্যভূত। তুমি যজ্ঞের মহান্ নেতা। তুমি তোমার যজমানদের কত অভিলষিত ধন দান কর, পুত্র-পৌত্রাদি দাও। তুমি ক্রতুর ন্যায় উপকারী। আমি! আমি! আমি তোমার যজ্ঞের বেদী তৈরি করব। তোমাকে কুশের আসনে উপবেশন করাব। আমি তোমাকে প্রতিদিন তিনবার হব্য দান করব। তুমি সকলের ধারক, তুমিই মনুষ্যলোকের পালন-কর্তা। তুমি এই অসহায় নাবালকের সব দোষ ক্ষমা করো। আমার অসহ্য জ্বালা-যন্ত্রণা, আমার সকল দাহ জুড়িয়ে দাও। আমাকে আমার মা-র কাছে ফিরে যেতে দাও।

ভয়ে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে যাচ্ছে। না, না! আমি পালাই। আমি পালাই। কিন্তু আমার পা নড়ছে না কেন? আমার পায়ে যেন জগদ্দল নেমেছে। আমার পা অসাড়। আমার পা বটগাছের শেকড়ের মতো পাতালে প্রবেশ করেছে। আমার হাতও মনে হচ্ছে যেন আস্তে-আস্তে শিথিল হয়ে আসছে। আমি তাড়াতাড়ি দু-হাতে আমার সর্বশক্তি দিয়ে পা-দুটোকে টানছি। কিন্তু কিছুতেই এতটুকুও নড়াতে পারছি না। আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। বড়দা, সদাকাকা, হীরাদা, ধনদা, তুরতুরাদা, খোকাদা, চিনিদা, কার্তিকচাঁদ, ভুঁইমালী এবং সমস্ত শ্মশানবন্ধুরা, আর অতি নিকট আমাদের পোষা কুকুর ভোলা—এদের

সবাইকে কি এই সর্বনাশা আগুন গ্রাস ক'রে ফেলবে? আর আমি! আমার দিকেই তো আগুনটা কখন থেকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। আমার দিকেই তো ভ্রূকুটি ক'রে, দাঁত কড়মড় ক'রে—এগিয়ে আসছে। আমি ঝড়ের রাতের কিশলয়ের মতো কাঁপছি। না, না! যেমন ক'রেই হোক এই আসন্ন বিপদ থেকে পালিয়ে আমাকে বাঁচতেই হবে। যেমন ক'রেই হোক আমাকে আমার মা-র কাছে ফিরে যেতেই হবে। আমার স্নায়ুকেন্দ্র ঝিন্‌ঝিন্ করছে। আমি নিরুপায়! মাগো, তুমি কোথায়? কিন্তু গলা দিয়ে যে একটুও আওয়াজ বেরুচ্ছে না। আমার বুকের ভেতরটা কে যেন দুম্‌ড়ে-মুচড়ে থেঁত্‌লে দিচ্ছে! আমি পালাই আমি পালাই। উঃ…আমি…পা…লা…ই…!

হঠাৎ দূর থেকে মা-র কান্নার ক্লান্ত করুণ সুর কানে ভেসে এল। এ তো কান্না নয়। এ তো অভয়বাণী! এই সুরে আমার মনের ময়ূর নেচে উঠল আমি মুক্তির আভাস পেলাম মা, মা! আমি আসছি। আমি…এই…এলাম!

একপাশে দশমাসের ছোট্ট শিশুভাই। আরেকপাশে মা-র কোলে আমার মাথা। আমার শরীর অবসন্ন। আমার ভীত, রক্তাক্ত, দাহমান বুকের ভেতরটার সব স্ফুলিঙ্গ নিভে গেছে। সব অন্ধকার দূর হয়ে গিয়ে জ্যোৎস্নার আলো প্রবেশ করেছে। মা'র চোখের টাটকা গরম কয়েক ফোঁটা জল আমার মুখের ওপর পড়ল। সে তো অশ্রু নয়, মরুভূমির বুকে আষাঢ়ের প্রথম বারিধারা। এক হাতে তাঁর ডানদিকের স্তনকে শিশু ভাইয়ের মুখে ধ'রে আছেন। অন্য হাতে আমার কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। আঃ! কী ঠাণ্ডা! আঃ! কী আরাম!

ন'বাবু, সেজোবাবু

তখন আমাদের গ্রীষ্মের ছুটি চলেছে। একদিন দুপুরবেলাকার কথা। ঘরের বাইরে তাপমাত্রা প্রায় একশো চার ডিগ্রির কাছাকাছি। আর্দ্রতাও তেমনি মানানসই। সারা আকাশটা যেন সদ্য-ধোয়া একটি বিরাট সাদা চাদর রোদে শুকোচ্ছে। মা-র পুজোর ঘরের বাইরে তুলসী গাছটার পাতাগুলো এই প্রচণ্ড রোদে নিরস হয়ে কুঁকড়ে আছে। বাড়ির পেছনে মস্ত কাঁটালি কলাগাছের পাতাগুলো ফ্যাকাশে রঙ ধ'রে, অসার হয়ে ভিজে ন্যাকড়ার মতো নেতিয়ে পড়েছে। মনে হয়, যেন আর কোনোদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। তারই সংলগ্ন কাঁঠাল গাছটার শ্যাওলা-সবুজ মসৃণ পাতাগুলো সূর্যের পারদ-সাদা আলোয় চুমকির মতো ঝক্‌ঝক্ করে। গাছের মর্মস্থানে, পাতার আড়ালে, কয়েকটি শালিক এবং কাক তাদের নরম বুকের পালকে মাথা গুঁজে গা-ঢাকা দিয়ে আছে। পশ্চিমের ঘরের ছাদের সরু কার্নিসে একফালি ছায়া। সেখানে সাদা-কালো ছোপ দেওয়া একটা বেড়াল কাত হয়ে শুয়ে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। মধ্যাহ্নভোজন সেরে আমি, এ-সময় রোজই তেতলা ঘরটিতে ব'সে একা-একা ছবি আঁকি। আমার আনাড়ি হাতে সেদিন বিদ্যাসাগর মশায়ের একটি প্রতিকৃতি আঁকছিলাম। এমনসময় দোতলায় মা-র কান্না শুনে দৌড়ে নিচে নেমে এসে দেখি এক হুলস্থূল কাণ্ড। মা এবং সেজদার মধ্যে রীতিমতো একটা ধস্তাধস্তি চলছে। দাদার হাত থেকে মা কী-একটা যেন কেড়ে নিতে চাইছেন। দাদা সে-জিনিসটি মুখের সামনে ধ'রে বলছে, 'এক্ষুনি, এক্ষুনি আমাকে দাও। তা না-হলে আমি এটি খেলাম ব'লে।' দাদার হাতের ছোট্ট জিনিসটি দেখতে অবিকল একটা কালো মার্বেলের মতো, জানালার আলোয় চক্‌চক্ করছে। মা-র কাঁধের আঁচলটি খ'সে গিয়ে মেঝেতে লুটোচ্ছে। তাঁর দু-চোখ থেকে দুটি জলের স্রোত তরতর ক'রে গাল বেয়ে সেমিজের মধ্যে প্রবেশ করছে। সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে আমার কনিষ্ঠ তিনটি ভাইবোন আতঙ্কে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে। জোড়-হাতে, অনুনয় ক'রে মা, ছেলের দাবি মেটাবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তুই থাম। এক্ষুনি দিচ্ছি। বাবার-দেয়া কালো ক্যাশ

"পৌষের দুপুরে, ছাদে বসে মেয়েটি নানারঙের সুতোয় রুমালে নক্সা তুলছিল"—ন'বাবু সেজোবাবু

বাক্সটির থেকে মা, পাসবই বের করলেন। পোস্ট অফিস থেকে তক্ষুনি পাঁচ হাজার টাকা তুলে আনবার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। কালো মার্বেলটি যে একটি আফিমের গুলি ছিল তা বুঝতে আর বেশি দেরি হ'ল না। এ-ধরনের নাটকীয় ঘটনা শুধু যাত্রা-থিয়েটারে ঘটে ব'লেই জানতাম।

কোনো পরিবারের শীর্ষে অত্যধিক ক্ষমতাবান্ পিতার দীর্ঘকাল উপস্থিতি অনেকটা একটি সূর্যেরই সামিল, যার চারদিকে একটি গোটা সংসার সৌরজগতের মতো ঘুরে বেড়ায়। যেদিন এ-কেন্দ্রের আলো দপ্ ক'রে নিভে যায়, সেদিন সে-সংসারে ঘোরতর অন্ধকার নেমে আসে। তাই বাবার মৃত্যুর পর আমাদের বিরাট একান্নবর্তী পরিবারে মস্ত চিড় দেখা দিল। মধ্যবিত্ত পরিবারের সর্বপ্রকার স্বার্থপরতা, হীনতা, বিদ্বেষ, ডিমের চাক্ থেকে জাত সাপের বাচ্চার মতো, একের-পর এক, ফুটে বেরুতে থাকল। মানুষ যে কী আন্দাজ ইতর হতে পারে, নানা-রকম তুচ্ছ খুঁটিনাটির মাধ্যমে, তার অকৃত্রিম প্রকাশ দেখে সে-বয়সে, আমি স্তম্ভিত হয়েছিলাম। একসঙ্গে খেতে বসিয়ে, অন্যের সন্তানদের ছোটো গাদার মাছটি এবং ডালের জলটা এবং নিজের সন্তানকে বড়ো কোলের মাছটি এবং ডালের ঘন অংশটুকু নির্লজ্জভাবে পরিবেশন করাটাই যেন সংসারের স্বাভাবিক নিয়ম।

বাবার জীবিতকালে মা-র স্থান ছিল স্বভাবতই তাঁর নিচে। তাঁর অন্তর্ধানের পর বৈমাত্র বড়ো ভাইদের ব্যবস্থায় মা-র এ-স্থান গড়িয়ে চ'লে গেল অনেক তলায়। মা-র পক্ষে এ-পদমর্যাদার হানি মেনে নেয়া কঠিন হ'লেও তাঁর চাপা স্বভাব এবং দুর্বলচিত্তের দরুন, প্রতিবাদে তিনি ছিলেন নিতান্তই অক্ষম। তাই একদিন আমাদের বারোটি ভাইবোন এবং তাঁকে যখন পৃথক ক'রে দেওয়া হ'ল তখন, একদিকে তাঁর অন্তরে যেমনি বিক্ষোভের একটি পাহাড় জ'মে উঠল, অন্য-দিকে তেমনি তিনি হলেন অসহায়। তাঁর সাতটি ছেলের মধ্যে একটিও তখন উপার্জনক্ষম হয়নি তদুপরি ছিল তিনটি কন্যার গুরুভার। তাছাড়াও, এতগুলো সন্তানকে মানুষ করবার মতো তাঁর শিক্ষা এবং ব্যক্তিত্ব—এ-দুয়েরই গুরুতর অভাব ছিল।

আমার বড়ো ভাইদের তখন উঠতি বয়েস। ধানের ক্ষেতে একই সারে, একই বীজে, মোটামুটি একই জাতের এবং একই উচ্চতার চারাগাছ হয়। কিন্তু একই বাপ-মায়ের সন্তানদের স্বভাব, বৃত্তি এবং গুণের যে কী পরিমাণ পার্থক্য হতে পারে এবং তার পরিণতি যে কী সাংঘাতিক হয়, এ-ব্যাপারে আমাদের পরি-বারের তুলনা মেলা দায়।

আমাদের বাড়ির সংলগ্ন ছয়টি ছেলের এবং চারটি মেয়ের আরেকটি পরিবার বাস করে। তাদেরও উঠতি বয়েস। স্বল্প আয় হ'লেও শিক্ষাদীক্ষায়, আচারে-ব্যবহারে এ-পরিবারটি ছিল বস্তুতই একটি সুখী পরিবার। পাশাপাশি দুই পরিবারের মধ্যে এই বৈষম্য দেখে, থেকে-থেকে নিজের অদৃষ্টকেই মা ধিক্কার দিতেন।

গর্ভাবস্থায় সন্তান প্রত্যেক মায়ের চোখেই নিখিল জগতের মর্মস্থান অধিকার ক'রে থাকে। একটি অখণ্ড আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে। প্রাণের সংগীতসভায় তাঁদের সন্তানের অস্তিত্ব, সন্তানের নিঃশব্দ কানাকানি, একটি প্রভাতী রাগের মতোই প্রাণের বাণীকে আকাশে উচ্ছ্বসিত ক'রে তোলে। এই সন্তানের মাধ্যমে মায়েরা এই বাণী আপনার রক্তের মধ্যে শুনতে পান। তাঁদের কল্পলোকের কল্প-লতার অঙ্কুরটি রবির কিরণে একদিন একটি বহুপুষ্পিত শিমুল গাছের মতোই ডালপালা মেলে আকাশে-বাতাসে ঘন রঙের আলো ছড়িয়ে দেবে, বহুবর্ণে রঞ্জিত আমার মায়ের এই সুখস্বপ্নটি যেদিন এক দুঃস্বপ্নে রূপান্তরিত হ'ল সেদিন মাতৃত্বের গৌরব-দীপ্ত তাঁর মুখটি অদৃষ্টের গোপন হাতে, কালিমার প্রলেপে, ঢাকা প'ড়ে গেল। তাঁর স্নিগ্ধ, স্নেহশীল মুখটি ঘন কৃষ্ণবর্ণ, ধিক্কার এবং বিষাদের স্থূল রেখায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠল।

তখন আমার বয়েস বারো কি তেরো হবে। প্রতিদিন ভোরে কাক ডাকার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রায় সাড়ে-ছয় ফুট লম্বা, দৈত্যের মতো দেখতে, মস্ত লাঠি হাতে এক কাবুলিওয়ালাকে আমাদের বাড়ির রোয়াকে ব'সে থাকতে দেখি আমাদের সঙ্গে অকস্মাৎ চোখাচোখি হ'লে, সেজোবাবু বাড়ি আছেন কিনা জিজ্ঞেস করে। সেজোবাবু সারা রাত মদ আর জুয়ার আড্ডায় কাটিয়ে সবেমাত্র শয্যা নিয়েছেন। এই জুয়ার আড্ডা প্রায়ই আমাদের বৈঠকখানায় বসত। কখনো-কখনো সারা রাত এবং পরের দিন দুপুরবেলা অব্দি চলত। একটি কি দুটি জানালা সামান্য খোলা। বাকি সব দরজা-জানালা, ছিট্‌কিনি দেয়া। সিগারেটের ধোঁয়া সারা ঘরটিতে প্রভাতের কুয়াশার মতো থাকে-থাকে জ'মে আছে। আচম্‌কা হাওয়ার প্রবেশের সঙ্গে-সঙ্গে এই ধোঁয়া চরকির মতো পাক খেতে থাকে। তার ভেতর দিয়ে জুয়াড়িদের আংশিক স্পষ্ট মুখগুলো মুহূর্তের জন্যে দেখা দিয়ে আবার ধোঁয়ার সঙ্গে মিলিয়ে যায়। সিগারেট, চা কিংবা জলের প্রয়োজন হ'লে অনেকসময়ই আমা-দের ডাক পড়ে। কয়েকশত, কিংবা কয়েক হাজার টাকার যে হাতবদল হয়েছে আমাদের বুঝতে দেরি হয় না। আমাদের বৈঠকখানা ছাড়াও, এ-আড্ডা

জমাবার, সেজদা এবং তার বন্ধুদের, একটি স্থায়ী ক্লাবঘরও ছিল। শনিবার এই আড্ডার বিরতির দিন কারণ, সেদিন সারা দুপুর এবং বিকেল, ঘোড়দৌড়ের মাঠের প্রচণ্ড উত্তেজনায় কাটিয়ে, বোধ করি, রাতের আসর জমাতে তাদের কর্মশক্তির অভাব হ'ত।

একদিন স্কুলে যেতেই দীর্ঘ পঁয়ষট্টি দিন অনশনের পর বিপ্লবী যতীন দাসের মৃত্যুর প্রতিবাদে ছুটি ঘোষণা হ'ল। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলাম। দেখি মা-র রান্নাঘরের মেঝেতে আমার ন'দা যন্ত্রণায় একটি কাটা মুরগীর মতো ছটফট্ ক'রে গড়াগড়ি খাচ্ছে। মা তার গলা দিয়ে গেলাসে-গেলাসে নুনজল ঢেলে দিচ্ছেন। সঙ্গে-সঙ্গেই তার হাত-পাগুলো উন্মত্ত ঢাক-বাজিয়ের কাঠির মতো মেঝেতে দাপাদাপি ক'রে উঠছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার পেটের ভেতর থেকে, ঘোলের মতো মন্থিত হয়ে রাশি-রাশি তরল পদার্থ বেরুতে থাকল। তার থেকে মেথিলেটেড স্পিরিটের দুর্গন্ধ উঠে এক চিলতে রান্নাঘরটির নিচু টিনের চালাটিতে ধাক্কা খেয়ে, সারা ঘরটির বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। ছোটো ভাইবোনদের জিজ্ঞেস করার সঙ্গে-সঙ্গেই জানা গেল যে, মা-র কাছে অন্যায় অর্থের দাবি অগ্রাহ্য হওয়ায় পুরো এক বোতল স্পিরিট খেয়ে ন'দা এই তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়েছে।

তখন পৌষ মাস। সংক্রান্তির আর কয়েকদিন মাত্র বাকি। এ-সময় গোটা ঢাকা শহরের আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই ঘুড়ি-ওড়ানোয় মেতে ওঠে। প্রত্যেক বাড়ির ছাদে, দুপুরবেলায়, স্ত্রী-পুরুষদের ভিড় জমে। এমন-কি আমাদের পাড়ার সংলগ্ন বারবনিতাদের ছাদেও।

একদিন ন'দা আমাকে আহ্লাদ ক'রে আমার হাত ধ'রে এই সংলগ্ন পাড়ার দিকে টেনে নিয়ে গেল। লাল ইটের তেতলা একটি পুরোনো বাড়িতে প্রবেশ করলাম। উঠোনে, বারান্দায়, ছাদে, নানা বয়েসের মেয়েদের ভিড়। চেহারায় কেউ সরস, আবার কেউ চলনসই। সাদর সম্ভাষণ এবং মুচকি হাসির বিনিময় দেখে ন'দার সঙ্গে যে এ-বাড়ির বাসিন্দাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, এ-তথ্যটি আমার মতো বালকের চোখেও স্পষ্ট হয়ে উঠল। সোজাসুজি তেতলার ছাদে গিয়ে উঠলাম। সেখানে ছাদের কার্নিশে ব'সে ফুটফুটে একটি যুবতী গোল ফ্রেমে একটি সাদা রুমাল এঁটে, 'ভালোবাসাই পরম সুখ' এ-কথাটি রঙিন সুতোর ফোঁড়ে তুলছে। কথাটির দু'পাশে ফুল এবং লতাপাতার গুচ্ছ পেন্সিলে আঁকা। একটি ফুলে ডানা-মেলা প্রজাপতি বসেছে। মেয়েটির ডাগর চোখদুটি কাজল দিয়ে ঘেরা। নিঃশব্দ একটি মধুর হাসিতে আমাকে মুগ্ধ ক'রে দিল। তার ভাই ধীরা, অর্থাৎ ধীরেন,

গোলাপী মাঞ্জাব সুতোয় ভরা একটি মস্ত বড়ো লক্ষ্ণৌই লাটাই হাতে সাদাকালো 'মুখপোড়া' একটি ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। ধীরা ন'দারই সমবয়সী এবং ইয়ার। তার হাত থেকে লাটাইটি তুলে নিয়ে আমার হাতে তুলে দিল। আমার উত্তেজনা দেখে কে! এ-রকম লাটাই আর সুতো শুধু নবাববাড়ির লোকদের হাতেই দেখেছি।

ঘুড়ি ওড়াবার এবং প্যাঁচ লড়বার সবরকম কারিগরি ন'দার নখদর্পণে ছিল। একটি ঘুড়ির সাহায্যে কুড়ি-পঁচিশটি ঘুড়ি কেটে দিয়ে অপরাজিত থাকা তার পক্ষে একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। একেকদিন আশেপাশে প্যাঁচ লড়বার মতো ঘুড়ির অভাবে নিজের ঘুড়িটি নামিয়ে নবাববাড়ির গম্বুজে উপবিষ্ট পায়রাদের উড়িয়ে দিত। আকাশের এক কোণ থেকে আরেক কোণ অব্দি তাদের তাড়া ক'রে নিয়ে যেত। আবার সেদিক থেকে তাড়া ক'রে অন্যদিকে ভাগিয়ে দিয়ে পায়রাদের অযথা বিশ্রীরকম হেনস্তা করত। কোনো-কোনো দিন অলস দুপুরে, চিল-শকুনেরাও তার এইধরনের শয়তানী বুদ্ধির শিকার হ'ত।

সেদিন রবিবার। পৌষের বাতাস ঠিক ধীরাদের ছাদের দিকেই বইছে। আগের দিনের মতোই তাদের ছাদের কার্নিশে সেই মেয়েটি সেলাই নিয়ে মগ্ন। গায়ে লাল টকটকে একটি শাড়ি। তার কালোজাম-রঙের চুলগুলো ওপরের দিকে তুলে নিয়ে খুব আঁট ক'রে মাথায় মস্ত একটি খোঁপা বেঁধেছে। তার নিটোল লম্বা গলাটি পৌষের মোলায়েম রোদে অবিকল একটি সোনার গেলাসের মতো ঝকঝক করছে। ন'দা তার ঘুড়িটি এক গোত্তায় ধীরাদের ছাদের কাছে নামিয়ে আনল। মুখে দুষ্টুমিভরা হাসি। তার উদ্দেশ্য কী আমি কিছুই তার হদিশ পাই না। দেখি ন'দা সুতো ছেড়ে দিয়ে মেয়েটির মাথা ছাপিয়ে ঘুড়িটাকে আরো খানিকটা এগিয়ে নিয়ে গেল। কুচকুচে কালো ঘুড়িটি সিঁদুরে-রঙের শাড়িটির কাছাকাছি আসতেই লাল পোশাকটি জলজ্বল করে উঠল। ঘুড়িটি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চক্রাকারে ঘুরছে। প্রায় ছাদের সঙ্গে লাগে আর-কী। মেয়েটি মাথা নিচু ক'রে সেলাইয়ে মশগুল। ঠিক এমনসময় ন'দা তড়িত বেগে পেছনে হটতে-হটতে লাটাইয়ে ঘন-ঘন চাটি মারল। সঙ্গে-সঙ্গেই সুতোর টানে সুন্দরী মেয়েটির খোঁপা খুলে গিয়ে তার রাশি-রাশি ঘন চুল একটি নীল ঝর্নার মতো পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। হকচকিয়ে উঠে, এদিক-ওদিক তাকাতেই যেই-না ন'দার সঙ্গে চোখোচোখি হ'ল এক অফুরন্ত হাসির কলধ্বনিতে আমাদের পাড়াটি মুখর হয়ে উঠল। 'ভালোবাসাই পরম সুখ' এই কথাটি ন'দার ঘুড়ির মতোই আমাদের জিন্দাবাহার গলির সংকীর্ণ আকাশটিতে অনেকক্ষণ ধ'রে পাক খেতে থাকল।

এখন বেলা প্রায় একটা। স্নানাদি সেরে সেজদা ভেজা গামছা প'রে পুবের দেয়ালের তাকে রাখা দক্ষিণেশ্বরের শ্রীশ্রীকালী মায়ের ছবিটির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। চোখ অর্ধনিমীলিত। হাতে পুষ্পাঞ্জলি। ভক্তির এই প্রতিমূর্তি কৃপাময়ীর কাছে বিড়বিড় ক'রে কত প্রার্থনাই-যে করে তার ইয়ত্তা নেই।

একদিন মহামায়া তার শক্তির পরীক্ষা নিলেন। আমার এ- জ্যেষ্ঠভ্রাতাটি মাঝে-মাঝে অর্শের যন্ত্রণায় ভোগে। একবার সেই যন্ত্রণা অস্বাভাবিক রকম বেড়ে গিয়ে তাকে শয্যাশায়ী হতে হ'ল। যার ক্রোধ এবং প্রহারের ভয়ে আমরা সবাই সন্ত্রস্ত থাকতাম, তাকেই একটি অসহায় শিশুর মতো হাউহাউ ক'রে কাঁদতে দেখা গেল। চাঁদসী, হোমিওপ্যাথি, অ্যালোপ্যাথি, কবিরাজি, হাকিমি—কোনো দাওয়াই আর বাকি রইল না। অগত্যা আমাদের বাড়ির সংলগ্ন কালীবাড়িতে সন্দেশের ভোগ পাঠিয়ে, তাড়াতাড়ি ব্যথাব উপশমের জন্যে প্রার্থনা জানানো হ'ল। মায়ের শ্রীচরণামৃত খেয়ে আশীর্বাদের রক্তজবা ফুলটি অনেকক্ষণ ধ'রে মাথায় ঠেকিয়ে রাখল। তাতেও কোনো আরামের লক্ষণ দেখা গেল না। তাক থেকে দক্ষিণেশ্বরীর ছবিটি নামিয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক নাগাদ তার শিয়রে রাখা হ'ল। দাদা থেকে-থেকে সে-ছবিটিতে মাথা ঠুকছে। কিন্তু যন্ত্রণা ক্রমশই বাড়তির দিকে গেল। এই কারণে তার চিৎকার-চেঁচামেচিও একই অনুপাতে বাড়তে থাকল। এভাবে একটি পুরো রাত এবং একটি পুরো দিন কাটল। তার হুকুম তামিল করায় এবং তার সেবায়, আমরা সবাই অস্থির। বাড়িশুদ্ধ লোক তটস্থ।

রাত তখন দশটা কি এগারোটা হবে। রাস্তাঘাটে গাড়ি-ঘোড়ার চলাচল এবং লোকজনের যাতায়াত প্রায় নেই বললেই চলে। শুধু মির্জাসাহেবের আস্তাবলের একটা ঘোড়া মাঝে-মাঝে চিঁ-হিঁ-হিঁ ক'রে উঠছে। দর্জি হাফিজ মিঞার খ্যাকর-খ্যাকর আওয়াজও দু-একবার কানে আসে। আমাদের গলির ল্যাম্প-পোস্টের কেরোসিনের আলোগুলো প্রায় নিষ্প্রভ। সেজদার গোঙানি এবং ছটফটা-নিতে মা-র রান্নাবান্না শিকেয় উঠেছে। আমরা সবাই দাদার বিছানার চারপাশে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ সেজদার বোজা চোখদুটি খুলে গেল। নিশ্বাস ঘন। এক অস্বাভাবিক ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে ব'সে বালিশ এবং পাশবালিশগুলো একের পর এক আমাদের দিকে ছুঁড়ে মারল। বিছানার থেকে তিড়িং ক'রে লাফ দিয়ে উঠে যে-ছবিটি এতক্ষণ তার মাথার কাছে ছিল, সেটিকে দু-হাত দিয়ে তুলে উঁচিয়ে ধরল। গালি-গালাজের বন্যায় মহামায়াও তখন ভেসে গেছেন। সিঁদুর এবং চন্দন-মাথা সে-ছবিটি আছাড় খেয়ে ভেঙেচুরে, গুঁড়িয়ে, অণুপরমাণুতে পরিণত হয়ে, গোটা

মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের সবাইকে, এমন-কি মাকেও ঘর থেকে বের ক'রে দিল।

আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতাদের মধ্যে আত্মবিনাশের একটা অস্বাভাবিক প্রবণতা দেখেছি। এই প্রবণতার ফলে, তাদের হৃদয় হয়ে উঠল যেন আসুরী বৃত্তিসমূহের একটি গুদামঘর। কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, মীন, ভৃঙ্গ—প্রত্যেকের একটি ইন্দ্রিয় প্রবল ব'লে এরা অকালেই প্রাণ হারায়। আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতারাও একের পর এক, তাদের ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির জন্যে ভোগ-বিলাসময় জীবন-যাপনে, অকালে তাদের চরম পরিণতির দিকে ক্রমশই এগিয়ে যেতে থাকল।

যে-মায়ের অদৃষ্টে পর-পর তিন-চারটি জ্যেষ্ঠপুত্রদের এই মর্মান্তিক পরিণতির নীরব দর্শক হওয়া লেখা থাকে, সে-মায়ের হৃদয়ের সংবেদনশীলতা এবং আবেগান্বিত হবার শক্তি ক্রমশ শুকিয়ে পাথর-চাপা পড়ে যায়।

সেজদা অল্পবয়সেই একটি আফিমের দোকানের মালিকানা পেয়েছিলেন। সেকালের ঢাকায় আবগারি দোকানের মালিকদের মধ্যে আমার এই দাদা ছিল, খুব সম্ভবত, একমাত্র ব্যতিক্রম। এ-ধরনের দোকানদারিতে হিন্দু মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ মোটেই সায় দিত না। তার এই মালিকানার পেছনে একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ছিল ব'লে শুনেছি।

বাবার মৃত্যুর অল্পকালের মধ্যেই মদ এবং জুয়ার নেশা একটি ভূতের মতো এমনই তাকে আঁকড়ে ধরেছিল যে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, সে-ভূত তার ঘাড় থেকে আর নামেনি। যেখানে এই দুই ভূতের সহ-অবস্থান সেখানে এদের স্বাভাবিক তৃতীয় সঙ্গী, কামের মিলন অনিবার্য। এ-তিনটির পরিতৃপ্তির জন্যে অবিরাম যে-পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, সে-পরিমাণ কেন, তার এক-শতাংশ উপার্জন করবার ক্ষমতা কিংবা ইচ্ছে, তার ছিল না। এ-ধরনের লোকেরা, এই অর্থ জোগাড় করবার জন্যে, যে-কোনো উপায়ই অবলম্বন করতে মরিয়া হয়ে ওঠে।

উনিশশো বত্রিশ-তেত্রিশ সালের কথা। ঢাকা জেলা তথা সারা পূর্ববঙ্গে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির জোয়ার বইছে। পাড়ায়-পাড়ায় ছাত্রদের বিপ্লবী দল গ'ড়ে উঠেছে। সে-সময় এমন হিন্দু মধ্যবিত্ত খুব কম পরিবারই ছিল, যে-পরিবারের কোনো-না-কোনো ছেলে, এই রাজনীতির সংক্রমণ থেকে রেহাই পেয়েছিল। আমার সেজদাও তার ছাত্রাবস্থায় স্বামী বিবেকানন্দের দেশাত্মবোধে এবং নৈতিক দর্শনে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিল। পরনে তার খদ্দরের ধুতি-চাদর এবং খালি পা। নিয়মিত গীতাপাঠ, ব্যায়াম, স্পোর্টস, খেলাধুলো এবং পড়াশুনা ছিল

তার দৈনন্দিন কর্মসূচী। এ-সব ব্যাপার পরিচালনায়, তার নেতৃত্বের যোগ্যতাও নেহাৎ কম ছিল না। তাছাড়া, গানবাজনার দিকেও তার বেশ ঝোঁক ছিল। মেয়েদের দিকে তার মনোভাব ছিল অত্যন্ত সংযমশীল। সিগারেট পান বিড়ি এ-সবই ছিল তার কাছে অস্পৃশ্য।

একদিন সেজদা আমাকে তেতলার ঘরের একান্তে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করল যে, সন্ত্রাসবাদী দলের কোনো ছেলেদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে কি না। এ-ঘটনার অল্প কিছুদিন আগে পাড়ায় গুজব শুনেছি যে পুলিশের সঙ্গে দাদার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। এমন-কি আমার স্কুলের দু-একজন সহপাঠীও আমাকে এ-সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রে অত্যন্ত লজ্জায় ফেলেছিল। পরে শুনেছি যে, তখনকার বাংলার লাট অ্যাণ্ডারসন্ সাহেবকে দার্জিলিং-এ হত্যা করবার বিফল চেষ্টায় আমার চতুর্থ ভ্রাতা এবং তার দলের কয়েকটি ছেলের গ্রেপ্তারের ব্যাপারে সেজদা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল। এ চতুর্থ ভ্রাতার পরবর্তীকালে রাজসাক্ষী হওয়া, জেল থেকে তার মুক্তি এবং দুটি আবগারি লাইসেন্সের সরকারি পুরস্কার পাবার ব্যাপারে, সেজদার ভূমিকাও কম ছিল না। এ-ধরনের সরকারি সেবায় সেজদা নাকি বেশ কিছুদিন আগে থেকেই নিযুক্ত ছিল। তাই সরকার নিতান্তই খুশি হয়ে, তাকে আফিমের দোকানটি বিনামূল্যে উপহার দিয়েছিল।

সরকারি বিধি অনুসারে সেজদাকে প্রত্যেক সপ্তাহে নগদ টাকায় কয়েক সের আফিমের মজুত কিনতে হয়। এ-টাকা তার দোকানের বিক্রির টাকা থেকেই সঞ্চয় করবার কথা। শুনেছি বিনা পরিশ্রমে, বিনা ঝুঁকিতে আবগারি ব্যাবসার জুড়ি নেই। কিন্তু তিন-তাসের আড্ডায়, ঘোড়দৌড়ের মাঠে এবং যাবতীয় আনুষাঙ্গিকের ব্যয়ে, এ-টাকার প্রায়ই ঘাটতি পড়ত। ধারে কর্জে সে নাক অব্দি ডুবেছিল। কাবুলিওয়ালা ছাড়াও আরো অন্য পাওনাদারেরা এসে আমাদের বাড়ির সুমুখে ভিড় জমাত। তারা বিশ্রী গালিগালাজ করতে এতটুকুও কসুর করত না।

একদিন বিকেলে খেলাধুলো ক'রে বাড়ি ফিরে দেখি সেজদা আরেক তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়েছে। মা খাটে ব'সে আছেন। দাদা তার দু-পা ধ'রে সজল নয়নে অনুনয়-বিনয় করছে। মুক্তিপণ না-মেটানো পর্যন্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের মাকে এভাবে বন্দী রাখতে আমরা, কনিষ্ঠরা, এতবার দেখেছি যে, এ-ধরনের নাটকীয় ঘটনা আমাদের পারিবারিক দৈনন্দিন জীবনধারার একটা স্বাভাবিক অঙ্গ ব'লেই ধ'রে নিতে অভ্যস্ত হয়েছিলাম। তাহলেও এ-অভিজ্ঞতা, মায়ের পক্ষে তো বটেই,

আমাদের পক্ষেও কোনো বিচারেই সুখপ্রদ ব'লে ধরে নেওয়া যায় না। সেজদার দাবি যে, মাকে তাঁর গয়না বিক্রি ক'রে অবিলম্বে দু-হাজার টাকার ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে। সে-টাকায় তাকে তক্ষুনি দোকানের জন্যে, 'মালের' মজুত কিনে না-রাখলে তার আবগারি লাইসেন্স নাকি বাতিল হয়ে যাবে। মা একটি পাথরের মূর্তির মতো নীরব এবং নিশ্চল। চোখ ঈষৎ ঘোলাটে। অপলক ভাবশূন্য দৃষ্টি সামনের দেওয়ালের দিকে সম্বদ্ধ। মায়ের পায়ে লুটিয়ে, তীব্র নিষাদে, সকরুণ স্বরে, তেইশ-চব্বিশ বছরের তরতাজা একটি মরদ এমনই বিশ্রী কান্না জুড়ে দিল, অন্তত আমার কানে সে-সংগীত সুষুপ্ত মধ্যরাতের কুকুরের কান্নার চাইতেও বিকট লাগল। যে-মানুষ তার ইন্দ্রিয়লালসার তৃপ্তির জন্যে তার মাকে থেকে-থেকেই নির্দয় এবং নির্লজ্জভাবে লাঞ্ছনা দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিতবোধ করে না, সে-মানুষের প্রতি সহানুভূতি তো দূরের কথা, রাগে এবং দুঃখে বুক খণ্ড-খণ্ড হয়ে যায়। মাতৃত্বের গৌরব, তাঁর অন্তরের সঞ্চিত গভীর বিষাদ এবং তিক্ততার গরলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এভাবে কয়েক মিনিট কাটাবার পর সেজোবাবু, হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পাঁড় জুয়াড়ির মতো, তার তুরুপের তাসটি বের করল। বুক-পকেট থেকে অয়েল পেপারের একটি ছোট্ট মোড়ক বের ক'রে তার থেকে সেই কালো মার্বেলটির মতো একটি গুলি বের করবার সঙ্গে-সঙ্গে মা, অর্ধ-অচৈতন্য অবস্থায় একটি যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো খাট থেকে উঠে, বড়ো আলমারিটির দিকে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেলেন। পা যেন আর নড়ছে না। তাঁর গায়ে বিধবার শুভ্র পোশাকটি ধিক্কার এবং কলঙ্কের কালো পোশাক হয়ে মেঝেতে গড়াগড়ি খেতে থাকল। আলমারি থেকে গয়নার বাক্সটি বের ক'রে মা খাটের ওপর রেখে দিলেন। তারপর, সিঁড়ির দেয়াল ধ'রে, তেতলায় তাঁর পুজোর ঘরের দিকে আস্তে-আস্তে নিজেকে টেনে নিয়ে গেলেন।

আমার ন'দাকে কয়েকদিন থেকেই বেশ সেজেগুজে, সকাল-সকাল রোয়াকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। ব্যাপারখানা কী জানবার জন্যে আমার মন আঁকুপাঁকু করে। যে-লোক রাতের অন্ধকার ঘন হবার সঙ্গে-সঙ্গে সক্রিয় হয়ে ওঠে, তার সাত-সকালে উঠে এখানে দাঁড়াবার নিশ্চয়ই একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে।

ফাল্গুনের সকাল। নিশি মোক্তারের বাড়ির ছাদের রেলিঙের ভেতর দিয়ে রোদ চুঁইয়ে এসে আমাদের রোয়াকে আলোছায়ার চমৎকার একটি নক্সা কেটেছে। সংলগ্ন কালীবাড়ির ছাদের রুদ্ধ নর্দমাটির মুখে বর্ষার যে লাউ গাছটি প্রকৃতির ধ্বজা তুলে দাঁড়িয়েছিল, বুড়িগঙ্গার বুক থেকে ওঠা হাল্কা বাতাসে, তার

ডগাগুলো ঈষৎ দুলে উঠল। হরিমতি বাঈজির ঘরটি আমাদের বারান্দা থেকে পরিষ্কারই দেখা যায়। প্রতিদিনের অভ্যেসমতো ভৈরবী রাগে গান ধরেছেন, 'রসিয়া তোরি আঁখিয়ারে, জিয়া লালচায়'। ঠুংরি ঠাটের গানের এ-কলিটির সুরের মাধুর্যে আমাদের জিন্দাবাহার গলিটি কানায়-কানায় ভ'রে উঠেছে। হাফিজ মিঞার কয়েকটি মরদ পায়রা বুক ফুলিয়ে বাক্‌বাকুম্-কুম, বাক্‌বাকুম-কুম আওয়াজে তার ছাদটি গম্‌গম্ ক'রে তুলছে। ন'দা থেকে-থেকেই গলা বাড়িয়ে গলির মুখের দিকে কী যেন দেখবার চেষ্টা করে। গায়ে তার সদ্য ইস্ত্রি-করা প্রিয় সিল্কের সার্ট। সার্টের কলারটি অর্ধচন্দ্রাকারে উঠে, ঘাড় থেকে নেমে, উড়ন্ত বকের ডানার মতো কাঁধ অব্দি নেমে এসেছে। একটু পর-পরই রুমাল দিয়ে মুছে মুখটি পালিশ ক'রে নিচ্ছে।

আমাদের পাড়ার বারবনিতারা প্রতিদিন সকালে দল বেঁধে বুড়িগঙ্গায় স্নান করতে যায়। তাদের স্নানে যাবার পথটি আমাদের বাড়ির সামনে দিয়েই। ভেজা কাপড়ে ফেরবার পথে কালীমন্দিরের দরজায় প্রণাম ক'রে আমাদের গলির মুখে আবার দেখা দেয়। সকালবেলার এই মনোরম দৃশ্যটি আমাদের পাড়ার পুরুষদের চোখকে বেশ তৃপ্তি দেয়। তাদের মন-মেজাজ খোশ রাখে। দিনটি ভালো কাটে।

তাদের আগমনের সঙ্গে-সঙ্গেই ন'দাকে অসম্ভব চঞ্চল হয়ে উঠতে দেখা গেল। তার দৃষ্টি সদ্যোস্নাত তরুণীদের প্রথম সারির মাঝখানে। সেখানে ষোলো-সতেরো বছরের একটি মেয়ে। এটিকে আমি এর আগে কখনও দেখিনি। গড়পড়তা মেয়েদের তুলনায় বেশ লম্বাই বলা যায়। মুখটি অবিকল একটি লিচুর মতো গোল। থুতনিটি ঈষৎ তীক্ষ্ণ। ঠোঁটদুটি যেন রসালো দুটি কমলালেবুর কোয়া। তার নাকের ছোট্ট পাটাদুটি প্রতিটি নিশ্বাসের সঙ্গে ফুলে-ফুলে উঠছে। গোটা শরীরটি যেন মুর্শিদাবাদী রেশম দিয়ে মোড়া। এমনই মসৃণ এবং চক্‌চকে তার ত্বক। পাকা পাতিলেবুর গায়ে, হাল্কা গোলাপী রঙের পোঁচে যে রঙের মিশ্রণ হয়, ঠিক তেমনি তার গায়ের রঙটি। তার নীল-কালো চোখদুটি যেন স্তম্ভিত মেঘ —মুখের অর্ধেকটাই জুড়ে আছে। শাস্ত্রে বলে, 'বিহঙ্গের সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ আছে বলিয়াই তো বিহঙ্গী সুন্দর হইয়াছে। ময়ূরও সেই সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগী বলিয়াই তো প্রকৃতি ময়ূরীকে সুন্দর করিয়াছেন। চম্পক অঙ্গুলি ও খঞ্জন নয়নের প্রতি পুরুষের অনুরাগ থাকায় নারীজাতি চম্পক ও খঞ্জন নয়নের অধিকারিণী হইয়াছেন।'

ভেজা কাপড় মেয়েটির গায়ে লেপ্টে থাকার দরুন তার শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ যেন একটি ফুলের বিভিন্ন পাপড়ির মতো আলাদা সত্তা নিয়ে সরল বৃন্তটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। একেকটি পাপড়িই যেন একেকটি ফুল। বাকি মেয়ে-ক'টির মতো তার কাঁখেও বুড়িগঙ্গার জলে ভরা পেতলের কলসী। এই কলসী এবং নিতম্ব, দুই-ই মিশে একাকার হয়ে আছে। দুই-ই টলমল। এমনই সুন্দর সাবলীল এবং বেপরোয়া তার চলার ভঙ্গি যে মনে হয় কোনো নিঃশব্দ সংগীতের সঙ্গে তাল রেখে পা ফেলছে বা এ-পা-ফেলার ঢং যে কোনো ওস্তাদ নর্তক-নর্তকীর ঈর্ষার বস্তু হতে পারে তাতে আর সন্দেহ কী। এই চালে দুটি সোনার বাটির মতো তার বক্ষস্থল ঈষৎ নেচে উঠছে। আরেকটু নাচলেই হয়তো, করতালের মতো বেজে উঠবে। যে-মেয়ের উদ্ভাসিত রূপ পৃথিবীর তাবৎ পুরুষদের সমস্ত সূর্য-কিরণকে সজীব ক'রে তোলে, তার কোথা থেকেই-বা শুরু করি, আর কোথায়ই-বা শেষ করি। একই দেহে একই সঙ্গে এত রূপ দেখবার পক্ষে বিধাতা পুরুষদের দুটিমাত্র চোখ দিয়ে যেন বিশেষ অবিচার করেছেন কারণ, একদিক দেখতে গিয়ে যে আরেকদিক বাদ প'ড়ে যায়। তাই এক কথায় বলি, এ-যুগের রাধা। পরে শুনেছিলাম যে, তার মা নাকি তাকে সত্যি-সত্যিই হরিদাসী ব'লে ডাকত। জমিদারপুত্র, বিশ্ববিখ্যাত সাঁতারু থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বিশেষ অবদান আছে, এমন লেখক এবং কবিদেরও হরিদাসীর দাস হতে দেখেছি।

হরিদাসীর নাকে একটি নথ্। সেটিতে দুটি ছোট্ট মুক্তো বসানো। ফাল্গুনের সকালের আলোয় এ-মুক্তো ঠিক দুটি বেদানার দানার মতো ঝক্‌ঝক্ ক'রে উঠেছে। বারবনিতাদের ভাষায় ষোলো-সতেরো বছরের মেয়ের নাকে এই নথ্ নাকি অক্ষতযোনির পরিচায়ক।

হরিদাসীদের দল ইতিমধ্যে আমাদের বাড়ির দিকে এগুচ্ছে। ন'দার ছট্‌-ফটানিও বেশ বাড়ছে। সার্টের কলারটি আরেকবার উঁচিয়ে দিয়ে পকেট থেকে চিরুনি বের ক'রে চুলটা ব্যাকব্রাশ ক'রে নিল। হরিদাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্যে দু-তিন বার চাপা কাশি দেয়। তারপর, পকেট থেকে একটি সিকি বের করে। হরিদাসী প্রায় আমাদের বাড়ির সুমুখে এসে পৌঁচেছে, ঠিক এমনসময় সিকিটি ন'দার হাত থেকে ফস্কে গিয়ে গড়াতে-গড়াতে হরিদাসীর পায়ের কাছে গিয়ে থামল। ন'দার হাতের সাফাই দেখে আমি হতভম্ব। তাড়াতাড়ি রোয়াক থেকে নেমে সিকিটি তুলতে গিয়ে হরিদাসীর সঙ্গে চোখা-চোখি হ'ল।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেকার কথা। সেদিন অমাবস্যা। শালপাতার একটি ঠোঙায় সাদা বাতাসা এবং ছানার মুড়কি সাজিয়ে মা আমাকে কালীবাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। মন্দিরের দরজায় বারবনিতাদের ভিড়। তাদের মধ্যে একটি মেয়ে প্রবেশপথের চৌকাঠে মাথা ছুঁয়ে সামনের দিকে মুখ ফেরাল। দেখি সেই পাকা লিচুর মতো মুখটি। নাকে নথ্ নেই।

সেদিন শনিবার। বিকেল প্রায় সাড়ে-পাঁচটা বাজে। একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে আমাদের বাড়ির দরজায় দাঁড়াল। সেজদা গাড়ি থেকে নেমে কোচোয়ানকে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে, অতিরিক্ত একটাকা বকৃশিশ দিল। সেজোবাবুর চোখেমুখে খুশি যেন আর ধরছে না। আমার বুঝতে কোনোই অসুবিধে হ'ল না যে, ঘোড়দৌড়ের মাঠে আজ বেশ মোটারকম একটি অঙ্কের আয় হয়েছে। জামা-কাপড় ছেড়ে স্নানের ঘরে ঢুকে 'ও আমার বাদল মঞ্জরী' গানের কলিটি গুন-গুনিয়ে গাইতে থাকল। বেরিয়ে এসে করিম খান্‌সামার দোকান থেকে মাটন্ কাটলেট আর পরোটা আনবার জন্যে আমাকে পাঠিয়ে দিল। জলখাবার খেয়ে পাটকরা ধুতি, সাদা সার্ট আর প্রাসিয়ান্ কাটের সাদা জুতো প'রে গানের কলিটি ভাঁজতে-ভাঁজতে সেজোবাবু তাদের ক্লাবের দিকে রওনা দিল। ন'বাবুও তার জামাকাপড় ইস্ত্রি মেরে স্নান সারল। তারও মুখখানিতে আজ বেশ খুশি-খুশি ভাব। আয়নার সামনে অনেকক্ষণ ধ'রে পাউডার-ক্রীমের প্রসাধন সেরে হাতে একটি বেলফুলের মালা ঝুলিয়ে, হরিদাসীদের পাড়ার দিকে চ'লে গেল।

সেন-পরিবারের সবার মধ্যে ক্রোধের বৃত্তিটি একটু বেশিই প্রবল ছিল বলা যায়। ব্যক্তিবিশেষে, শুধু ডিগ্রির এবং বাহ্যিক প্রকাশভঙ্গির যা তফাৎ। কিন্তু এ-ব্যাপারে সেজোবাবুর জুড়ি মেলা মুস্কিল। বিধাতা যেন মুক্তহস্তে তাকে এ-বৃত্তির একটি কালো মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন।

রাত্রি তখন দুটো কি তিনটে। ঢাকা শহরের নিস্তব্ধ শব্দসমুদ্রে বিরাট ঢেউ তুলে দিয়ে একটি বিকট চিৎকার আমাদের বাড়ির একতলা থেকে উঠে তেতলায় আমাদের শোবার ঘরে প্রবেশ করল। ভাগ্যক্রমে মা তখন বাড়ি ছিলেন না। তাঁর কনিষ্ঠ তিনটি সন্তানকে নিয়ে মাদারিপুরে তাঁর একমাত্র জীবিতা ভগ্নীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। আমি এবং আমার অগ্রজ, দু-জন এক বিছানায় ঘুমোচ্ছিলাম। সেই কানফাটা চিৎকারে আমরা দু-জনেই ধড়ফড় ক'রে উঠে বসলাম। একটু মনোযোগ দিয়ে শুনতেই বোঝা গেল সেজোবাবু ন'বাবুকে ধ'রে পেটাচ্ছে। আমরা দু-ভাই আতঙ্কে জড়সড়। রাত দুপুরে এ-মারপিট কিসের,

জানবার কৌতূহলে আমরা এক-পা, দু-পা ক'রে তিনতলায় সিঁড়িটির গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালাম। একতলায় তখন কুরুক্ষেত্র চলেছে। সেজোবাবুর তুলনায়, ন'বাবুর শরীরটিতে মাংসপেশীর বেশ অভাব ছিল। তাই হয়তো সেজোবাবুর হাতের লাঠিটি ন'বাবুর পিঠে একটি ঢিলে চামড়ার ঢাকের মতো ধপ্‌ধপ্‌ আওয়াজ করছে। ভ্যাপ্‌সা গরমে একটি বিশ্রী গন্ধ, একতলার স্যাঁতসেঁতে হাওয়ার সঙ্গে মিশে আমাদের সিঁড়ি বেয়ে উঠল। একটু মনোযোগ দিতেই বুঝতে আর বাকি রইল না যে, এ-দুর্গন্ধ সেজোবাবুর মুখ থেকে বেরুচ্ছে। গীতায় বলে যে, 'কাম, মন্যু ইত্যাদির সহচর ক্রোধ। ইহা অতি উগ্র। ইহার উদর কিছুতেই পূর্ণ হয় না। ইহা মানুষের পরম শত্রু।' বৈশাখের এই রাত্রে তার চরম রূপায়ণ দেখে অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়েছিলাম।

একদিকে সেজোবাবুর ক্রোধের চিৎকার, অন্যদিকে ন'বাবুর কান্নার চিৎকার, এ-দুই মিলে আমাদের দু-ভাইয়ের কাছে সে-রাত্রিটি একটি নরকসুলভ বিভীষিকা হয়ে উঠল, যার কথা মনে এলে আজও আমি সন্ত্রস্ত বোধ করি। চিৎকার চেঁচা-মেচি শুনে বৈমাত্র দাদারাও বাড়ির উত্তর খণ্ডের থেকে ছুটে এলেন। এল দু-জন পাড়াপড়শিও। সেজোবাবুর ক্রোধের মূর্তি দেখে কেউই তার দিকে এগুতে সাহস পেল না। প্রত্যেকটি লাঠির আঘাতের সঙ্গে ন'বাবু চিৎকার ক'রে বলছে, 'আমি নিইনি, আমি নিইনি'। এ-ঘটনার কয়েকদিনের পর শুনেছিলাম যে ন'বাবু সেজোবাবুর পকেট থেকে ঘোড়দৌড়ের মাঠে লাভ করা আয়ের একটি অংশ সরিয়ে ফেলেছিল। মার খেয়ে ছোটোভাই যখন আধমরা অবস্থায় নির্বাক হয়ে গেল, বড়োভাই তখন হাতের লাঠিটি দিয়ে দরজা, জানালা, টেবিল, চেয়ার, বাসন-কোসন্‌, সব লণ্ডভণ্ড ক'রে ফেলল। দোতলায় উঠে এসে ঠিক তেমনি এক তাণ্ডব করল। আমরা দু-ভাই তখন তেতলার ঘরে ঢুকে, দরজায় খিল্‌ মেরে এক কোণে কুঁকড়ে আছি। দোতলায় কাউকে না-দেখতে পেয়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে তেতলায় উঠে, আমাদের দরজায় লাথি মারল। চিৎকার ক'রে আমাদের ডাকল। সাড়া না-পেয়ে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকল। অন্ধকার ঘরটিতে আমরা দু-জন তখন মা-কে স্মরণ করছি। আবার কখনো ভগবানের কাছে আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছি। অন্ধকারে তার হাতের লাঠিটি দিয়ে আমাদের পড়ার টেবিলে বাড়ি দিতেই লাঠিটি দু-খণ্ড হয়ে গেল। স্বয়ং ভগবানেরই হোক, আর মা-র অদৃশ্য আশীর্বাদেই হোক, সে-রাত্রি, সেজোবাবু আমাদের ওপর গালিগালাজের শিলা-বৃষ্টি বর্ষণ ক'রেই ক্ষান্ত হ'ল।

পতনোন্মুখী মানুষ যে একদিন উর্ধ্বমুখী হ'তে পারে তার কথা বলতে গিয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব একটি অপার্থিব পাখির কথা বলতেন। যে-পাখি মহাশূন্যে উড়ে বেড়ায় এবং সেখানেই ডিম পাড়ে। সে-ডিম পৃথিবীর চুম্বক টানে বিদ্যুৎ-বেগে নিচের দিকে পড়তে থাকে। পৃথিবীর সংঘাতে টুকরো-টুকরো হবার ঠিক আগেই ডিম থেকে পক্ষীশাবক ফুটে বেরিয়ে ডানা মেলে মহাকাশের দিকে ছুট দেয়। আমার এই ভায়েরা অন্ধকার পাতালের এমনই অতলে নেমে গিয়েছিল যে, আকাশের দিকে আর কোনোদিন মুখ তুলতে পারেনি।

হে অর্জুন

ঢাকা জেলায় আমাদের গ্রামের কথা মনে এলেই চোখের সামনে একটা অ্যাবস্ট্রাকট্ ছবি ফুটে ওঠে। আগাগোড়া সবুজ রঙ দিয়ে আঁকা। নানারকমের সবুজ থাকে-থাকে সাজানো। অনেকটা নাম-করা আধুনিক মার্কিনী আর্টিস্ট মার্ক রথকো-র আঁকা ছবির মতো। এক কথায় বলা যায় একটা সবুজের সমুদ্র। ভরা বর্ষা আর বসন্তে মনে হ'ত যেন সারা গ্রামটা এইমাত্র সবুজ আলোর পুকুরে ডুব দিয়ে উঠেছে। সব-কিছু যেন একটা সবুজ কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখছি, যেন সব-কিছু সবুজ সেলোফিনে মোড়া। কোনো-কোনো অচেতন মুহূর্তে মনে হয় যেন সূর্যটিও সবুজ। রোদের রঙটাও সবুজ। চারিদিকে এমনই সবুজের ছটা। আকাশের নীলের তলায় গাছপালার সবুজ, তার তলায় জলের নীল-সবুজ, পলিমাটির ছাই রঙের ওপর ঘাসের সবুজ, শ্যাওলার সবুজ, কচুরিপানার সবুজ, কচুপাতার সবুজ—কালো-সবুজ, নীল-সবুজ, গাঢ়-সবুজ, হলদে-সবুজ, এমারেল্ড-সবুজ, ওনিক্স-সবুজ, টার্কোয়াজি-সবুজ, চীনাজেডি-সবুজ, সবুজ-সবুজ, আরো-সবুজ—এক সবুজের সিম্ফনি। আঃ! সব ইন্দ্রিয়গুলো যেন সবুজের সংগীতে ঘুমিয়ে পড়ে।

আমাদের বাড়ির ত্রিসীমানার মধ্যে নানারকম গাছপালায়ও এই সবুজের ছড়াছড়ি। আম-জাম-কাঁঠালে, জারুল-জিয়লে, জামরুল আর তেঁতুল, গাব্-কদম-ডুমুরে, চাল্তা আর ফলসায়, কনকচাঁপা আর ডালিমে, সুপুরি আর নারকেলে—আরো যে কত অসংখ্য লতাপাতায়, তার হিসেব করা কঠিন। কিন্তু এদের সবাইকে বামন বানিয়ে ছাপিয়ে উঠেছিল আমাদের পুকুরের উত্তর-পুব কোণে একটা অর্জুন গাছ। জাতে ছিল সে বনস্পতি। এত বড়ো আর বিশাল যে, সে ছিল একাই একশো, একাই একটা বন।

জীবজগতের মতো গাছপালার জগতেও বোধহয় পুরুষ আর স্ত্রী আছে—কতকগুলো গাছ আছে যার ডাল-পাতায় সজ্জা, ফুলের চেহারা, গন্ধ, রঙ, সব মিলিয়ে খুব সাজগোজ করা সুন্দরী মেয়েদের কথা মনে করিয়ে দেয়। একটু
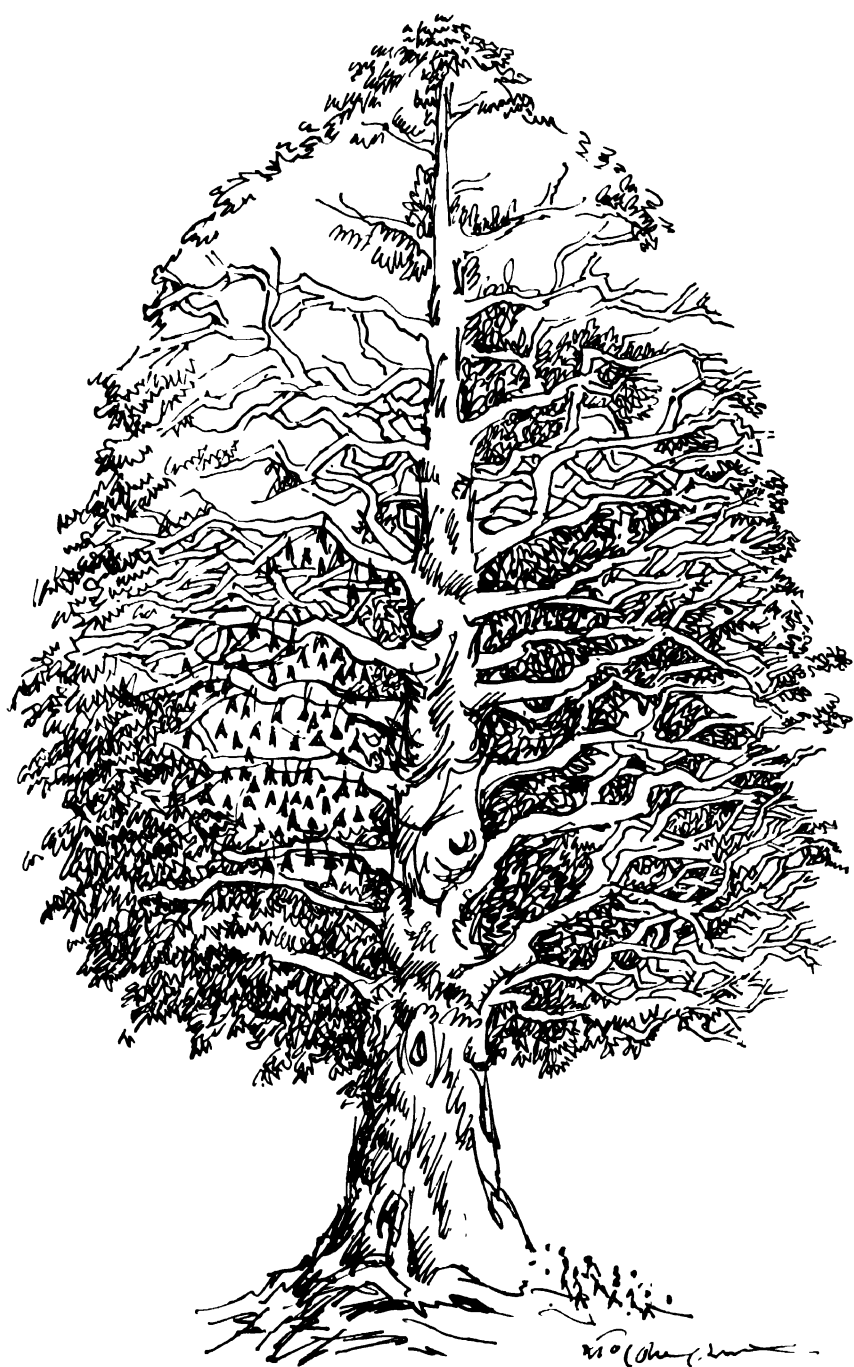
"হে অর্জুন"

হাওয়া লাগলেই কীরকম নাচের তালে দুলতে থাকে। ভরাযৌবনা মেয়েরা যেমন নিজের স্তনের ভারে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, এ-ধরনের গাছগুলোও তাদের ফলফুলের সম্ভারে তেমনি নুয়ে পড়ে। ওই তো। আমার ছাদে রক্ত-করবীটা বসন্তের হাওয়ায় কীরকম নাচছে আর ফুলের ভারে কীরকম ঝুঁকে পড়ছে। প্রায় ছাদ ছোঁয় আর-কী। আরো ওই-যে কলকে ফুলের গাছটা! সাদা-সাদা ফুলের ছাপ দেওয়া সবুজ শাড়িব ঘোমটা মাথায় লজ্জাবতী নতুন বউয়ের মতো মাথা নিচু ক'রে আছে! আর চাল্‌তা গাছের পাতাগুলোই-বা কী বাহারের। কে যেন একটা-একটা ক'রে ফুলের তোড়ার মতো সাজিয়ে রেখেছে। কী সুন্দর ইস্ত্রি-করা পাতার ভাঁজ। তেমনি তার শিরদাঁড়াগুলোর নিখুঁত সিমেট্রি। আর পাতার রঙটাই-বা কী চমৎকার—একেবারে খাঁটি ভ্যাট্-সিকস্‌টিনাইন্ বোতলের মতো গাঢ় সবুজ। আজারবাইজান্ নর্তকীর ফিন্‌ফিনে ওড়নার মতো কচি কলাপাতার কিংবা নিমপাতার ভেতর দিয়ে ভোরবেলার শরতের মোলায়েম সোনালী আলো কীবকম চুঁইয়ে আসে. একটু হাওয়া লাগলেই কী চমৎকার সবুজ-হলদে ঝাড়লণ্ঠনের মতো ঠিক্‌রে পড়ে—যত খুশি তাকিয়ে থাকি কিছুতেই ক্লান্তি আসে না।

আর ওই-যে দূরে হলদে রঙের বাড়িটার পাশে নারকেল গাছটা দেখা যাচ্ছে, তার পাশে ঠিক ঐ-রকম আর-একটি ছিল। হাওয়ার সাথে ছন্দ রেখে নাচ দেখাতে ওর জুড়ি এই শহরে খুব কমই ছিল। কালবৈশাখীর জন্যে সারা বছর যেন ব'সে থাকত। যেই-না ঝড় ওঠা তাকে আর ধ'রে রাখে কে? একবার এমনি এক ঝড়ের সন্ধ্যায় সামনে, পেছনে, নুয়ে-নুয়ে দোল খেতে-খেতে মটাশ্ ক'রে হঠাৎ ভেঙে দু-টুকরো হয়ে প'ড়ে গেল। ছোটোবেলায় আমাদের দাই জামিলার মা'র কাছে তখনকার ঢাকাব সবচেয়ে নাম-করা বাঈজি সুন্নৎবাঈব আশ্চর্য নাচের গল্প শুনেছি। ময়ূরীর গলার মতো সরু আর তেমনি নিটোল তার শরীর, হরিণীর মতো ত্রস্ত আর তেমনি ছিল তার চলন। হাড়গোড় বলতে কিছুই ছিল না। শরীরটাকে যেমন খুশি বাঁকাতে পারত। একবার জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শহরের বিত্তবান্ গন্ধবণিক নিমাইচাঁদ সাহার মজ্‌লিসে জয়সালমিরের কোনো নাম-করা বাঈজিকে ডাকা হয়েছিল। গোটা ঢাকা শহরে হৈ-হৈ-রৈ-রৈ ব্যাপার। তাই শুনে সুন্নৎবাঈ তেলেবেগুনে জ'লে ওঠে। একই আসরে দু-জনকে নাচবার দাওয়াত্ দেওয়া হ'ল। সুন্নৎবাঈ কিছুতেই রাজি হয় না, নানারকম নখ্‌রাবাজি করে। তারপর যখন নাচের আসরে কুর্নিশ করতে-করতে ঢুকল, পায়ে রাশি-

রাশি ঘুঙুর-পরা সত্ত্বেও একটা ঘুঙুরেরও আওয়াজ শোনা গেল না। যেন হাওয়ার ওপরে পা ফেলছে, একই সঙ্গে, নাটকীয়ভাবে সারেঙ্গি, তবলা আর ঘুঙুর ঝম্‌ঝম্‌ ক'রে বেজে উঠল। নাচতে-নাচতে তবলার বোলের সঙ্গে সুন্নৎ-বাঈ নিজেও মুখে বোল্‌ বলে আর সেই বোল্‌ পায়ে তোলে—

ধারি কিট্‌ মারি কিট্‌, তুন্‌ তুন্‌ থারি
বেঁধে কেটে, মেরে কেটে
দগমগ দগজগ
তেরে কিট্‌ মেরে চিট্‌
যা ধরিঙ্‌, তা ফরিঙ্‌ থুন্‌ গা
কিট্‌ কিট্‌ তাক্‌ তাক্‌
থারিক্‌ থারিক্‌ চিট্‌-পিট্‌ থাক্‌ থাক্‌
ঝিন্‌ কিট্‌ ফাঁকা ধালঙ্গ তাকা থেই

ষোলো মাত্রার বোল—তাকে চারবার রিপিট্‌ ক'রে চৌষট্টি মাত্রায় তোলে।

নাচিয়ে শুরুতে প্রথম লয়ে, তারপর মধ্যমে, শেষে ধীরে-ধীরে দ্রুতলয়ের দিকে এগুতে থাকে। নিজের উরুতে তালি বাজিয়ে তবলচিকে ইঙ্গিত করে লয় বাড়াতে। তবলচির আঙুল থেকে ফুলঝুরির মতো যেমন বোলের বৃষ্টি নামে তেমনি নামে নাচিয়ের পায়ে। সুন্নৎবাঈ আঙুল দিয়ে তুড়ি বাজিয়ে বাদ্যকরকে আবার ইশারা ক'রে বলে, 'লয় আউরভি বাঢ়াইয়ে।' সে এক তাজ্জব ব্যাপার। সভাশুদ্ধ লোকের চোখ ছানাবড়া। নাচঘরটা যেন এক বিরাট পেতলের জালা—সংগীতের আওয়াজ তার ভেতর থেকে গম্‌গম্‌ ক'রে বেরুচ্ছে। তারই স্পন্দনে ঝাড়লণ্ঠনের স্ফটিকগুলোও নড়ে-চড়ে, আর ঠুং-ঠাং বেজে ওঠে। সুর আর লয় দ্রুততর হতে-হতে এক সাংঘাতিক চরমে উঠল। সুন্নৎবাঈ তার সাপের মতো শরীরটাকে আস্তে-আস্তে পেছনের দিকে বাঁকাতে থাকে। এ-অবস্থায়ই ছোটো একজোড়া পাকা বাতাবি লেবুর মতো সুন্দর, মোলায়েম বক্ষস্থলকে এমনভাবে নাচাতে থাকে যেন ঝড়ে কচি বাঁশপাতা কাঁপছে। ওঠাচ্ছে আর নামাচ্ছে। ভেতর থেকে যেন কিছু উথলে পড়তে চাইছে। একচুল, দু-চুল ক'রে বাঁকাতে-বাঁকাতে মাথাটা এসে নিতম্বে ঠেকে আর-কী! ঠিক যেন একটি বকফুল। সদ্য তা-দেয়া ঢাকের চামড়ার মতোই পেট আর কোমরে অসম্ভব টান্‌ পড়েছে। বেদম্‌ হাততালি আর, 'বাহবাঃ, বাহবাঃ, কেয়া বাৎ, কেয়া বাৎ, মুকর্‌রর' চিৎকারে নাচঘর ফেটে পড়ল। কানে তালা লেগে যায় আর-কী। অত্যধিক

মিড়ের টানে সেতারের জোয়ারির তার যেমন ঝনাৎ ক'রে ছিঁড়ে যায়, তেমনি কোমর থেকে নাচিয়ের শরীরটা হঠাৎ দু-টুকরো হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ঐ নারকেল গাছটার মতো সুন্নৎবাঈও আর কোনোদিন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

হ্যাঁ, কী বলছিলাম! সেই অর্জুন গাছটার কথা। গ্রামের বাইরে—দক্ষিণে, উত্তরে, পশ্চিমে, পুবে—যতদূরই যাই-না কেন আমাদের বাড়ির দিকে তাকালেই দেখি দিগন্ত-বিস্তৃত সবুজের মধ্যে তার মাথা ঠিক উঁচিয়ে আছে। ঐ-গাছটির দিকে তাকিয়ে আমার মনে কেমন পাঁচমিশালি আবেগ আসে। একদিকে শান্তি আর আনন্দ, অন্যদিকে তেমন বিস্ময় আর ভয়। তার আশ্চর্য গড়ন আর ঋজু কাঠামো দেখে মনে হয় কোনো ওস্তাদ ইন্‌জিনিয়ারের হাতের সৃষ্টি। বাইরের এবং ভেতরকার খাড়া ও সমান্তরাল রেখার কী নিখুঁত সমন্বয়। তেমনই নিখুঁত তার ব্যালেন্স। সমস্ত গাছটাতেই, আপাদমস্তক ওজনের এমনই চমৎকার বিভাজন যে ম্যানহাটানের একশো আশি তলার বাড়ির মতো যত ইচ্ছে আকাশের দিকে বাড়িয়ে যাও। ঝড়-বৃষ্টি, ভূমিকম্প, এ-সবকিছুই তার গায়ে এতটুকু আঁচড়ও কাটতে পারবে না। মা-র কাছে গল্প শুনেছি যে ১৩২৫ সালে প্রলয়ের মতো এক সাংঘাতিক ঝড় উঠেছিল। সে-ঝড়ে ঢাকা জেলার বেশির-ভাগ গ্রামই নাকি মরুভূমির মতো উজাড় হয়ে যায়। কিন্তু অর্জুন গাছটা যেমন ছিল তেমনই রইল দাঁড়িয়ে—পাহাড়ের মতো সোজা আর নিশ্চল। এমনই তার স্থিতি আর গঠনসৌকর্য। এমনই তার আসুরিক শক্তি। অনেককাল আগে কিংকং-এর সিনেমা দেখেছিলাম। দেখে যেমন ভয় পেয়েছিলাম, হয়েছিলাম অবাক। কী বিরাট তার দেহ যেন দশ-বিশটা বেম্মোদৈত্যি একসঙ্গে হয়েছে। তাকে মারবার জন্যে কতরকম ফন্দি-ফিকিরই-না আঁটা হয়েছে—কামান, বন্দুক এরোপ্লেন, আরো কত-কী। কিংকং নিরুদ্‌বেগ, নির্বিকার। মশা-মাছির মতোই সামান্য বিরক্তিকর ভেবে সেগুলোকে হাতের মুঠোর মধ্যে ধ'রে পিষে ফেলছে। নিজের শক্তি এবং আয়তন সম্বন্ধে সে এতই সচেতন, এতই নিশ্চিন্ত, এতই দাম্ভিক, যে চারিদিকে যত ওলট-পালটই হোক-না কেন তাতে তার কিছু এসে-যায় না।

এই তো গেল গাছটির শক্তির কথা। এবার তার রূপ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা। শাস্ত্রে বলে 'রূপস্তু ষোড়শবিধম্'। অর্থাৎ রূপের আকার-প্রকার হ'ল ষোলো রকম। সেভাবে এ-গাছের রূপ বিশ্লেষণ করতে গেলে অনেক পাতা ফুরিয়ে যাবে।

সোজা কথায় বলি। যে-কোনো জিনিসের রূপের একটা প্রধান নিয়ম হ'ল তার মাপজোক। অর্থাৎ যাকে আমরা বলি প্রোপোরশান্। তা-ও, এক-এক দেশের এক-এক নিয়ম। মানুষের বেলায় তো সোজা নিয়ম আছে। তার নিজের হাতের সাড়ে-তিন হাত লম্বা, নিজের মুখমণ্ডল তারই নিজের এক বিঘত। সব মানুষের পক্ষেই মোটামুটিভাবে এই নিয়ম চলে। কিন্তু অর্জ্জুন গাছটার বেলায় কি করি? গাছের মাপজোক তো জানা নেই। তবুও দূর থেকে যখন গাছটাকে দেখি মনে হয় যেন শ্রবণবেল্‌গোলার গগনচুম্বী সেই বিরাট দিগম্বর মূর্তির মতোই নিখুঁত সুন্দর। যে-মাপজোকে ঐ-মূর্তি তৈরি হয়েছে, মনে প্রশ্ন জাগে, সে-পরিমাণেই কি বিধাতা একেও সৃষ্টি করেছেন? না কি নানা রঙ, নানা ডৌলের সংমিশ্রণে এই রূপজগৎকে সৃষ্টি করেছেন?

শাস্ত্রে এ-ও বলে যে মূর্তির গুণ তিনরকমের। উষার গোলাপী আলো যখন গাছের চূড়ায় এসে লাগে মনে হয় যেন বিরাট এক সাত্ত্বিক পুরুষ সটান হয়ে যোগে বসেছেন। হাতে বরাভয়। বসন্তে সেই আলো বর্শার ফলকের মতো কাঁচা, কচি পাতায় লেগে একটা স্বচ্ছ, সবুজ, দিব্যজ্যোতি মহাযোগীর মুখমণ্ডলের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আস্তে-আস্তে হাল্কা হয়ে আকাশের নীলের সঙ্গে মিশে যায়। কতকগুলো বুনো পায়রা তাঁর চারদিকে নানারকম ছন্দে উড়ে-উড়ে চক্কর কাটে। যেন প্রভাতের বন্দনা করছে। গাছের গোড়ায় শিশির-ভেজা সাদা আকন্দগুচ্ছ এই আলোর স্পর্শে ঝলমল করে। যোগীর শ্রীচরণে যেন ভক্তদের পুষ্পাঞ্জলি। বিকালের পড়ন্ত আলোতে তাঁকে মনে হয় রাজসিক—যেন তার রঙ-বেরঙের, নানারকম কারুকার্য-করা বাহনে দাঁড়িয়ে পশ্চিমের দিকে ছুটেছে। আর মধ্যাহ্নের কড়া চোখ-ধাঁধানো আলো যখন তাঁর মাথার ওপর আসে তখন ফুটে ওঠে তাঁর প্রচণ্ড উগ্র তামসিক মূর্তি—শুম্ভ, নিশুম্ভ, হিড়িম্বা, পুলোমা, বকাসুর—আকাশ, পাতাল, মর্তের সব রাক্ষস-দৈত্যদের সঙ্গে লড়াই করতে যাচ্ছে।

'সর্ব্বং মনোরমা'—অর্থাৎ যে-মূর্তির প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেশি সরুও নয়, আবার বেশি মোটাও নয়। বেশি লম্বাও নয়, আবার বেশি খাটোও নয়, কেবল এমনই শাস্ত্রমানসম্পন্ন মূর্তিকেই নাকি 'রমা' বলা যায়। দশ লাখে মাত্র একটি এমন চোখে পড়ে। 'তৎ লগ্নম্ হৃদ্' হৃদয়কে জয় করে এমন জিনিস মনোরম হতে পারে কিন্তু সত্যিকারের 'অনুপম' হতে হ'লে তাকে 'শাস্ত্রমান্' হতে হবে। 'বাক্যম্ রসাত্মকম্ কাব্যম্।' অর্থাৎ শিল্প তখন সৃষ্ট হয় যখন সৃষ্ট মূর্তিতে 'রস'

তার আত্মারূপে প্রবেশ করে। অর্জুন গাছটাকে দেখে এমন কত কথাই যে মনে আসে তা কোনোদিন ব'লে শেষ করতে পারব না।

দেশীই হোক আর বিদেশীই হোক, যে-শিল্পের মানদণ্ডেই বিচার করি-না কেন, তাতেও গাছটার সৌন্দর্যের কোনো ঘাটতি দেখি না। রিয়ালিস্টিক অর্থাৎ বাস্তবধর্মী স্কাল্‌প্‌চার ওপর থেকে পড়া আলোতেই তো সব চাইতে ভালো দেখায়। তার শরীরের বহিঃরেখা, অর্থাৎ আমরা যাকে কণ্টুর বলি—তার কাঠামোর, তার মাংসপেশীর সূক্ষ্ম মোলায়েম উত্থান-পতন, তার ডালপালায় ছন্দের যে-খেলা, তার দাঁড়াবার ভঙ্গি, তার ত্রিমাত্রিকতা—সব-কিছু মিলিয়ে যেন রেনেসাঁস যুগের ভাস্কর্যের চরম উৎকর্ষ মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর 'ডেভিড'। বিশ্বকর্মা এই মহীরুহকে লাবণ্য দিয়েছেন সকলরকমে, সকলভাবে, নানা উপায়ে—আলো-ছায়া দিয়ে, রঙ-বেরঙ মিলিয়ে, কঠোর-কোমলে একত্রে বেঁধে। বড়ো-বড়ো শক্ত পাথরের ওপর দিয়ে পাহাড়ি স্রোত কী-রকম গড়িয়ে-গড়িয়ে যায়! নিছক কড়ি আর নিছক কোমল দিয়ে কি আর সেতার বাজে? জীবন-মরণ, আলো-অন্ধকার—এ-সবই একসঙ্গে থাকলে তবেই তো বাজবে ঐক্যের সুর সারা সংসারে। একেই তো আমরা বলি ইউনিটি। এর সুরেই তো সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বাঁধা।

কে জানে কত যুগ ধ'রে পুকুরের উত্তর-পুব কোণে অর্জুন গাছটা দাঁড়িয়ে আছে? কেউ কি তার বয়স জানে? পঙ্কস্তরের মধ্যে পৃথিবীর ভাবী অরণ্যের যেদিন প্রথম মর্মরধ্বনি উঠেছিল সেদিন থেকেই কি তার আবির্ভাব পূর্বনির্ধারিত হয়েছিল? নুবিয়ার মরুভূমিতে নীলনদের ধারে যেদিন মিশরের সব ওস্তাদ রূপদক্ষেরা আবুসিম্বালের মন্দিরের গায়ে দ্বিতীয় রামাসিসের পর্বতপ্রমাণ মূর্তি খোদাই করেছিল হয়তো সেদিন এই মহীরুহেরও জন্ম হয়েছিল। দুই-ই যেন সৃষ্টির আদিকাল থেকে স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কালের পথে অগ্রগামী এই গাছটা যেন আকাশের দিকে জোড়-হাত তুলে বলেছে, আমি ছিলাম, আমি আছি, আমি থাকব। পুরোনো বট-অশ্বত্থ দেখলেও ঠিক একই কথা মনে আসে। কিন্তু অর্জুনের সঙ্গে তাদের মিল এখানেই শেষ। বট-অশ্বত্থেরা পৃথিবীর যত নিরাশ্রিত, শ্রান্ত জীবদের তাদের ঠাণ্ডা ছায়ার কোলে টেনে নেয়, যেমন ক'রে নিত গভীর অরণ্যের প্রাচীন সাদা জটাজূটধারী, মুনিঋষিদের অবারিত দ্বারের আশ্রম। বট-অশ্বত্থের ধর্ম হচ্ছে করুণা। অর্জুন তার নিজের বিশালতায়, নিজের শক্তিতে এমনই তন্ময়, যে জৈব জগতের উপকারে সে এল কিনা, তাই নিয়ে সে এতটুকুও মাথা ঘামায় না। এতই তার দম্ভ, এতই তার

নির্লিপ্তি। আপাতদৃষ্টিতে এ-কথাগুলো যতই সত্যি মনে হোক-না কেন আসলে কিন্তু ঠিক তা নয়। সে-কথায় পরে আসছি।

আমাদের পুকুরের ঐ উত্তর-পূর্ব কোণটা ফিতের মাপে তেমন দূর না-হ'লেও বাড়ির অন্যান্য অংশের চাইতে বেশ দূরে মনে হ'ত। একটা কারণ হয়তো এই যে পুরুষদের হাল্কা হবার জায়গাটা তখনকার বাড়ির নক্সায় সবচেয়ে দূরে ঠেলে দেওয়াই নিয়ম ছিল। সকালবেলা ছাড়া আমরা সাধারণত ঐ দিকটা তেমন মাড়াতাম না। দিনে-দুপুরে গেলেও কীরকম গা-ছমছম্ করত। কতরকম সাপখোপ পোকামাকড় আর পাখিদের আড্ডাই যে ঐ-গাছটায় ছিল তার ইয়ত্তা নাই। এক কথায় একটা মস্ত চিড়িয়াখানা।

প্রত্যেক জাতের জীবেরই নিজেদের, অদৃশ্য হ'লেও, নির্ধারিত সীমানা টানা থাকে। এক-একদিন ওই সীমানা নিয়ে প্রথমটায় শুধু কলরব, তারপর ঝগড়া, শেষটায় তুমুল দাঙ্গা—রীতিমতো রক্তারক্তি হয়ে যেত। এমন চিৎকার-চেঁচা-মেচি—নিখর কিচ্, নিখর কিচ্, কিররররর—মিররররবর, উইটি উইটি, বিটর-বিট বিটুব-বিট বিরবররব, প্রুইচি-প্রুইচি-প্রুইচি চিরি চিরি চিড়ড়ড়ড়ড় কুচিড়ি কুচিড়ি কুইটুং, পি পি পি ইকুইটুং চুড়ড়ড়ড়ড় ডড়ড় টুইয়া টুইয়া টুইয়া—আরো যে কতরকমের ক্যাকাফোনি, কার সাধ্যি তা বোঝে। কান ঝালাপালা হয়ে যায়। ছোটোবেলায় কড়াই থেকে ঝিনুক দিয়ে পায়েসের চাঁচি তুলবার সময় তার খ্যাঁচঙ্-খ্যাঁচঙ্ তীক্ষ্ণ কর্কশ আওয়াজে সারা শরীরটা কীরকম সিরসির করত। পাখিদের ক্যাচর-ব্যাচর শুনেও মনে হ'ত যেন পৃথিবীর সব ঠিকা-ঝিদের লাইন ক'রে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে কড়াই চাঁচতে। কী ভীষণ ব্যাপার।

একদিন ভোরে প্রচণ্ড একটা গোলমালে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখি অর্জুন গাছটাকে ঘিরে ছোটো-বড়ো অসংখ্য পাখি পাগলের মতো উড়ছে আর তারস্বরে চেঁচাচ্ছে; দলভারী করবার জন্যে বেপাড়ার পাখিরাও এসে জুটেছে। শুনেই মনে হ'ল এ-চেঁচামেচি অন্য ধরনের। একদিকে ভয়ানক বিপদের আশঙ্কায় চিৎকার, অন্যদিকে রণক্ষেত্রের চিৎকার। গাছটার দিকে এগুতেই দেখলাম কোত্থেকে দুটো হনুমান অজস্র ডালপালার মধ্যে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। কখনো ওস্তাদ ট্র্যাপিজ খেলোয়াড়দের মতো ডালে ল্যাজ পেঁচিয়ে দোলা খেতে-খেতে তিড়িং ক'রে এক লাফে দূরের আর-একটা ডালকে ল্যাজ দিয়ে ধ'রে ঝুলে টার্জানের মতো শাঁই ক'রে এক লাফে চ'লে যাচ্ছে গাছের আর-এক প্রান্তে। কী দারুণ ফুর্তি আর আনন্দ। গাছটা যেন সার্কাসের তাঁবু—নানারকম

তামাসার জায়গা। নিছক, নির্ভেজাল আনন্দের এমন লীলাক্ষেত্র কি আর কোথাও আছে? গাছটাকে দখল ক'রে নিলে কেমন হয়? হয়তো এই ভেবেই হনুমানদুটো হঠাৎ এক তাণ্ডবনৃত্যে মেতে উঠল। পাখিদের যত বাসা ছিল টান মেরে একে-একে সবগুলোকে ভেঙে ছুঁড়ে ফেলতে আরম্ভ করল। গোটা ঘটনাটাই ঘটছে গাছের মাঝামাঝি আর নীচের অংশে। (বলা বাহুল্য, ডগার দিকে, অর্থাৎ যেখানে চিল, বাজপাখি আর শকুন-শকুনিদের আড্ডা ছিল, বাঁদর-দুটো সেদিকটায় যাওয়া একেবারেই নিরাপদ মনে করেনি)। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব তছনছ হয়ে গেল। সাধারণ নিয়মে হনুমানদুটোরই জয় হবার কথা। কিন্তু ব্যাপারটা হঠাৎ একটা নাটকীয় মোড় নিল। অনেকটা অ্যালফ্রেড হিচ্‌ককের 'দি বার্ড' ফিল্মের মতো। আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ পাখিদের মতো জীবেরাও যে কী ভয়ংকর রকম হিংস্র হ'তে পারে চৈত্রের সকালের সেই দৃশ্য দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম। যেমন ক'রেই হোক, নিজেদের ভিটেমাটি জান বাঁচাতে হবে এই ইনস্টিংক্ট-এর তাড়নায় প্রায় হাজারখানেক পাখি—এমন-কী ফিঙ্গে, টুনটুনি, চড়ুইও—একজোট হয়ে 'মারো মারো কাটো কাটো, ছিঁড়ে ফেলো' এই হুংকারে ভয়ংকর একটা কালো মেঘের মতো হনুমানদুটোর ওপর বেপরোয়াভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে এক কুরুক্ষেত্র। চারদিকে রক্তারক্তি। বেগতিক দেখে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ক্ষত-বিক্ষত হয়ে বিদ্যুৎবেগে লাফাতে-লাফাতে বানর-দুটো পাখিদের নাগালের বাইরে চ'লে গেল। গাছতলায় প'ড়ে রইল চেনা-অচেনা অনেক পাখির মৃতদেহ।

বানরদের মধ্যে শুধু-শুধু ধ্বংস করবার একটা প্রবৃত্তি এর আগেও লক্ষ করেছি। কিন্তু সেই তুলনায় মানুষের মধ্যে তো এই পশুপ্রবৃত্তি হাজার গুণে বেশি। নিছক আনন্দ পাবার দুর্বার লোভেই হোক, কিম্বা ব্যাবসাব লালচেই হোক, এ-দুয়ের ফলে পৃথিবীর বুক থেকে আজ একশো কুড়ি রকমের স্তন্যপায়ী প্রাণী, আর দুশো পঁচিশ রকমের পাখি, মানুষের শিকার হয়ে একেবারেই লোপ পেয়ে গেছে। শোনা যায় আরো ছয়শো পঞ্চাশ রকমের স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং পাখিদের লোপ নাকি অনিবার্য।

হিংস্রতায় অবশ্য পাখিরা বাঘ ভালুক মানুষ কারোর চাইতে কম যায় না। একবার পুজোর সময় চুরি ক'রে অনেকগুলো বিচিকলা খেয়েছিলাম। ফলে পর-পর বেশ কয়েকবার আমাকে অর্জুনতলায় ছুটতে হয়। সেখানে ঢুকেই দেখি ফুটফুটে অথচ রক্তাক্ত একটা শালিক পাখি এক কোণে ব'সে ধুঁকছে। আমার

ধারণা, চিৎকার-চেঁচামেচি ক'রে ঝগড়া করতে শালিকের জুড়ি নেই। সাধে কি আমাদের পাড়ার বি. এ. পাস করা বংকু মুদি দজ্জাল বউয়ের সঙ্গে ঝগড়ায় না-পেরে উঠে নাকি স্বরে বিড়বিড় ক'রে বলত, 'বেঁটি, মেঁয়েমাঁনুষ নাঁ তঁ যেন শালিক পাঁখি।' সে যাকৃগে। হাজার হোক, আমি কবিরাজের ছেলে। তাকে ধুতির খোঁটে আলতো ক'রে জড়িয়ে এনে গ্যাঁদা পাতার রস দিয়ে ধুয়ে মুছে, হলুদ-চুন দিয়ে বেঁধে দিলাম। তিন-চারদিন ছোলার সঙ্গে কেঁচো আর ফড়িংয়ের ঘণ্ট খেয়ে সে এমনই তরতাজা হয়ে উঠল যে পালাবার জন্যে ছটফট্ করে। আমারই সঙ্গে তাকে রাখি পায়ে সুতো বেঁধে। অনিত্য এই সংসারে মায়া বাড়িয়ে আর লাভ কী। এই মনে ক'রে শালিকটাকে যেই-না অর্জুন গাছটার কাছে নিয়ে গেলাম মুহূর্তের মধ্যে কোথায় যে সে ডালপালা আর পাতার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল আর তাকে কোনোদিন দেখিনি।

পশুপাখির জগতেই হোক, আর মানুষের জগতেই হোক, সীমানা নিয়ে ঝগড়া আজকাল অনেক দূর গড়িয়েছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন যে, 'মানুষ ধন-দৌলত, জমি নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি করে। কই আকাশ নিয়ে তো কেউ ঝগড়া করে না।' আজকের যুগের মানুষ হ'লে তিনি নিশ্চয়ই এ-কথা আর বলতেন না। আজ আকাশ-বাতাস-জল, সর্বত্রই এই সীমানা নিয়ে লড়াই দেখা যায়। জমিতে যে ফসল ফলছে তাতে ক'রে বর্তমান মানুষের আর কুলোচ্ছে কোথায়! জলের তলায় যে মৎস্য এবং অন্যান্য খাদ্যসম্পদ রয়েছে তাই নিয়েও কাড়াকাড়ি প'ড়ে গেছে। তাছাড়া সমুদ্রের মেঝের তলায় কোথায় কখন তরল সোনা বেরুবে তাই-বা কে বলতে পারে? তাই জমির মতো মহাসমুদ্রেও সীমানা নিয়ে লড়াই চলছে। অদৃশ্য হ'লেও আকাশের ওপর দিয়েও ঐ-রকম সীমানা টানা আছে। বিনা অনুমতিতে পেরিয়েছে তো তার ঘোরতর ফলাফল হ'তে পারে। এমন-কী, রাতারাতি যুদ্ধও লেগে যেতে পারে। আকাশ-বাতাস-জল যেদিকেই তাকাও এ-নিয়ে গোলমাল। গাছের ডালপালাও তার ব্যতিক্রম নয়।

আমাদের ঐ অর্জুন গাছটার সঙ্গে আজকালকার গগনচুম্বী ফ্ল্যাটবাড়ির একটা আশ্চর্য মিল দেখি। যাদের আর্থিক সামর্থ্য তুলনামূলকভাবে কম, তাঁরা সাধারণত এইধরনের বাড়িতে তলার এবং পেছনের দিকে স্থান পায়। যে-অনুপাতে মালিকদের অবস্থা বাড়তির দিকে যায়, সে-অনুপাতে তার ক্ষমতাও। আর সে-অনুপাতে তাদের স্থানও ক্রমশই ওপরের দিকে। তাছাড়া রোদ-বাতাসের অংশটাও তাঁরা ভোগ করেন বেশি। গোড়ার দিকে গর্তগুলোতে

সাপ, ব্যাঙ, ইঁদুর ইত্যাদির আশ্রয়। তার ঠিক ওপরের স্তরে কোটরগুলোতে কাঠঠোকরা, মাছরাঙা, টিয়ে পাখি, শালিক, বুলবুল আরো কত-কী। গাছের পেছনের দিকটা অর্থাৎ যে-দিকটায় শীতকাল ছাড়া তেমন রোদ লাগত না, তারই মাঝামাঝি উচ্চতায় কয়েকশো বাদুড়ের একটা ঘন বস্তি ছিল। দূর থেকে হঠাৎ দেখলে মনে হয় যে গাছের ঐ জায়গাকে কে যেন পুড়িয়ে দিয়েছে। এদেরই কাছাকাছি ছিল কয়েকটা বড়ো-বড়ো হুতোম প্যাঁচা। এই পেছনের দিকের ডাল-পালা পাতা এবং গাছতলার রঙটা বাদুড়গুলো বিশ্রীরকমের সাদা ক'রে রেখেছে। ফ্ল্যাটবাড়িতে চুনকাম যতই বাড়ির শোভা বাড়ায় মহীরুহের গায়ে এ-ধরনের সাদার পোঁচ ততই অশোভন। এই বস্তির ওপরে, সামনের দিকে থাকত একদল বক। এদের ওপরের স্তরে ছিল গাঙচিল আর শঙ্খচিলেরা। মাঝে-মাঝে দু-একটা বাজপাখিও দেখেছি। গ্রীষ্মের দুপুরে পাতার তলায় ব'সে ঝিমচ্ছে। আর সবার ওপরে ছিল শকুন-শকুনিদের লাক্সারি ফ্ল্যাট। মানুষের রাজ্যেও যেমন শ্রেণীভেদ-বর্ণভেদ পশুপাখি কীটপতঙ্গের জগতেও দেখছি এর কোনো ব্যতিক্রম নেই।

আগেই বলেছি যে অর্জুন গাছটার ধারকাছ দিয়ে ঘেঁষতে দিনের বেলায়ই আমাদের হৃৎপিণ্ড কীরকম ধড়ফড় ক'রে উঠত। রাত্রিবেলায় নাকি যত রাজ্যের ভূত-পেত্নিরা এসে ওখানে আড্ডা জমাত। গাছটাকে রীতিমতো নাকি ক্লাবঘর বানিয়ে ফেলেছিল। শুনেছি যে চারপাশের গ্রামের যত অপমৃত্যু ঘটত, তাঁদের প্রেতাত্মারা নাকি ঐ-গাছটায় বাসা বেঁধেছিল। তাছাড়া, আত্মীয়-স্বজন, যাঁরা আমাদের মায়া কাটিয়ে চ'লে গিয়েছেন, তাঁরাও নাকি অন্তত বছরখানেক এই গাছটার চারপাশ দিয়ে ঘোরাফেরা করতেন।

একদিন আমরা সবাই হা-ডু-ডু খেলছি। হঠাৎ দেখি আমাদের মাইনে-করা কাঠুরে কার্তিকচাঁদ ছুটতে-ছুটতে এসে আমাদের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মুখ দিয়ে আর টুঁ-শব্দটা বেরুচ্ছে না। ভয়ে যেন জ'মে গেছে। অনেকক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করবার পর হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল যে বড়োকর্তা ওখান দিয়ে যেতে-যেতে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রে কার্তিক, ভালো আছিস তো? অনেকদিন পর তোকে দেখলুম।' ব্যাপারটা হ'ল, বড়োকর্তা, অর্থাৎ আমাদের বাবা, মাসখানেক আগেই মারা গিয়েছিলেন।

আর-একবার কালীপূজার রাত্তিরে আমাদের এক খুড়তুতো ভাই বাজি ধ'রে দিস্তে পাঁচ-ছয় লুচি, সের-দুই নারকেল কুঁচি দেওয়া ছোলার ডাল, বিশ-পঁচিশ-

খানা বড়ো সাইজের বেগুনভাজা, তিন-চার গণ্ডা পোড়া লাল লঙ্কা ড'লে খেয়ে ফেললেন। এর উপর দিলেন ঘন সরপড়া পাঁচ-ছয় বাটি পায়েস সাফ ক'রে। যা অনিবার্য তাই ঘটল। ঘোর অমাবস্যার আল্‌কাতরার মতো ঘন অন্ধকারে বেরুতে হ'ল লোটা হাতে। শরতের শেষের হাল্কা নীল একটা কুয়াশার জাল এই অন্ধকারকে ঘিরে আরো রহস্যময় ক'রে তুলেছে। পুকুরধারে মস্ত বড়ো-বড়ো হাতপাখার মতো দেখতে কচুপাতার জঙ্গলের ঠিক ওপরই অনেকগুলো জোনাকি একসঙ্গে জলছে আর নিভছে। শিশিরভেজা প'কাধান, পচা পাতা পাটের গন্ধ কাদামাটির গন্ধের সঙ্গে মিশে চারদিকের আবহাওয়ায় কেমন যেন একটা ভারী থম্‌থমে ভাব সৃষ্টি করেছে। হাওয়ার লেশমাত্র নেই। লণ্ঠন-হাতে খুড়তুতো ভাই আস্তে-আস্তে সরুপথ দিয়ে অর্জুনতলার দিকে এগুতে থাকল। দূর থেকে হঠাৎ গাছটার দিকে চোখ পড়তেই দেখা গেল তার একেবারে অন্য-এক মূর্তি। যেন রামপ্রসাদী শ্যামা এলোচুলে শ্মশানকালীর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। চারদিকে সুন্‌সান্‌। ছপ্‌ ক'রে জলের মধ্যে কী-একটা লাফিয়ে পড়ল। হয়তো একটা কোলা ব্যাঙ। কিম্বা হয়তো একটা বড়ো মাছ পুকুরের জলের ওপরের দিকটায় হাওয়া খেতে এসে গোত্তা মেরে গভীরে লুকিয়ে পড়ল। ওকি? ওটা কী! কুয়াশার ভেতর দিয়ে আবছা-আবছা ওটা কী দেখা যাচ্ছে! খুড়তুতো ভাই একটুও দমবার পাত্র নয়। আমাদের বাড়িতে ওর মতো আশ্চর্য সাহস আর কারো ছিল না। লণ্ঠনটার সলতে বাড়িয়ে দিয়ে একটু উঁচু ক'রে ধ'রে দেখতে গিয়েই হাত পা চোখ সব 'ফ্রিজ' ক'রে গেল। আমাদের পোষা 'ভোলা' কুকুরটা বিশ্রী কান্নার সুরে থেকে-থেকে ডাকতে আরম্ভ করল। কী যেন একটা বলতে চাইছে। পুকুরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বাঁশবনটার থেকে কতগুলো শেয়ালও তেমনই একটা বিশ্রী চিৎকারে দ্বৈত সংগীত জুড়ে দিল। ঝিঁঝিঁ পোকাগুলোও তাদের ডাক সপ্তমে চড়াল। সবাই যেন সমস্বরে বলছে 'পালাও, পালাও।' কার অদৃশ্য এক তর্জনীর সংকেতে এক মুহূর্তে সব-কিছু গেল থেমে। কী ঠুনকো নিস্তব্ধতা। আঙুলের টোকা মারলেই যেন ভেনিশিয়ান ওয়াইন গ্লাসের মতো ঠুং-ঠাং আওয়াজে হাজার টুকরো হয়ে যাবে। কুয়াশাটা আস্তে-আস্তে বাঁশবনটার দিকে স'রে গেল। লণ্ঠনের মিটমিটে আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল যে দেয়াশলাই কাঠির মতো শুকনো রোগাপট্‌কা—অনেকটা আমাদের সেজোপিসির মতো দেখতে এক বিধবা বুড়ি, ছিপ হাতে পুকুরধারে মাছ ধরতে বসেছে। ভাসুরকে দেখে ছোটো পিসি যেমন আড়াই হাত এক ঘোমটা
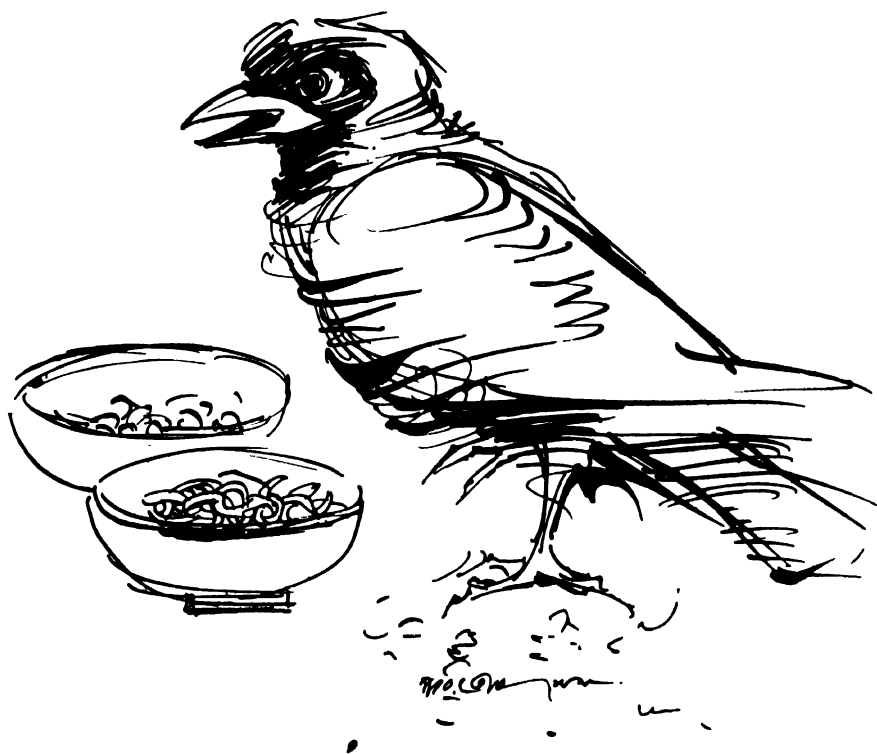
"ছোলা আর কেঁচোর ঘণ্ট খেয়ে শালিকটা তিন চার দিনের মধ্যেই
তরতাজা হয়ে উঠল"—হে অর্জুন

টানতেন, তেমনি মাথার ওপর এক বিরাট ঘোমটা টানা। ঐ অবস্থাতেই মাথাটা খুড়তুতো ভাইয়ের দিকে ঘোরাতেই আবছা আলোতে পরিষ্কার দেখা গেল ঘোমটার তলায় মাথা নেই। বড়শির ফাৎনার ডগায় লাইটহাউসের আলোর মতোই একটা নীল সবুজ আলো চারদিকে ঘুরে যাচ্ছে। বুড়ির ঐ কাঠির মতো হাতের এক হ্যাঁচকা টানে হাত-পনেরো লম্বা—পেটের কাছটা বেল্টপরা মেমসাহেবের কোমরের মতো সরু, একটার জায়গায় তিনটে ক'রে মাথা আর তিনটে ক'রে ল্যাজ, নীচের দিকটা দু-হাত পর-পরই কীরকম গাঁট্‌-গাঁট বাঁধা যেন অনেকগুলো আনারস একসঙ্গে জোড়া হয়েছে—অ্যালসেশিয়ান কুকুরের মতো মস্ত বড়ো লাল টকটকে জিভ লক্‌লক্‌ করছে, মাথার ওপরে গণ্ডারের মতো ধারালো শিং, আর ওয়ালরাসের মতো গোঁফ। চোখদুটো থেকে বিয়েবাড়ির উনুনের মতো আগুন দাউ-দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠছে, আবার বিনা কারণে নিভে যাচ্ছে। আবার জ্বলছে, আবার নিভে যাচ্ছে—এমন একটা অদ্ভুত দেখতে মাছ পুকুরপাড়ে আছড়ে পড়ল। মাটিটা থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। গুজরাটি একধরনের কাপড়-চোপড়ে যেমন ছোটো-ছোটো কাঁচ বসানো থাকে, মাছটার সারা গায়ে তেমনি কাঁচের মোজাইক বসানো। লণ্ঠনের আলো পড়তেই মাছের আঁশগুলো এক-একটা আরশির মতো ঝলমল ক'রে উঠল। মাছটা যেমন তড়পাচ্ছে, তেমনি যেন শত-শত সার্চলাইট জ্বলছে আর নিভছে। একটা আলিশান্‌ বঁটিদা শুকনো পাতার মতো ভাসতে-ভাসতে এসে ঠিক বুড়ির সামনে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে ভেসে এল তেমনি মানানসই দুটো পেতলের পরাত। একী! অর্জুন গাছটার চারপাশে কি হঠাৎ জিরো গ্র্যাভিটি নেমে এল? বুড়ি হাতে খানিকটা মাটি মেখে যেই-না মাছের গর্দানটা বঁটিতে ছোঁয়াল, অমনি ফিন্‌কি দিয়ে টাটকা রক্তের স্রোত হেমন্তের পুকুরটাকে আনাচে-কানাচে ভরিয়ে দিল। খানিকটা এসে খুড়তুতো ভাইয়ের ফুটো হাতকাটা গেঞ্জিটাকে ভিজিয়ে দিল। একী! পায়ের ফাঁক দিয়ে ওটা কী বেরিয়ে গেল? ইঁদুর না বেজি? শুকনো পাতাগুলোর মধ্যে কী খচ্‌-মচ্‌ করছে? একটা চামচিকে শাঁই ক'রে কানের পাশ দিয়ে চ'লে গেল। একটা উচ্চিংড়ে এসে ঠং ক'রে কপালে এমন জোর ধাক্কা খেল যে দাদা প্রায় চিৎপটাং হয়ে প'ড়ে যাচ্ছিল। এ-সব কাণ্ডকারখানা দেখে দাদা পালাতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে ইয়ারি ঢং-এ একটা বরফের মতো ঠাণ্ডা হাতে কাঁধের ওপর রেখে কানের কাছে ফিসফিস ক'রে কে শুধালো, 'জান আমাদের আজ চড়ুইভাতি হচ্ছে। কী মেনু জান? মাছের বিড়িয়ানি, পাতুড়ী, কোর্মা, মুড়িঘণ্ট। রান্না কে করবে

জান ? সেই ড়ায়বাড়ীর পল্টু ড়ায়ের প্রথম স্ত্রী। আমাদের সঙ্গে খাবে তো ?' পরিষ্কার বাংলা। একটুও খুঁত নেই। কিন্তু র-এর উচ্চারণটা ড়-এর মতো কেন ? লোকটা তামিলনাড়ুতে বাংলা শিখেছে নাকি ?

পরদিন আমাদের পুরুতমশাই, অভ্যেসমতো খুব ভোরে প্রাতঃকৃত্যাদি সারতে এসে তাকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখতে পেলেন। মুখ দিয়ে নাকি ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ির মতো ভক্‌ভক্‌ ক'রে গরম ফেনা বেরুচ্ছিল।

আর-একবার আমাদের গ্রামের নাম-করা যোগেশ ভাটিয়াল এ-রকমই এক অমাবস্যার রাতে মনের আনন্দে গান গাইতে-গাইতে অর্জুন গাছটার পেছনের বিলের ধার ঘেঁষে ডিঙি বেয়ে যাচ্ছিল। নসিমপুর গ্রাম থেকে যাত্রার পার্ট ক'রে ফিরছিল নাকি। যেই-না গাছটার তলায় আসা, ব্যাস্‌ তার গান গেল থেমে। তারপর থেকে সে নিখোঁজ। এখন নাকি মাঝে-মাঝে অনেক গভীর রাতে গাছটার মগডাল থেকে তার গান ভেসে আসে। সেই থেকে গ্রামে রাত্রি-বেলা শোবার সময় সবাই কানে তুলো গুঁজে শোয়। সেই গান যার কানে পৌঁছয় তার দিন নাকি আস্তে-আস্তে ঘনিয়ে আসে।

কিন্তু বিচিত্র রূপে মূর্ত গগনচুম্বী এই মহীরুহকে যখনই আমি দেখেছি আমার কানে শুধুমাত্র সৃষ্টির শাশ্বত সংগীতই ভেসে এসেছে যে-সংগীতকে এক কথায় বলা হয় জীবনসংগীত এবং যে-সংগীত এক অনাবিল, উন্নত অনুভবে আমার জীবনকে করেছে সহস্রভাবে সমৃদ্ধ।

হে তরুবর ! আজ প্রায় অর্ধশতাব্দী হ'ল তোমাকে দেখিনি। আজ তুমি পরদেশী। তুমি এখনো আছ কি নেই, কে জানে ? জনবিস্ফোরণের চাপে, মানুষের প্রয়োজনে, তুমি হয়তো হয়েছ বিসর্জিত। তোমার পাদপীঠের ওপর দিয়ে হয়তো তৈরি হয়েছে নতুন রাজপথ। একদিন তৈরি হবে কলকারখানাও। ভোরের সোনালী আলোয় যেখানে দেখেছি তোমার মণিমুকুট, সেখানে উঁচিয়ে থাকবে একদিন দৈত্যের মতো তার বিরাট চিমনি। কালো-কালো বিষাক্ত সাপের মতো অনর্গল ধোঁয়া পাকিয়ে-পাকিয়ে উঠে লাপিস-লাজুলির মতো স্বচ্ছ নীল আকাশটাকে ক'রে দেবে অন্ধকার।

কবে কোন্‌ দারচিনি দ্বীপ থেকে বসন্তের এক দিনের শেষে সুদূর সাইবেরিয়া-গামী একটি বেগুনীরঙের বেলেহাঁস আমাদের এই পুকুরপাড়ের নরম ঘাসে দু-দণ্ড বিশ্রাম করতে নেমে অকস্মাৎ একটি বীজ ফেলে গিয়েছিল। তোমার জন্মের

সেই শুভ মুহূর্তে, স্বাতী, রেবতী, অরুন্ধতী—সব নক্ষত্রেরা শঙ্খধ্বনি ক'রে তোমার আগমন ঘোষণা করেছিল। সেদিন ছিল ফাল্গুনী পূর্ণিমা। সেদিন প্রকৃতি তোমার সৃষ্টির কল্পনায় মশগুল। সে-কল্পনায় ছিল দূর ভবিষ্যতে নতুন বিস্ময়ের আবির্ভাব, নতুন-নতুন সৌন্দর্যের জন্ম, নতুন-নতুন প্রাণের বিকাশ বীজরূপে নিহিত। চরক, সুশ্রুত, বাগভট্ট, চক্রদত্ত, আর্যাবর্তের সব মুনিঋষিরা কত ধুমধাম ক'রে তোমার নামকরণ উৎসব করেছিলেন। চমৎকার সব নাম রেখে তাঁরা তোমার মহিমা গাইলেন। যেমনই ধ্বনি তেমনই তার মাধুরী—গাণ্ডীবী, কিরীটী, কর্ণারী, অর্জুন, শম্বর, পৃথজ, কৌন্তেয়, ধনঞ্জয়, ককুভ—আর কত কী। তুমি ছিলে কোটিতে একটি, সহস্র গুণের আধার। তোমার গুণে কত দুরারোগ্য রোগ থেকে হাজার-হাজার মানুষ মুক্তি পেয়েছে, পেয়েছে নতুন জীবন। তোমার একাধিক নাম হবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে? তুমিই প্রেম, তুমিই সৌন্দর্য, তুমিই শিল্প। তুমিই ভাবুকতা, তুমিই অনুকম্পা। তুমিই সৌন্দর্যপিপাসু প্রকৃত রসিকদের অনুভূতি ও আনন্দের উৎস। কীটপতঙ্গ, পশুপাখি, মানুষ সবাইকে তুমি প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছ। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিয়েছ নিঃশেষে। তাই তোমার কপালে আঁকা আছে প্রেমের জয়তিলক, প্রেমের উজ্জ্বল বর্তিকা।

হে তরুরাজ, ঘন কালো কত অমাবস্যার অন্ধকারে তোমাকে দেখেছি যেন এক রহস্যময় স্বপ্নবন্দর। কবে শুক্লপক্ষের ফালিচাঁদ উঠে তোমার চারদিকের ছায়া ও আসন্ন প্রদোষের গভীর অন্ধকার দূর করবে, দেখেছি তুমি তারই প্রতীক্ষায় কত রাত চুপ ক'রে ছিলে দাঁড়িয়ে। গ্রীষ্মের কত অলস দুপুরে তোমার শীতল ছায়ায় শুনেছি পাখির কূজন। কতদিন স্বপ্নে ভেবেছি তোমার ঐ উঁচু চূড়ায় দাঁড়িয়ে, হাত বাড়িয়ে নীল আকাশটাকে ছোঁব, ওপর থেকে পৃথিবীটাকে দেখব, যেমন ক'রে দেখে চিলেরা। শীতে তোমার পাতাঝরা রুক্ষ কর্কশমূর্তি দেখেছি। দেখেছি তোমার চকচকে তামাটে রঙের নতুন পাতাগুলো ফাল্গুনের গরম আলোতে ঝিলমিল করছে। কী অপূর্ব সে-দৃশ্য। যেন ওমর খৈয়ামের দেশের কোন্ ওস্তাদ কারিগরের তৈরি অনুপম একটি আকাশজোড়া কাঁচের সুরাপাত্র খোরাসানী বেদানার সরবতে টইটুম্বুর। তোমার চূড়ায় ধাক্কা লেগে বর্ষার প্রথম মেঘ তোমাকে করেছে সিঞ্চিত। শালিক, মাছরাঙা, বুলবুল টিয়াপাখিরা ডালে-ডালে সারি-সারি ব'সে শুকোয় তাদের ভেজা পালক। আহা! ডালপালায় যেন রঙ-বেরঙের, নানা নক্সার ঘুড়ির দোকান বসেছে। আবার ভরা বসন্তে দেখেছি

তোমাকে মসৃণ সবুজ মখমলের কুর্তায়। মাথায় ছোটো-ছোটো মাখন রঙের ফুলের স্তবকের মুকুট। তোমার হৃদয়স্পন্দন আজও আমি নিজের রক্তের মধ্যে অনুভব করি। কলকাতার মতো এই জনাকীর্ণ, কোলাহলমুখর ব্যস্ত, পচা, নোংরা, ভাঙাচোরা শহরে বাস ক'রেও তোমাকে কোনোদিন ভুলিনি। জীবনানন্দের যে-অমৃতবাণী তুমি আমায় শুনিয়েছিলে, তার কথা মনে এলে আমি আজও কীরকম ছন্নছাড়া হয়ে যাই—যেন অনেক দূরে, এক জনহীন অজ্ঞাত জগতের, উদাস, অপরূপ এক বুনো সৌন্দর্যের মধ্যে যেখানে জীবন এনে দেয় এক মুক্তির স্বাদ আর আনন্দের অনুভূতি।

'হে সময়, হে সূর্য, হে মাঘ-নিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি, হে হিম হাওয়া, আমাকে জাগাতে চাও কেন।'

"জামিলার মা"

জামিলার মা

আমার বয়েস তখন পাঁচ কিংবা ছয়। মাঘমাসের ফুটফুটে একটি ভোরবেলা। পদ্মমধুর রঙের ঝোলাগুড় আর নারকেলসহ গরম মুড়ি খেয়ে যথারীতি নিচে নেমে এসেছি। বাসনমাজা, কাপড়কাচা, স্নান, রান্নাবান্নার আয়োজন, পড়াশুনো হাঁকডাক—অর্থাৎ বড়ো সংসারের নানারকম কর্মব্যস্ততায় আমাদের বাড়ির নিচতলাটা মুখর। এমনসময়, পাশবালিশের ওয়াড়ের মতো দেখতে, আজানুলম্বিত সাদা খোলে ঢাকা একটি মূর্তি আমাদের বাড়ির প্রবেশপথে দেখা দিল। শুধু পা-দুটি বেরিয়ে আছে। চট্‌পট বাড়িতে ঢুকেই সেই খোলের ভেতর থেকে শুকনো আখের মতো দেখতে একটি বৃদ্ধা বেরিয়ে এল। আমার ডাকনাম ধ'রে ডাকল। ডাকটি যেমনই মধুর তেমনই আহ্লাদে ভরপুর। একটু হকচকিয়ে গেলেও এক-পা দু-পা ক'রে তার দিকে এগিয়ে গেলাম। আমার জ্ঞান হবার পর তাকে দেখার এই প্রথম অভিজ্ঞতা এবং স্মৃতি। বৃদ্ধার বয়েস কম ক'রেও পঁয়ষট্টি হবে। শীর্ণ হ'লেও, লম্বা সটান দেহ। তার অস্থিপ্রধান মুখটি যেন ভাস্করের একটি সুখস্বপ্ন—যে-ধরনের মুখাবয়ব দেখে শুধু তাদেরই নয়, চিত্রশিল্পী-দেরও হাত নিশ্‌পিশ্‌ ক'রে ওঠে। এমন এক বৃদ্ধাকে দেখেই হয়তো এ-যুগের প্রখ্যাত ফরাসী ভাস্কর রদ্যাঁ তাঁর 'she who was once the helmet maker's beautiful wife' মূর্তিটি তৈরি করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তার কোটরে-ঢোকা চোখ যেন দুটি ছোট খয়েরি রঙের কড়ি। দৃষ্টি প্রখর কিন্তু কিঞ্চিৎ দুঃখমিশ্রিত। তার বাদামী রঙের চামড়াটি, চর্বির অভাবে এতই পাতলা যে, একটু নজর দিলে তার হাতের কব্জির তলায় নাড়ির স্পন্দনও পরিষ্কার দেখা যায়। মলিন সাদা চুল-ক'টি, দেহ এবং চোখের রঙের সঙ্গে মিশে বেশ-একটা একরঙা সমন্বয় সৃষ্টি করেছে। মুখের ভেতর সর্বদাই পান, বাইরে মাতৃসুলভ হাসি। এই হাসিটি তার ভাঙাচোরা মুখটিতে একটি মুক্তোর অলংকারের মতো ঝক্‌ঝক্‌ করে। তার স্বাভাবিক দু-পাটি সুশ্রী দাঁত। মিশির ব্যবহারে একটু কাল্‌চে রঙ ধরলেও হাসির মাধুর্যে ঘাটতি পড়ে না। বরঞ্চ, ফাঁকবিহীন সুগঠিত দাঁতের বাহার যেন আরো

বাড়িয়ে দেয়। অসংখ্য বলিরেখা কপালের একপ্রান্ত থেকে ঢেউ খেলে উঠে অপর প্রান্তে নেমে এসেছে। সেগুলো যেমনই সূক্ষ্ম, তেমনই একটির পর আরেকটি সুন্দর ভাঁজে সাজানো। গ্রীষ্মের ঘর্মাক্ত কপালে আলোর স্পর্শে, এই রেখাগুলো, একটি পাহাড়ী স্রোতস্বিনীর মতো ঝিকমিক্ ক'রে ওঠে। পুষ্টির অভাবে তার স্তনযুগল শুকিয়ে গিয়ে দুটি হাওয়াবিহীন বেলুনের মতো ঝুলে বুকের পাঁজরের সঙ্গে এমনই মিশে থাকে যে বিশেষ নজর না-দিলে সে-দুটির অস্তিত্ব টের পাওয়া দায়। একদিকে বার্ধক্য, আরেকদিকে দারিদ্র্য, এ-দুয়ের চাপে, হাড়ের ওপর মাংসের ক্ষয়িষ্ণু আবরণটি প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। এ-দেহটিকে সে অতি সাধারণ একটি আটহাতি ধূসর রঙের ডোরাকাটা শাড়ি দিয়ে কোনোপ্রকারে ঢেকে রাখে।

আমাদের বাড়িতে তার আনাগোনা নাকি অনেকদিন থেকে। আমার আপন বারোটি ভাইবোনদের শুধু জন্মাতেই দেখেনি, তাদের ডাকনামগুলোও তারই দেয়া। কী বাহারের সব নাম—হীরা, চিনি, মোতি, সোনা ইত্যাদি। তার আসল কাজ ছিল বাবার যাবতীয় আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরি করবার জন্য নানারকম ফলমূল, মশলাপাতি এবং ধাতু, কালো পাথরের খোলে কিংবা শিলনোড়া দিয়ে পেষা। তারপর ছোটো-বড়ো ওষুধের গুলি পাকিয়ে শুকিয়ে নেওয়া।

বৃদ্ধা জাতে মুসলমান। বাড়ির সবাই তাকে জামিলার মা ব'লে ডাকে। শুধু জামিলার কেন, আমাদের মা বললেও অত্যুক্তি হয় না। অসুখে-বিসুখে বিপদে-আপদে, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে, সে আমাদের, বিশেষ ক'রে বাড়ির কনিষ্ঠদের কাছে ছিল খুবই নিকটের লোক। পেন্সিলের শীষ সরু ক'রে চেঁছে দেওয়া, তার কুঁচ্‌কোনো শীর্ণ ঊরুর চামড়ায় ঘ'ষে আমাদের লাট্টুর লেত্তি পাকিয়ে দেয়া, হাফ্‌প্যান্টের বোতাম শেলাই ক'রে দেয়া, এমন-কী ঘুড়ির সুতোয় মাঞ্জা দেয়ার জন্যে কাঁচ গুঁড়ো ক'রে দেয়া—এ-সব আব্দারই জামিলার মা প্রশ্রয়শীলা মা-র মতোই সহাস্যে মেনে নিত। লেত্তির গোড়ায় মোরগফুলের মতো পাটের ঝুমকো বানিয়ে তাকে লাল-নীল-সবুজ রঙে ডুবিয়ে এমনই বাহার আনত যে, সেটি চমৎকার একটি হস্তশিল্পের নিদর্শন বললে একটুকুও বাড়াবাড়ি হয় না। বাড়ির কিশোরীদের বিনুনির ডগায়ও এ-ঝুমকো বেশ শোভা পেত। একেকদিন আমাদের সবার জন্যে লেত্তির পাক দিতে-দিতে এক ঊরুর ছাল উঠে গেলে আরেক ঊরু বাড়িয়ে দিতে জামিলার মা বিন্দুমাত্র ইতস্তত করত না।

একবার বাবার সঙ্গে রোগীবাড়ির ভিজিট থেকে ফেরবার পথে আমি

ঘোড়াগাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে বাইরের উত্তেজনামূলক নানারকম দৃশ্য দেখছিলাম। এমনসময় হঠাৎ দরজা খুলে রাস্তায় চিৎপটাং হয়ে প'ড়ে যাই। আমার ডান-হাতটি গাড়ির চাকার তলায় চ'লে যায়। ঝাঁটার মতো গোঁফওয়ালা স্বজাতি গুরুদাস ডাক্তার আসার অনেক আগেই জামিলার মা হল্দি-চুন পিষে গরম ক'রে আমার হাতে পট্টি বেঁধে দেয়। তার কোলে শুইয়ে রেখে আমার সর্বাঙ্গে ঠাণ্ডা হাত বুলিয়ে দেয়। এমন সুখস্পর্শে সব কষ্ট সব জালা-যন্ত্রণাই জুড়িয়ে যায়। গায়ে হাত বোলাতে-বোলাতে বিড়বিড় ক'রে আল্লাহ্‌র নাম ক'রে কী-সব বলে।

এ-ঘটনার বেশ-কিছুদিন পরেকার কথা। একদিন বিকেলে জামিলার মাকে একটি বড়ো কড়াইতে চ্যবনপ্রাশ ঢেকে রাখতে দেখি। সন্ধের অন্ধকারে লুকিয়ে তার ঘরে ঢুকে, সেই কড়াই থেকে বেশ খানিকটা চ্যবনপ্রাশ তুলে মুখে পুরে দিই। ঘণ্টাখানেক বাদে আমার মনে হ'ল যে, আমার সর্বাঙ্গ একটা পালকের মতো হাল্কা হয়ে শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। জোর ক'রে মাটিতে পা ফেলে কোনো-রকমে বই নিয়ে পড়তে বসলাম। লণ্ঠনের আলো থেকে রামধনুর মতো সাতরঙা রশ্মি কেঁপে-কেঁপে বেরিয়ে আমার বইয়ের পাতাকে রাঙিয়ে দিল। একটি লণ্ঠন দশটি হয়ে ঘরের মধ্যে পাক খেতে-খেতে একটি ঘূর্ণির রূপ ধরল। বেগতিক দেখে, কাউকে কিছু না-ব'লে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার খাটটি আস্তে-আস্তে মেঝে থেকে উঠে, দক্ষিণের জানালা দিয়ে গ'লে বেরিয়ে গেল। আমাদের পাড়ার পর্তুগিজ গির্জের বাগানের মস্ত বড়ো কদম গাছটার মাথার উপর দিয়ে আকাশে উঠে, নবাববাড়ির ফটকের উঁচু মিনার পেরিয়ে শীতের শুকনো পাতার মতো, বুড়িগঙ্গার বালির চরে গিয়ে নামল। চরের ক্ষেতে অতিকায় ফুটবলের মতো অজস্র তরমুজ ফলেছে। দেখতে-দেখতে শুক্লপক্ষের নির্মল চন্দ্রালোক ফুটে উঠল। শুভ্র বালির চরের ওপর অবারিত উচ্ছ্বসিত জ্যোৎস্না আকাশের সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হ'ল। আমার মনে হ'ল আমি এখানে কী করছি! এমনসময় দুটি বৃহদাকার ট্যাংরা মাছ নদী থেকে ছলাৎ ক'রে লাফিয়ে চরে এসে পড়ল। একটির হাতে বেহালা, আরেকটির হাতে ডুগডুগি। তাদের হাবভাব দেখে বুঝতে কোনোই অসুবিধে হ'ল না যে, দুটোই বদ্ধ পাগল। দুটিতে মিলে আবোলতাবোল ছন্দের নৃত্যসংগীতে, জনশূন্য, সুষুপ্ত নদীর চরটিকে, সাগরমেলার মতো কোলাহলময় ক'রে তুলল। তারপর হঠাৎ নাচগান থামিয়ে, ক্ষিদে পেয়েছে ব'লে, তরমুজ খেতে ব'সে গেল। রক্তবর্ণ

তরমুজের রসে তাদের সারা শরীর টইটুম্বুর হয়ে হিচিক্ গুরুম্, হিচিক্ গুরুম্, আওয়াজে বিশ্রী ঢেকুর তুলতে আরম্ভ করল। এমনসময় বিরাট কালো মেঘের মতো একটি প্যাঁচার আগমন দেখেই ট্যাংরারা, বেহালা, ডুগডুগি ফেলে, ঝপাৎ ক'রে লাফিয়ে বুড়িগঙ্গার জলের গভীরে মিলিয়ে গেল।

পরদিন ভোরে ঘটনাটি বলার সঙ্গে-সঙ্গেই জামিলার মা আঁতকে ব'লে উঠল, 'হায় আল্লাহ্, হায় আল্লাহ্। ও-কড়াইতে চ্যবনপ্রাশ নয়, মোদক।' এ-কথা ব'লেই তাড়াতাড়ি এক হাঁড়ি তেঁতুল জল গুলে তাতে সাদা-কালো খয়েরি-বেগুনী, নানারকম গুঁড়ো মিশিয়ে আমাকে খাইয়ে দিল। ঈষৎ তিরস্কারের ভঙ্গিতে বলল, 'এখানেই চুপ ক'রে ব'সে থাকো।'

প্রত্যহ ভোরে নটা বাজার সঙ্গে-সঙ্গেই জামিলার মা আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করে। বাড়ির একপ্রান্তে, নিচতলায়, তার স্যাঁতসেঁতে নির্ধারিত একটি ঘর। দুপুরবেলায় একদণ্ডের জন্যে, এক চিল্‌তে রোদ ঘরটির চৌকাঠে একটি ত্রিকোণের আকারে, উঁকি দিয়েই স'রে পড়ে। পাশেই ছোট্ট একটি উঠোন। সেখানে শীতকালে জামিলার মা রোদে ব'সে ওষুধ পেষে। ঘরে ঢুকে বোরখাটি খুলে, সুন্দর পাট ক'রে এক কোণে রেখে দেয়। ছোটো বড়ো লম্বা চৌকো গোল পট্টি সেলাই ক'রে তার এই জীর্ণ আবরণটি বহু কষ্টে এখনো সে ব্যবহারের উপযুক্ত ক'রে রেখেছে। সে-যুগের ঢাকা শহরে, গরীবই হোক, আর আমীরই হোক্, যুবতীই হোক্, আর বৃদ্ধাই হোক্, বোরখাহীন মুসলমান স্ত্রীলোকদের সচরাচর রাস্তাঘাটে তেমন দেখা যেত না। তাছাড়া জামিলার মা-র আব্রুজ্ঞান, তার সমবয়েসীদের তুলনায়, একটু বেশিই ছিল। সেজন্যেই হয়তো, সেন-পরিবারের সঙ্গে চল্লিশ বছরের ওপর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও বাবার মুখোমুখি হ'লেই আড়াই হাত ঘোমটা টানত।

জামিলার মা-র ঘরটি যেন একটি পশারির দোকান। নানারকম শুকনো, তাজা গাছ-গাছালি, লতাপাতা, গাছের ছাল চারদিকে ছড়ানো। একদিকে এ-সবের একটি মিশ্রিত গন্ধ, অন্যদিকে নানা মশলাপাতির গন্ধ — সব মিলে ঘরের ভেজা হাওয়াটুকুতে অক্সিজেনের কিছু আর অবশিষ্ট থাকত না। ঘরের মধ্যে সর্বদাই একটা গুমোট ভাব। জামিলার মা-কে এ-কথা বললে উত্তরে সে বলত, 'মাছের আঁষ্টে গন্ধ নাকে না-গেলে মেছুনির প্রাণ যেমন অস্থির-অস্থির করে, এ-সবের গন্ধ না-পেলে আমারও ঠিক তেমনই অবস্থা হয়।' একেকদিন কোনো বিশেষ একটি গন্ধ আমাদের নাকে এমনই জ'মে বসত যে, এমন-কী পায়েস খাবার

বেলায়ও সে-গন্ধ পেয়ে আমাদের বিরক্তির সীমা থাকত না। বাতরোগের ওষুধ তৈরির সময় সে যখন একসঙ্গে কয়েক সের রসুন বাটতে বসত তখন আমাদের বাড়িছাড়া হওয়া ছাড়া আর উপায় থাকত না। আর যেদিন হিং রসুন দুই-ই পেষা হ'ত সেদিনকার কথা তো ছেড়েই দিলাম। আবার তেমনি আরেকটি বিশেষ গন্ধ এখনো আমার নাকে লেগে রয়েছে। মৃতপ্রায় রোগীর হৃৎপিণ্ড চালু রাখার জন্যে আয়ুর্বেদের মহৌষধ, 'বসন্ততিলক', তৈরি করার সময়, লৌহ, অভ্র, এবং স্বর্ণ-ভস্মের সঙ্গে, জামিলার মা যখন কস্তুরি মেশাত, সে-গন্ধ আমাদের মতো কিশোরদেরও মাতোয়ারা ক'রে তুলত। আর যেদিন গোচোনার মিশ্রণে সে লৌহ কিংবা অভ্র শোধন করতে বসত সেদিন তার ঘরের চতুঃসীমানায় আর তিষ্ঠোনো যেত না।

নারিন্দা থেকে আমাদের জিন্দাবাহার গলি পর্যন্ত তিন-চার মাইল রাস্তা জামিলার মা রোজ পায়ে হেঁটে যাতায়াত করে। বোরখা গায়ে চলন্ত কাক-তাড়ুয়ার মতো দেখতে হ'লেও, এমনই ক্ষিপ্র তার পদক্ষেপ যে, অনেক তর-তাজা যুবককেই হার মানিয়ে দেয়। একদিন তাকে ক্ষ্যাপাবার উদ্দেশ্যে আমার সঙ্গে হাঁটার প্রতিযোগিতায় নামতে বলি। জামিলার মা হেসেই কুটিপাটি। আমাকে বলল, "তাহলে তুই দৌড়বি, আমি হাঁটব।" তাকে ক্ষ্যাপাতে গিয়ে উল্টে আমি নিজেই ক্ষেপে উঠে এই অন্যায় শর্তের ঘোরতর প্রতিবাদ করি। শেষ পর্যন্ত তার এই নির্দেশ হ'ল যে, আমি পাঁচ মিনিট আগে রওনা দেব। অর্থাৎ কিনা আমার পাঁচ মিনিটের হ্যাণ্ডিক্যাপ।

রাস্তায় লোকজনের বেজায় ভিড়। ঘোড়াগাড়িগুলো ধুলোর মেঘ উড়িয়ে এদিক-ওদিক ছুটছে। এই মেঘের ওপর পড়ন্ত নরম আলোর পটভূমিকায় এই যানবাহন, লোকজন, সব-কিছু ছায়ার মতো আবছা দেখাচ্ছে। তারই ভেতর থেকে, মানুষজনের ভিড় ঠেলে একটি হাল্কা ছায়াকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। যাই হোক্, চিন্তা কিসের। আমাদের গন্তব্যস্থল নবাববাড়ির ফটক তো আর-একশো গজের মধ্যেই। এই মনে ক'রে মহানন্দে হন্‌হন্ ক'রে এগুচ্ছি। এমন-সময় একটি বোরখার ভেতর থেকে কে খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠল। আমার হাতে চিম্‌টি কেটে, পাশ-কাটিয়ে লোকজনের সঙ্গে মিলিয়ে গেল।

প্রত্যহ আমাদের বাড়িতে প্রবেশের সঙ্গে-সঙ্গেই জামিলার মা তার ওষুধ-পেষার কাজে লেগে যায়। তারই মাঝে-মাঝে আমাদের ছোটোখাটো ফাই-ফরমাস খাটতে সে সর্বদাই রাজি। তার হাতে মাখা লংকা আর রসুনকুচি

এবং ধনেপাতাসহ তেলমুড়ি, কিংবা ঝালনুন, পুদিনার পাতা, একটু আমলকী ভস্ম মিশিয়ে কদ্‌বেলের চাটনির কথা মনে এলে এখনো আমার জিভ জলে টস্‌টসিয়ে ওঠে। তাছাড়া, তার হাতের আরেকটি বিশেষত্ব ছিল। হামানদিস্তায় মুড়ির ছাতুতে আখের গুড়, একচিম্‌টি জিরে-নুন্‌ আর জায়ফল, দু-ফোঁটা লেবুর রসের অনুপানে দিনের পর দিন খেয়ে একটুও বিস্বাদ কিংবা একঘেয়ে মনে হ'ত না। বলা বাহুল্য, এ-ধরনের জলখাবার তৈরিতে তার অনুপাত জ্ঞান ছিল নিখুঁত।

আয়ুর্বেদিক ওষুধ প্রস্তুতে ফল-মূল পাতা-মশলা ইত্যাদি নানা উপকরণের মধ্যে কয়েকটি আমাদের খুব প্রিয় জিনিস থাকত। জাম, আমলকী, ফলসা, কিশমিশ, মনাক্কা, মিছরি—এ-সবই জামিলার মা-র হেপাজতেই রাখা থাকত। এদিক-ওদিক ভালো ক'রে দেখে নিয়ে, হয় দুটি কিশমিশ, কিংবা মনাক্কা, আমলকী কিংবা কয়েকটি ফলসা, নিদেনপক্ষে ছোট্ট একটুকরো মিছরি আমাদের হাতের মুঠোয় গুজে দিয়ে বলত, 'যাঃ! যাঃ! শিগগির পালা।' তাছাড়া, বিশুদ্ধ গাওয়া-ঘি এবং মিছরি-দেয়া চ্যবনপ্রাশও আমাদের ভাগ্যে কখনো-কখনো জুটত। স্বাদে হালুয়ার চাইতে কোনো অংশে কম মনে হ'ত না। আরেকটি অতি উপাদেয় খাবারের কথা তো ছেড়েই দিচ্ছিলাম। যার আয়ুর্বেদিক নামটি শুনে অনেকেই হকচকিয়ে উঠবে, নামটি হ'ল 'কুষ্মাণ্ড খণ্ড।' চালকুমড়োর ছোটো-ছোটো টুকরো ঘিয়ে ভেজে, ত্রিফলা, চিনি ইত্যাদিসহ পাক দিয়ে তৈরি এই মিষ্টি দিল্লী-আগ্রার বাদ্‌শাহী আমলের 'পেঠা'কেও হার মানিয়ে দেয়। আমাদের প্রতি তার এ-ধরনের গোপন প্রশ্রয়-পূর্ণতার খবর কোনোপ্রকারে বাবার কানে পৌঁছতেই তিনি জামিলার মা-কে একদিন তলব করলেন। তাকে ভর্ৎসনা করতে গিয়ে তিনি থমকে গেলেন। আড়াই হাত ঘোমটার আড়াল থেকে এক-ফোঁটা জল বৃদ্ধার পায়ের কাছে পড়তেই বাবা আর এগুলেন না।

হাজার হোক্‌ সেন-পরিবারের সেবায় প্রায় অর্ধশতাব্দী উৎসর্গীকৃত তার জীবন। যে-পরিবারের ছেলেমেয়েদের প্রতি তার মায়ামমতার কোনো ঠিক-ঠিকানা ছিল না, ঝড়বৃষ্টি, গ্রীষ্ম, শীত, রমজান-ঈদ্‌, সব উপেক্ষা ক'রে প্রত্যহ ছ-সাত মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে, বিনা কামাইয়ে, হাজিরা দিয়ে এসেছে, এমন মানুষকে, এ-সামান্য অপরাধে কিছু বলা তো নিজেকে ছোটো জাহির করা।

জামিলার মা-র চরিত্রের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল। যে-দিকটি তার চাইতে অনেকগুণ বেশি আর্থিক সচ্ছলতা-সম্পন্ন লোকদের মধ্যেও দেখা যায়

না। কৈশোর বৈধব্য এবং নিদারুণ দারিদ্র্য সত্ত্বেও তার গর্বকে কোনোদিন সে খর্ব হতে দেয়নি। দুঃখ-কষ্টের ফিরিস্তি জানিয়ে মাসহারা বৃদ্ধির আবেদন ঘুণাক্ষরেও তার কোনোদিন মনে আসেনি। তদুপরি, হিন্দু পরিবারে চাকরি করার সর্বপ্রকার সামাজিক বিধিনিষেধই সে মাথা পেতে নিয়েছিল। জীবনের বহুলাংশ সময় সেন-পরিবারের সেবায় আত্মনিয়োগ করা সত্ত্বেও আমাদের বাড়িতে তার গতিবিধি সীমাবদ্ধ ছিল। আর পুজোর ঘরের কথা তো ছেড়েই দিলাম। ভিন্ন-সম্প্রদায়ী ব'লেএ-ধরনের অন্যায় ভেদাভেদেবকথা ভেবেআমাদের বিরুদ্ধে সামান্য অভিযোগও সে কোনোদিন মনে পোষেনি।

জামিলার মা-র রোজকার কাজের প্রধান অংশটি তার বয়েস এবং জীর্ণ দেহের পক্ষে বেশ পরিশ্রমসাধ্য ছিল। দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাথরের খলে কিংবা বড়ো শিলনোড়া নিয়ে ওষুধ-পেষা যেমনই ছিল একঘেয়ে তেমনই কষ্টসাধ্য। বিশেষ ক'রে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে। তাছাড়াও ওষুধের কিছু উপকরণ পেষার আগে হামানদিস্তায় অনেকক্ষণ ধ'রে গুঁড়ো ক'রে নিত হ'ত। এখনো মনে পড়ে গন্ধকের সঙ্গে পারদ মিশিয়ে একটি কজ্জলি তৈরি করার কথা। পারদ একটি এমনই ধাতু যা সহজে অন্য কোনো পদার্থের সঙ্গে মেশে না। হপ্তার পর হপ্তা কেটে যেত এ-ধরনের ওষুধ পিষতে। দম-দেয়া জাপানী খেলনার মতো তার শীর্ণ হাতদুটি অবিরাম, একঘেয়ে ছন্দে, নড়তে থাকে। মাঝে-মাঝে জ্যেষ্ঠদের চোখের আড়ালে আমরা তার এই কাজে সাহায্য ক'রে তাকে সাময়িক বিশ্রাম দিতাম। বদ্ধপাগলের ন্যাড়া ব্রহ্মতালুতে ঠাণ্ডা পট্টির জন্যে একটি ওষুধ তৈরি করতে জামিলার মা-র মতো কষ্টসহিষ্ণু লোকেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে আর কী! পাথরের বড়ো খলটিতে টাটকা কচি ডাবের জলের মধ্যে সাদা, গোল এবং চ্যাপ্টা আটার পিণ্ডের আকারের একটি পদার্থ। খলটি জামিলার মা-র প্রসারিত পায়ের মাঝখানে রাখা। ধনুকের মতো মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে সন্তর্পণে নোড়াটি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সামনে-পেছনে নাড়াবার দৃশ্যটি এখনো আমাব চোখের সামনে ভাসছে। উঃ। কী হাড়ভাঙা কাজ। প্রত্যহ দুপুরে রোগী-দেখার পালা শেষ ক'রে, ওপরে যাবার আগে, বাবা ওষুধটির অগ্রগতি একবার পরীক্ষা ক'রে জামিলার মা-কে বলেন, 'উঁহুঁ। এখনো হয়নি।'

জামিলার মা-কে তার নিজের কথা—স্বামী, পরিবার, ভাইবোন বাবা-মা-র কথা জিজ্ঞেস করলে গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শুধু বলে, 'হায় আল্লাহ্।' সঙ্গে-সঙ্গেই চোখ ছলছল ক'রে ওঠে। বাড়ির জ্যেষ্ঠদের কাছে শুনেছি তার বাল্য-